# রজনীগন্ধা

শ্রীসীতা দেবী

ফাল্গুন ১৩২৮

তিন টাকা

কলিকাতা
২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রী
চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।



কলিকাতা
২১০-৩-১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

# রজনীগন্ধা

রাস্তায় তখন সবে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দিনের সঞ্চিত ধূলি ও ধুম যবনিকার রূপ ধরিয়া রাজধানীর উপর আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের আলো এই শ্বাসরোধকারী আবিলতার সাগরের মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময় দ্বীপের মত ভাসিয়া রহিয়াছে।

একখানা থার্ডক্লাশ ভাড়াটে গাড়ীতে চড়িয়া ছয়-সাতটি মানুষ মহা কলরব সহকারে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং তাঁহারই কাছাকাছি বয়সের একটি মহিলা অতিরিক্ত আগ্রহে পরস্পরকে বুঝাইতেছেন যে আজকাল একটা মানুষের কলিকাতায় ডাল ভাত খাইয়া থাকিতে যত খরচ, আগে তাহাতে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বচ্ছন্দে দোল-দুর্গোৎসব করিয়া দিন কাটিত। তিনটি বালকবালিকা একটি রবারের বেলুন-বাঁশির স্বত্বাধিকার মুখ ও হাতের সাহায্যে সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। একটি তরুণী কোলে একটি তিনচার বছরের ছেলে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে এবং একটি যুবক অত্যন্ত বিরক্ত

মুখে সকলকে চেঁচামেচিটা একটু কম করিবার জন্য থাকিয়া থাকিয়া প্রবল অনুরোধ করিতেছে।

গাড়োয়ান রাস্তার মোড়ে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাঙা গলায় হাঁকিল, "কুন্‌দিগে যাব বাবু, ডাইনে না বাঁয়ে?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তখনও অর্থনীতির আলোচনায় বিভোর, তিনি কোনই উত্তর দিলেন না। যুবক গলার স্বরে তার সমস্ত বিরক্তিটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, "বাঁয়ে," তারপর স্বরটা একটু নীচু করিয়া বলিল, "থার্ডক্লাশ গাড়ী চড়ে যে পরিমাণ গোলমাল তোমরা করে নিলে তা Viceroyএর state driveএও হয়ে ওঠে না।"

প্রৌঢ়া মহিলা বলিলেন, "তা কি হয়েছে কি? লাট নই বলে কথা কইব না নাকি?"

যুবক উত্তরে একটা কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময় মেয়েটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই গেটের সাম্‌নে দাঁড়াতে বলুন!"

গাড়ী দাঁড়াইল। কোলের মেয়েটিকে নামাইয়া, পুরানো খবরের কাগজে জড়ানো একটি ছোট পুঁটুলি হাতে করিয়া মেয়েটি নামিবার উপক্রম করিল, বলিল, "এখন তবে আসি!"

গাড়ীর ভিতর হইতে বালক-বালিকাগুলি দ্বিগুণ

গোলমাল করিয়া উঠিল, গৃহিণীটি বলিলেন, "এসো মা। আবার আস্‌চে সপ্তাহে শনিবারে আস্‌ছ ত?"

মেয়েটিকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই যুবক বলিল, "হ্যাঁ, যা তোমাদের নীরব নির্জ্জন বাড়ী, ঘন ঘন এলে আর তাহ'লে এখানে না ঢুকে সার্কুলার রোডের Deaf and Dumb Schoolএর দিকে রওনা হতে হবে।"

তরুণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি যে তুমি বল তার ঠিক নেই! আমি ত আর তপস্যা কর্‌তে যাইনি যে নির্জ্জনতার অভাবে হাঁপিয়ে উঠ্‌ব? না, মাসিমা, এর পরের সপ্তাহে বোধহয় আসা হবে না, উপরি উপরি আসা সব সময়ে সম্ভব হয় না।"

মাসিমা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তার পরের বার এসো এখন। তুমি এলে ছেলেপিলেগুলো তবু ঘরে থাকে ক্ষণু, তা না হলে সারাক্ষণ ভয়ে মরি, কখন কোন্‌টা বা ট্রাম চাপা পড়ে, না মোটর চাপা পড়ে; এ পোড়া সহরে কি মানুষ থাকে মা!"

মেয়েটি নামিয়া পড়িল। যুবক এতক্ষণ নামিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে উঠিয়া বলিল, "এই চালাও।" গাড়ীখানা বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণিকা গেট্ পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল মেয়েরা

তখনও মাঠে ঘোরাঘুরি করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই মেয়ে, এক দিন দেরি করলে কেন? বিনোদিনীদি তোমায় টুলের উপর দাঁড় করিয়ে দেবেন জান?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা। আমি রবিবারেই আস্‌ছিলাম ভাই, তা ওঁদের ছোট খুকীর জন্মদিন পড়্‌ল আজ, তাই সন্ধ্যের আগে কিছুতেই ছাড়্‌লেন না। তেমন খুব পরিচিতও নয়, কাজেই বেশী জোর করতে পার্‌লাম না। Studyর ঘণ্টা পড়্‌তে কত দেরি আছে রে?"

তাহার সঙ্গিনী বলিল, "কে জানে, জানি না। ও শ্যামের বাঁশী যত পরে বাজে ততই ভাল। খুব পরিচিত নয় ত ওদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলে কি করে?"

ক্ষণিকা বলিল, "চিন্ময়দার উনি মাসিমা। আমার কথা ওর কাছে অনেক শুনেছেন, তাই নিতে এসেছিলেন। বাবার সঙ্গেও যদুবাবুর বেশ আলাপ আছে।"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। খেলাধূলা গল্প সব অবসান করিয়া মেয়ের দল ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে ক্ষণিকা বলিল, "যাই পুঁট্‌লিটা রেখে আসি। হ্যাঁ প্রভা, মনোজাদি ফিরেছেন?"

প্রভা তাহাকে এক ঠেলা মারিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ,

তা না হলে কি এমন হাসিমুখে তোমায় অভ্যর্থনা কর্‌তে আসি? সবাই মিলে এতক্ষণ শোকসভা কর্‌তাম না? কই আমাকে শাল দোশালা কিছু দিলে না?"

ক্ষণিকা বলিল, "তোকে ছাই দেব। সব-তাতে রসিকতা না কর্‌লে মেয়ের ভাত হজম হয় না। একঘেয়ে ঠাট্টা কর্‌তে এতও তোদের ভাল লাগে।"

"নূতন নূতন ঠাট্টা কর্‌বার পথ জুটিয়ে দাও না ঠাক্‌রুণ, তাহলে ত বেঁচে যাই। তা তোমরা চিরকাল বসে দুধের সাধ ঘোলে মেটাবে, আর বল্‌লেই যত দোষ!" প্রভা হলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, ক্ষণিকা নিজের বোঝা নামাইয়া রাখিবার জন্য বারাণ্ডা পার হইয়া বোর্ডিংএর দিকে চলিল।

জিনিসপত্র রাখিয়া আসিয়া সে যখন পড়ার ঘরে ঢুকিল, মেয়েরা তখন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়াছে। ছোট ছোট স্কুলের মেয়েরা পিঠের উপর বিনুনি ঝুলাইয়া মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছে, হাতের বই বা খাতার মধ্যে চোখ একেবারে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। একটি মহিলা ঘরের এধার হইতে ওধার মাঝে মাঝে ঘুরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি ছোট বড় সকলের উপর একবার করিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। চেহারাটা ভারি রুক্ষ ও সূক্ষ্ম। মুখ ও হাতের যেটুকু দেখা

যায় তাহাতে মনে হয় মাংসচর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলি দিনের আলো দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইনিই বোর্ডিংএর Lady Superintendent বিনোদিনী ঘোষ।

ক্ষণিকা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। বিনোদিনী তখন হলের আর-এক কোণে পিছন ফিরিয়া একটি মেয়েকে পড়া বুঝাইতেছিলেন। সেই সুযোগে চট্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে এককোণে গিয়া বসিল এবং বই খাতা বাহির করিয়া মনোযোগী ছাত্রীর মত বিদ্যা-বারিধিতে ডুব মারিল। মনে মনে ভাবিল, "যাক্, আজ রাত্রিটার মত কৈফিয়ৎ দেওয়া আর সময়-জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে উপদেশ শোনা দুটোই তাকে তোলা রইল।"

তাহার পাশে একটি দশ-বারো বছরের ফ্রক-পরা মোটা-সোটা মেয়ে বসিয়া ছিল, সে ফিশ্‌ফিশ্ করিয়া বলিল, "ক্ষণিদি, তেঁতুলের আচার খাবে? আমি ডেস্কে এনে রেখেছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "চুপ্, বাঁদরামি করিস্‌নে, আর-একবার বুঝি জর করার মত্‌লবে আছিস্?"

মেয়েটি ক্ষণিকার রূঢ়তায় দুঃখিত হইয়া আড়চোখে এধার ওধার চাহিয়া আচারটা নিজেই শেষ করিয়া ফেলিল। ক্ষণিকা এতক্ষণে সত্যসত্যই পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিল, সে এত লক্ষ্য করিল না। খানিক পরেই studyর সময় শেষ হইয়া গেল। সামান্য জলযোগ করিয়া সকলে শোবার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। আধঘণ্টা খানিক এধার ওধার হইতে দুই-চারিটা মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তারপর সব চুপচাপ। কেবল ট্রামের শব্দ তাহাদের শয়ন-কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল, রাস্তার গ্যাসের আলো তীব্র চোখ মেলিয়া জান্‌লার ভিতর দিয়া এই তরুণী ও কিশোরীদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভোরবেলা স্বপ্নরাজ্যে কি একটা বিপ্লব বাধিয়া উঠাতে ক্ষণিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, রাস্তার আলো তখনও স্তিমিত নেত্রে ভোরের নবীন আলোর দিকে চাহিয়া আছে। ট্রাম তখনও চলিতে আরম্ভ করে নাই, মিউনিসিপ্যালিটির মেথরের গাড়ীর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করিতে সাহস করে নাই। তাহার সঙ্গিনীর দল তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্না।

ক্ষণিকার ঘুমটা একান্তই টুটিয়া গিয়াছিল, শুধু শুধু বিছানায় পড়িয়া থাকাটা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। আস্তে-আস্তে খাট ছাড়িয়া উঠিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। আয়া তখন সবে বাহিরের বারাণ্ডা ঝাঁট্ দিতে সুরু করিয়াছে, আর কেহ ঘুম ছাড়িয়া ওঠে নাই। ক্ষণিকা সাম্‌নের সবুজ

ঘাসের উপর নামিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কাল যদু-বাবুদের বাড়ী হইতে আসিবার সময় সে একখানা উপন্যাস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, সেটা তাহার হাতে ছিল। কিন্তু বাস্তব মানুষের দল যেটুকু সময় অনুগ্রহ করিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত অবকাশ দিয়াছে, সেটুকু কাল্পনিক মানুষের কোলাহলে পড়িয়া অপব্যয় করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। হাতের বই হাতেই থাকিয়া গেল, সে ঘাসের ডগায় শিশিরকণার মুকুট আর গাছের পাতায় ভোরের আলোর স্পন্দনের দিকেই চোখকে নিয়োগ করিয়া রাখিল।

হঠাৎ একটা দরজা খোলার শব্দে সে ফিরিয়া চাহিল। দোতলার বারাণ্ডায় সদ্য-জাগ্রতা একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সামনের রাস্তার দিকে তাকাইয়া নীচে চাহিয়া বলিল, "কখন এসেছিস ক্ষণ, দাঁড়া আমি যাচ্ছি নীচে।"

ক্ষণিকা সিঁড়ির গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। মিনিট-দুই পরেই এক জোড়া বর্ম্মি চটিজুতা পায়ে দিয়া, রাত্রিবাসে শিথিল কবরী পিঠের উপর ঝুলাইয়া সেই মেয়েটি নামিয়া আসিল। ক্ষণিকা বলিল, "আমি কাল রাত্রে এসেছি, ঠিক studyর সময়। আপনি বোধহয় তখন ঘরে চলে গিয়েছিলেন।"

"ঘরে যাব কি, আমি তখনও ফিরিইনি। আমার

আস্‌তে কাল দশটা বেজে গেল প্রায়, দরজা ঠেলাঠেলি করে দরোয়ানের তাড়া খেয়ে তবে ঢুক্‌তে পেরেছি।”

ক্ষণিকা বলিল, “ওমা, প্রভা বল্‌লে যে আপনি ফিরে এসেছেন মনোজাদি? চলুন না মাঠে একটু বেড়াই।”

দুজনে আবার নামিয়া পড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। মনোজা বলিল, “প্রভা ত আমার সব খবরই রাখে কিনা। হাতে ওটা তোর কি বই রে?”

ক্ষণিকা বইখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, “Karl Gjellerupএর Minna। চিন্ময়দা এই বইটা খুব recommend কর্‌ল, তাই নিয়ে এলাম।”

মনোজা বলিল, “দুদিন বাদে মেয়ের পরীক্ষা, এখন উনি Gjellerupএর বই পড়্‌তে বস্‌লেন। হৃষীকেশবাবুকে বলে দেব, তা হলে তোকে ক্লাশ থেকে হাঁকিয়ে দেবেন এখন। ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোদের, না? আমাদের কালে নভেল পড়্‌তে হলে খাটের তলায় কিম্বা আল্‌মারির আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌তে হত, আর আজকালকার মেয়েদের সাহস দেখ, আমার নাকের সাম্‌নে নভেল নিয়ে ঘুর্‌ছে। তাও যদি Basket of Flower কি Home Influence হত! তোকে পড়্‌তে হবে না, যাঃ, আগে আমি পড়ি।” এই বলিয়া মনোজা বইখানা হাতে করিয়া একটা লোহার বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা দিন না, খাটের তলায় শুয়েই পড়ব। দিন লক্ষ্মীটি, আমার যে আধখানা পড়া হয়ে রইল।"

"আ গেল যা, কি হাড়-জ্বালানে মেয়ে! একটু যদি ভয় ডর আছে। আমি যে টিচার সেটা আমার মনে থাকে না বলে তোরও থাক্‌বে না নাকি? পালা এখান থেকে, Trigonometry কস্‌গে যা। পড়া হয়ে গেলে দেব এখন। আগে দেখি ছেলেমানুষের হাতে দেবার মত বই কি না, শিক্ষয়িত্রী হওয়ার দায়িত্ব ত রক্ষা কর্‌তে হবে?"

ক্ষণিকা অগত্যা হাসিয়া চলিয়া গেল। উপন্যাস পড়িবার সময়ও তার বেশী ছিল না, কারণ এই সময় ঘণ্টার ঘোর রোল বোর্ডিংবাসিনীদের সুখনিদ্রা হইতে সচকিত করিয়া জাগরণের রাজ্যে আনিয়া ফেলিল। তারপর আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে পরে তাহার কাংস্য কণ্ঠ কেবলি মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল, তরুণী মানবীর মনকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে দিবার চেষ্টা সারা দিন ধরিয়া প্রবল বেগে চলিতে লাগিল।

কলেজ বসিবার সময় হইয়া আসিল। ড্রেসিংরুমে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধা সমাপ্ত করিয়া ক্ষণিকা দুইদিন ব্যবহৃত একটা ব্লাউস হাতে করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এইটা

পরিয়া আজকের মত কলেজ চালাইয়া দেওয়া যায় কি না। তাহার নিজের চোখে জামাটা বিশেষ অপরিষ্কার লাগিতেছিল না, কিন্তু ভয় ছিল পাছে তাহার সহপাঠিনী সাবিত্রী আবিষ্কার করিয়া বসে যে সে এই জামাটাই উপরি-উপরি তিন-চারদিন পরিয়াছে।

পিছন হইতে মিহি গলায় একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, "বেশ দেখাবে গো বেশ দেখাবে। ঐটেই পর, আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আর অত ভাবনা ভাব্‌তে হবে না, এদিকে ঘণ্টা পড়্‌তে আর তিন মিনিট বাকি। শিগ্‌গির চল, মনোজাদি এক্ষুনি ও-বাড়ী চলে যাবেন, তাঁকে আজ যা দেখাচ্ছে, সে আর কি বল্‌ব! চল এখুনি, তা না হলে চিরজীবন একটা আপ্‌শোষ থেকে যাবে।"

ক্ষণিকা গম্ভীরভাবে নিজের কাজ সারিতে লাগিল। কলেজ বসিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল, তখনও তাহার কাঁধের সেফ্‌টিপিন আঁটা হইয়া ওঠে নাই। তাহার সঙ্গিনী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, ঘণ্টা পড়িতেই "তবে থাক, চোরের উপর রাগ করে ভূঁয়ে ভাত," বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা ধীরে সুস্থে হাতের কাজ শেষ করিয়া বই খাতা গুছাইয়া কলেজে চলিল।

টিফিনের ছুটির সময় প্রভা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই,

মনোজাদির সাজ দেখেছিস্? আচ্ছা, কল্পনা কর্ ত বিনোদিনী-দি ঐরকম sea green রঙের শাড়ীজামা পরে চলেছেন," বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ক্ষণিকা বলিল, "আহা মরে যাই, কি কথাই বল্‌লে, তুমি আর তোমার ঠাকুরমা বুঝি একরকম সাজ করে থাক?"

প্রভা বলিল, "এ বাপু তোমার ঢং, তোমার মনোজা-দি না-হয় খুবই তরুণী, তাই বলে বেচারী বিনোদিনীদি মোটেই আমার ঠাকুরমার বয়সী নয়। ইচ্ছে কর্‌লে বেশ এখনও বাহার দিতে পারেন, কতই বা বয়স, বড় জোর বেয়াল্লিশ হবে।"

ক্ষণিকা বলিল, "নিজেই ভাঙ্গিস্, নিজেই গড়িস্। চল্ খেতে, কার কত বয়েস তা নিয়ে কি হবে? তোর নিজের ত আঠারো বছর, তা হলেই হল।"

এমন সময় মনোজা তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। প্রভা ক্ষণিকাকে একটা চিমটি কাটিয়া বলিল, "কই মুখখানা একটু অরুণ-বরণ কর্‌লে না?"

ক্ষণিকা বলিল, "আমার কালো মুখ অরুণ-বরণ হবে কি করে ভাই, বেগুনবরণ বরং হতে পারে দর্কার হলে। আমি কি তোমার মত দুগ্ধালক্তকনিন্দিতবরণা?"

"আচ্ছা ঢের হয়েছে, আর fish কর্‌তে হবে না, আমার

মুখে মিষ্টি কথা শুনে আর তোমার কতটুকুই বা ভাল লাগ্‌বে? যার কথা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশিয়া তোমার প্রাণ আকুল করে দেয় যাও না তার কাছে। দূর হ, তোর সঙ্গে বক্‌তে গিয়ে নিশ্চয় আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দিনে মোটে চার পেয়ালা চা খাই, তাও তোদের জ্বালায় নিশ্চিন্ত হয়ে খাবার জো নেই।"

বিকালে বেড়াইবার সময় ক্ষণিকা আর-একবার Minnaখানা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল। মনোজা তখন আবার সেখানা হাতে করিয়া মাঠের মধ্যের বেঞ্চে আসিয়া বসিয়াছিল। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "এখন বই পাচ্ছ না, যতই মুখ হাঁড়ি কর না কেন? হ্যাঁরে তোর এ মাসের pocket money নিলি না যে বড়? প্রত্যেকবার আমায় সেধে সেধে দিতে হবে নাকি? এমন মেয়ে দেখিনি কোথাও!"

ক্ষণিকা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, "এমাসে কিছু দর্‌কার নেই, তাই চাইনি।" বইয়ের কথা আর উল্লেখও না করিয়া সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল। মনোজা একটুক্ষণ তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া আবার পড়ায় মন দিল।

মাঠের আর-একধারে চারজন মেয়ে মহা উৎসাহে

ব্যাড্‌মিণ্টন খেলিতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিয়া একজন হাঁক দিয়া বলিল, "ক্ষণি, আমার partner হবি আয়, মন্দা যা খেল্‌ছে, একেবারে champion হবার উপযুক্ত।"

মন্দা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "তবে নিলে কেন আমাকে? তন্বী দেখে partner বেছে নিলেই হয়? জানা উচিত তোমার যে এই দেহ নিয়ে পরীর মত উড়্‌তে পার্‌ব না।"

তাহার ক্রুদ্ধা সঙ্গিনী বলিল, "আচ্ছা, ক্ষণি আয়!"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি পার্‌ব না ভাই, আমার মাথা ধরেছে।" সে গাছের ছায়ার ঝরাপাতার মেলার মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িল।

প্রভা তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "কি হল আবার? মানভঞ্জনের পালা অভিনয় কর্‌তে হবে নাকি? কি আহ্লাদী মেয়েই হয়েছিস্ বাবা!"

ক্ষণিকা বলিল, "যা বলেছ! আমাকে আহ্লাদ দেবার জন্যে ভগবান কত আয়োজন করে রেখেছেন, দেখ্‌ছ না? আমি আহ্লাদ কর্‌ব না ত কে কর্‌বে?"

প্রভা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "বাবা, মেয়ের রাগ দেখ না, এমন কিছু বলিনি আমি যার জন্যে আমায় অত খোঁটা দিতে হবে। চল্, সাবি তোকে ডাক্‌ছে খেল্‌তে।"

ক্ষণিকা বলিল, "যা, আমি যাব না।" সে পিছন ফিরিয়া

বসিল। প্রভা চলিয়া যাইতেই তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

( ২ )

শনি-রবিবার কলেজ ছুটি। অধিকাংশ মেয়েই সহরবাসী আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী ছুটি যাপন করিতে চলিয়া গিয়াছে। যাহাদের সে সুবিধা নাই তাহারা সাধাসাধি চেঁচামেচি করিয়া বোর্ডিংএর মাসিমাকে সঙ্গে লইয়া লম্বা গাড়ী চড়িয়া আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে চলিয়া গিয়াছে। বাকি আছে দুচারজন, তাহাদের মধ্যে কাহারও বা অসুখ, কাহারও বা পরীক্ষার পড়ার ভাবনা, কাহারও বা পার্থিব সকল আমোদপ্রমোদ সম্বন্ধে গভীর বৈরাগ্য।

শোবার ঘরের সাম্‌নের লম্বা বারাণ্ডায় বই হাতে করিয়া মাদুর বিছাইয়া ক্ষণিকা বসিয়া আছে। মাদুরের উপর একরাশ পাঠ্য কেতাব ঢালা, হাতের খানা কিন্তু "অপাঠ্য"। Minna আবার ক্ষণিকার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছুটির দিন মনোজা প্রায়ই বাড়ী থাকে না। কলিকাতায় তাহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা প্রচুর, কাহারও না কাহারও বাড়ীতে প্রতি-সপ্তাহেই সে একবার করিয়া বেড়াইয়া আসে। আজও যাইবার আগে সে বইখানা ক্ষণিকাকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকার মন কিন্তু তখন নায়িকা মিনার মনস্তত্ত্বের বদলে আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল। কাল তাহার কান্না কি মনোজা-দি দেখিতে পাইয়াছিলেন? যদি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে কি মনে করিলেন তাহাকে? কেনই বা সে বোকার মত সকলের সাম্‌নে কাঁদিতে গেল?

তাহার সখীর দল কান্নাটাকে অভিমানের কান্না ছাড়া আর কিছুই ভাবে নাই। ভাবিবেই বা কেন? তাহাদের তরুণ জীবনে সংসারের কঠোরতা এখনও ত কোনো দাগা দেয় নাই। বাঁচিয়া থাকার আনন্দেই তাহারা এখন অধীর হইয়া আছে। দুঃখকে তাহারা শুধু কল্পনায় দেখে, তাহা একটা কাব্যসৃষ্টির মশলা মাত্র, মনোরাজ্য ছাড়া তাহার কোথাও যে অস্তিত্ব আছে তাহা ত তাহাদের মনে থাকিবার কথা নয়?

ক্ষণিকাকে এই সদ্যপ্রস্ফুটিত জীবন-লীলার উদ্যানে কে রাখিয়া গেল? সে ত উহাদের মত আলোর স্পর্শে আপনার জীবনের রঙীন পাপ্‌ড়ি মেলিয়া বায়ুর সঙ্গে খেলিয়া দিন কাটাইতে শিখে নাই! তাহার জীবনকলিকা জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই যে দারিদ্র্যকীটদষ্ট, দুঃখ তাহার শিশুকাল হইতে নিত্যসাথী। সঙ্গিনীদের মত জগতের আলো বাতাস, আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ তাহারও হৃদয়দ্বারে আসিয়া আঘাত

করে, কিন্তু তাহার যে হৃদয়দল মেলিয়া দেখাইতে বড় লজ্জা! কি আঁধার, কি ব্যথার কালিমা সেখানে, কি করিয়া সে লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহা তুলিয়া ধরিবে? কিন্তু এই আনন্দের দূতরা ত সহজে ছাড়িতে চায় না, সে যাহা সযত্নে লুকাইয়া রাখিতে চায় তাহাই টানিয়া বাহির করিতে তাহাদের সব-চেয়ে আগ্রহ।

মনোজার প্রতি তাহার যে ভালবাসা কতখানি ছিল তাহার পরিমাণ বুঝিতে তাহার সখীরা কিছু ভুল করিত না। কারণ এ জিনিষটি তাহাদের অপরিচিত নয়। মানুষের তরুণ জীবনে কখন যে অলক্ষ্যে এই প্রেমের ফুল ফুটিয়া ওঠে তাহা সে নিজেই জানিতে পারে না। বাহিরের লোকে তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়, তখন সে বিস্মিত হইয়া নিজের হৃদয়ের গোপন সম্পদে নিজেই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে।

কিন্তু আলো না হইলে ফুল ফোটে কই? বাতাসের স্রোতে তাহার ব্যাকুল আহ্বানের সাড়ায় নিজের সকল সুগন্ধটুকু বিলাইয়া না দিলে তাহার মুকুলিত জীবন একেবারেই যে ব্যর্থ হইয়া যায়! তাই এই ঘরের কোণের ফুলকলিগুলি আলোর রেখা দেখিতে পাইলেই উন্মুখ হইয়া তারি দিকে তাকায়, বায়ুর দোলা একবার অঙ্গে আসিয়া

লাগিলেই সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে ছুটিয়া যায়। মুক্তপ্রান্তরের বুকে, আলোকের বাতাসের চির আলিঙ্গনে বাস করিলে এমন করিয়া তাহাদের আকুল হইতে হয় না। আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সেখানে একই সঙ্গে ফেরে। কিন্তু এ যে বন্দিনী ফুল, ইহার মনোবৃত্তি ত বনফুলের মত সরল পথে চলিতে পায় না।

ক্ষণিকার ভালবাসার পরিমাণ বুঝিতে ভুল না করিলেও তাহার ভালবাসার ধরণ বুঝিতে তাহার সঙ্গিনীরা ভুল করিয়াছিল। তাই অন্য মেয়েকে যে স্থলে ঠাট্টা করিলে সে পুলকিত ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিত, ক্ষণিকা সে জায়গায় কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইয়া উঠিত।

অতি দরিদ্রের ঘরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। শৈশবকালে স্বচ্ছলতা কাহাকে বলে একদিনের জন্যও তাহারা তাহা বোঝে নাই। দুঃখ দারিদ্র্য, অশান্তি ও অসুস্থতার মধ্যে তাহাদের দিন কাটিয়াছে। একসঙ্গে এই কণ্টকাকুল পথে তাহারা যে-কয়টি শিশুযাত্রী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই-তিনটি মাঝ পথেই থামিয়া গেল। জীবনপ্রভাতে মরণের কালো ছায়া তাহাদের পথের বিভীষিকা আরও বাড়াইয়া তুলিল। বেদনা পাওয়া পীড়িত হওয়া এমন তাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে ইহার বিরুদ্ধে যে নালিশ চলিতে

পারে, বিদ্রোহ করা যাইতে পারে তাহারা তাহা একদিনের জন্যও ভাবে নাই।

ক্ষণিকার যখন দশ-বার বৎসর বয়স, তখন হঠাৎ পাশের বাড়ীর এক ছেলের সাইক্‌ল্ চুরি করিয়া তাহার দাদা প্রবোধ ধরা পড়িল। মায়ের কান্না, পিতার নত মস্তক, ভাই-বোনের ভীত কোলাহল, প্রতিবেশীর কৌতূহল-মিশ্রিত সহানুভূতি, সব মিলিয়া ব্যাপারটা যেন ক্ষণিকার হৃদয়ে আগুনের রঙে অঙ্কিত হইয়া গেল। ঘরে চিরদিন সে আঘাত অসুবিধা ভোগ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যথা ছিল কিন্তু লজ্জা ছিল না, আজ বাহিরের সংসারের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় হইল গভীর লজ্জার ভিতর দিয়া। তাহার মন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। বিশ্বসংসারে আঘাত দেওয়া ও পাওয়া ছাড়া আর যে কিছুই নাই, তাহার অপরিণত মনে এই ধারণাই দাগ কাটিয়া বসিয়া গেল। চিরদিন এ ভাব তাহার মনে জাগ্রত রহিল যে আঘাত পাওয়ার মধ্যে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, এই মানুষের জন্মগত অধিকার।

পুত্রের জীবনে অল্পবয়সে এমন কালিমা লিপ্ত হইতে দেখিয়া ক্ষণিকার পিতা শ্রীশবাবু হঠাৎ যেন অনেক বিষয়ে অতিরিক্ত সজাগ হইয়া উঠিলেন। কোনোরকমে বাঁচিয়া থাকিতে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তাহারই সংস্থান করিতে

তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। যে কয়েকটি মানব-শিশুর জন্য তিনি স্রষ্টার কাছে দায়ী ছিলেন, তাহারা যে দুবেলা সুখাদ্য হউক বা অখাদ্য হউক কিছু খাইতে পাইতেছে ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বড় ছেলে প্রবোধ পাড়ার স্কুলে একটি ফ্রী সীট্ অধিকার করিয়াছিল, তার বেশী আর-কিছু করা সে নিষ্প্রয়োজন মনে করিত। স্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অবসর মত ক্ষণিকাকে কিছু কিছু পড়াইতে, আর ক্ষণিকার উপর আদেশ ছিল, সে মায়ের কাছে নিজে পড়িবে, তার পরের বোন মেনকাকে ও ছোট ভাই লালুকে পড়াইবে, মায়ের কাজে সাহায্য করিবে এবং প্রতিবেশিনী ধনী গৃহিণী চিন্ময়ের মায়ের কাছে গিয়া তাঁহার অবকাশ-মত শেলাই শিখিয়া আসিবে।

হঠাৎ চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া প্রবোধ তাহার পিতাকে যেন বিশ হাত জলের তলায় ফেলিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, সব-কিছুর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। প্রবোধ সাধারণ বিদ্যা ছাড়িয়া মহা-বিদ্যা অর্জ্জনে মন দিয়াছে। ক্ষণিকার মা সারাদিন ঘরের কাজে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করার পর ক্ষণিকার পিঠে দুই-তিন কিল লাগাইয়াই তাহার শিক্ষা-কার্য্য সমাপন করেন, লালু আর মেনকার এখনও অক্ষর-পরিচয়ও হইয়া ওঠে নাই, এবং চিন্ময়ের মায়ের

কাছে ক্ষণিকা রোজই যায় বটে কিন্তু ফলে পাকা চুল তোলা এবং কুলের আচার খাওয়ায় তাহার যে পরিমাণ দক্ষতা জন্মিয়াছে, শেলাইয়ে তাহার এক চতুর্থাংশও হয় নাই।

আবার নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রবল উদ্যমে তিনি সংসার তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন। প্রবোধের উপর অবাধে হাত ও মুখের সদ্ব্যবহার চলিতে লাগিল, পুত্রকন্যার শিক্ষায় অবহেলা করার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে রোজ দুবেলা ঝগড়া হইতে লাগিল। লালু ও মিনু বাবার কাছে বকুনি খাইয়া ছেঁড়া বই ও ভাঙ্গা শ্লেট অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া টানিয়া বাহির করিল।

এ-সকলের ফলে আর-কাহারও জীবনের গতির কোনো পরিবর্ত্তন হোক বা না-ই হোক ক্ষণিকার হইল। শ্রীশবাবুর এক ধনীবন্ধু এই সময় তাঁহার সদ্যমৃতা একমাত্র কন্যার স্মৃতি রক্ষার জন্য অনেক দিকে অনেক অর্থব্যয় করিতেছিলেন। কোন্ সূত্রে ক্ষণিকার কথা তাঁহার মনে হইল বলা যায় না, কিন্তু মাস-খানিকের মধ্যেই একটা বৃত্তিলাভ করিয়া, ভাঙ্গা টিনের বাক্সে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া দুই হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ক্ষণিকা কলিকাতায় পড়িতে চলিল। একেবারে নূতন রাজ্যে আসিয়া দিন-কতকের মত সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। এখানে কি যে করিতে হইবে, কেমন করিয়া কথা বলিতে

হইবে, চলিতে ফিরিতে হইবে, কিছুই তাহার জানা নাই। বাহিরের সংসারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যে লজ্জার আভাস তাহার মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই লজ্জা এখানে আসিয়া যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। তাহার এত বয়স অথচ লেখাপড়া সে কিছুই জানে না, নিতান্ত ছোট মেয়েদের সঙ্গে তাহাকে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ কিছুই নাই, পদে পদে সঙ্গিনীদের কাছে তাহাকে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে হয়, তাহার কথাবার্ত্তা চালচলনের মধ্যে কেবলি গ্রাম্যতা প্রকাশ পাইয়া তাহার সহপাঠিনীদের হাসির খোরাক জোগাইয়া দেয়।

কিন্তু তাহার মনের এককোণে কোথায় একটুখানি ক্ষাত্রীবীর্য্য লুকাইয়া ছিল। আঘাত তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল, কিন্তু পাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। অল্প বয়স হইতে ব্যথা সহিয়া তাহার মনের চারিদিকে ক্রমে একটা দুর্ভেদ্য কবচ গড়িয়া উঠিল, তাহাই তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। নিয়তির তাড়না খাইয়া, তাহাকেও হার মানাইবার ইচ্ছা ক্রমেই তাহার তরুণ মনে মাথা তুলিতে লাগিল। নীচু ক্লাশ হইতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সে বার-দুই-তিন ডবল প্রোমোশন পাইয়া অপেক্ষাকৃত সমবয়স্কাদের দলে আসিয়া পড়িল। চালচলনের ত্রুটি, পোষাক-পরিচ্ছদের

অভাব ক্রমে খানিক পরিমাণে দূর হইয়া গেল। এই ম্লান-মুখী বালিকার অসাধারণ অধ্যবসায় তাহাকে শীঘ্রই একটা দেখিবার জিনিষ করিয়া তুলিল।

তাহার সঙ্গিনীরা ক্রমেই তাহাকে নিজেদের একজন করিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ক্ষণিকা প্রথম প্রথম পরিচয় স্থাপনের কোনো চেষ্টা দেখিলেই চমকিয়া ত্রস্ত হইয়া পলাইত। কাছে আসার উদ্দেশ্য আঘাত করা ছাড়া আরও যে কিছু হইতে পারে সে তাহা ভাবিতেই পারিত না।

কিন্তু মন তাহারও উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। কবচের আড়ালে হৃদয়খানি তার অতি স্নেহশীল ও স্নেহপিপাসু ছিল, বারকয়েক ঘা দিতেই সে কপাট খুলিয়া তাহাদের ভিতরে ডাকিয়া নিল। তাহার জীবনে এই প্রথম আনন্দের স্পর্শ ঘটিল। ঠিক এই সময়ে রূপসী তরুণী মনোজা কি কারণে জানি না অকস্মাৎ বোর্ডিংএ শিক্ষয়িত্রীরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম হইতেই ক্ষণিকা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ভিন্ন ইহার মূলে প্রথমে আর-কিছুই ছিল না। তাহার আবহাওয়ার বিশেষত্বে তাহার ভালবাসাও ক্রমে একটু বিশেষ রূপ ধারণ করিল।

ক্ষণিকা যখন প্রবেশিকা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে

তখন হঠাৎ একদিন খবর পাইল যে তাহার দয়ালু সাহায্য-দাতার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রটি বাজে কাজে টাকা খরচ করিবার একান্ত বিরোধী, অতএব ক্ষণিকা যেন পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

বোর্ডিংবাসিনী বালিকাদের চিঠিপত্র সর্ব্বদাই পড়িয়া দেওয়া হয়, সেদিন চিঠি পড়িবার ভার ছিল মনোজার উপর। চিঠিখানা পড়িয়া সে বলিল, "পৃথিবীটা কি সুখেরই যে জায়গা!" চিঠিগুলি মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিয়া সে ঘরে চলিয়া গেল।

খানিক পরে বৈকালিক বেশভূষা সারিয়া নীচে নামিয়া দেখিল, চিঠিখানা হাতে করিয়া ক্ষণিকা সেই একই জায়গাতেই অভিভূতের মত বসিয়া আছে। মনোজা বলিল, "কি গো, বোর্ডিং ছাড়্‌বার ভাবনায় মুখ যে একেবারে ছাইয়ের মত হয়ে গেল! এত টান এই লোহার খাঁচার উপরে? আমি হলে ত বাড়ী যাবার নামে চার পা তুলে নাচ্‌তাম।"

ক্ষণিকা তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল, "আপনি ত আমার বাড়ী দেখেননি।"

মনোজা বলিল, "নিজের বাড়ী যতই খারাপ হোক বোর্ডিং-এর চেয়ে খারাপ নয়। এই বুঝি তোমার বিদ্যে হল এতদিনে?"

ক্ষণিকা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "আপনি বুঝতে পারবেন না।"

মনোজা বলিল, "ভাল, এতদিনে তবু এমন কিছু একটা দেখলাম যা তুমি বোঝ, আর আমি বুঝি না।" এই বলিয়া সে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

রাত্রে studyতে যাইবার আগে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া ক্ষণিকাকে বলিল, "ক্ষণিদি, আপনাকে মনোজাদি ডাকছেন।"

ক্ষণিকা উপরে চলিল। মনোজার ঘরের কাছে আসিবা-মাত্র সে বলিল, "ভিতরে এস।"

ক্ষণিকা ভিতরে ঢুকিল। মনোজা তখন কাপড়ের আলমারি খুলিয়া অসহিষ্ণুভাবে ভিতরের অগোছালো কাপড়ের রাশ টানিয়া বিছানার উপর ফেলিতেছিল। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "এখনো কিছু দেরি আছে studyর, আমার কাপড়গুলো একটু গুছিয়ে দে না! জ্বালাতন বাপু! কাপড়ে কুলোয় না কিছুতেই, অথচ একরাশ জিনিষ গুছিয়ে রাখা এক দায়।"

ক্ষণিকা মাথা হেঁট করিয়া কাপড় পাট করিতে লাগিল। খানিক পরে মনোজা বলিল, "দেখ্, তোর খুব যদি ইচ্ছে যে এখানে থেকে পড়াশুনো করিস্ ত থেকে যা না?"

ক্ষণিকা বলিল, "কি করে থাকব? এ কি আমার হাতে?"

মনোজা বলিল, "আচ্ছা হাতে কি পায়ে সে ভাব্না আমি ভাব্ব এখন। ঘণ্টা পড়েছে মেয়ের কানে ঢোকে না, যা শিগ্গীর !"

ক্ষণিকা বলিল, "কাপড়গুলো—"

মনোজা বলিল, "কাপড় পাট কর্তে আমিও জানি, তোমায় আর বিদ্যে ফলাতে হবে না, এখন যাও।"

ক্ষণিকা থাকিয়া গেল। তাহার থাকার ইতিহাসটা অল্পদিনেই বোর্ডিংএ প্রচার হইয়া পড়িল। ঠাট্টা করিবার ক্ষেত্রটা এমন সুপরিসর হইয়া ওঠায় সকলে খুসি বই দুঃখিত হইল না। মনোজা ব্যাপারটার সমাধান করিয়াই সেটাকে যেন সম্পূর্ণভাবে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। ক্ষণিকার মনোভাব কিন্তু কি রকম যেন ওলটপালট হইয়া গেল।

সংসারের মধ্যে লোকের চোখে পড়াটা সে চিরকালই দুঃখের বলিয়া জানিত। কেন মনোজা তাহাকে আবার এই নিষ্ঠুর দর্শকবৃন্দের সাম্নে রঙ্গমঞ্চের উপর টানিয়া আনিল ? সে ত কাঁদিয়া বিদায় হইয়া যাইতেছিল, দুদিন পরে তাহার অস্তিত্বের কথাও কাহারও মনে থাকিত না। কিন্তু এই যে তাহাকে লইয়া একটা করুণার পালা অভিনয় হইয়া গেল, ইহার আলোতে সে যে সকলের চোখে বড়ই ধরা পড়িয়া গেল। থাকিতে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু এমন করিয়া নয়।

যে দৈন্য নিজে লুকাইয়া রাখিতে সে হৃদয়ের সকল শক্তি দিয়া লড়িতেছিল, এই নিষ্ঠুর করুণাময়ী কেন তাহা সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া দিল? প্রিয় হস্তের আঘাত যে বড় কঠিন হইয়া বাজে। ক্ষণিকা রাগ করিতে গিয়া যেন লজ্জিত হইয়া মাঝপথে থামিয়া গেল।

রাগ করিবে কাহার উপর? ঐ সুন্দরী বিলাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে একবারও ত এ কথা মনে আসে না যে সে নিজে দয়াময়ী সাজিয়া লোকের প্রশংসা কুড়াইয়া বেড়াইতেছে? ক্ষণিকার সঙ্গে তাহার কোথাও যে কোন সম্বন্ধ আছে তাই বা কোথায় ধরা পড়ে? সৌরভ বিলাইয়া ফুল যেমন নিশ্চিন্ত এ যেন ঠিক তাহারই মত। কিন্তু ইহাতেও ক্ষণিকার মন তৃপ্তি পাইল না। সে যদি মনোজার মনোরাজ্যের কোনোখানেই নাই, তাহা হইলে এই অবহেলার করুণার ভার কেন তাহারই মস্তকে তুলিয়া দেওয়া?

দিন কাটিতে লাগিল। মানুষ মনের কথা মনেই রাখে, বাহিরের ব্যবহারে তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ? ঋণী ও ঋণদাতার মনে যাহাই থাকুক, মুখে তাহারা আগেও যেমন কথা কহিত এখনও তাই বলে। মাঝে মাঝে টাকাকড়ির উৎপাত মধ্যে আসিয়া পড়িয়া দুজনকেই সজাগ করিয়া দেয়। মনোজা মনের সঙ্কোচ মনেই রাখিয়া চেষ্টা-কৃত হাস্য-তামাসায়

ব্যাপারটা সহজ করিয়া তুলিতে চায়। ক্ষণিকার চোখের জল কখনও বা চোখের কোণে গোপন থাকে, কখনও বা ঝরিয়া পড়ে। যাহাকে সে দিতে ব্যাকুল, দিবার বেলা তাহার নাগাল কোনও সময় পাওয়া গেল না, নিষ্করুণ ভাগ্যের পরিহাসে তাহার কাছে হাত পাতিয়া কেবল অন্নবস্ত্র গ্রহণ করিতে হইল। তরুণ জীবনে এ কি অভিশাপ!

( ৩ )

শীতকালে সূর্য্য অস্ত যাইতে না যাইতে রাজধানী যেন ব্যস্ত হইয়া অঙ্গে কুয়াসার আবরণ টানিয়া বসে। এই শীত-বস্ত্রটিতে নগরবাসীর বড়ই আপত্তি, তাই সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দরজা জান্‌লা বন্ধ হইতে আরম্ভ হয়।

ক্ষণিকা শুইবার ঘরের জান্‌লাগুলি বন্ধ করিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় নীচে তাহার ডাক পড়িল। নীচে গিয়া শুনিল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে লোক আসিয়াছে, তাহারই জন্য এই আহ্বান।

লোকটি আর কেহ নয় তার বাল্যবন্ধু চিন্ময়। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্ষণিকা বলিল, "এমন সময় আজ যে বড় এলে? মাসিমারা সব ভাল আছেন?"

চিন্ময় বলিল, "হ্যাঁ তাঁরা সব ভালই। একটু বিশেষ দর্‌কারে এসেছি।"

ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

চিন্ময় কথাটা কি করিয়া আরম্ভ করিবে যেন ভাবিয়াই পাইতেছিল না। দুই-তিনবার যেন কিছু বলিতে গিয়া সে আবার চুপ করিয়া গেল। ক্ষণিকার ব্যগ্রতা ক্রমে আশঙ্কায় পরিণত হইতেছিল, সে বলিল, "কি হয়েছে বল না?"

চিন্ময় মরিয়া হইয়া যেন বলিয়া ফেলিল, "তোমার বাবার ভয়ানক অসুখ, তোমায় জানাবার জন্যে প্রবোধ আমায় লিখেছে। আজ রাত্রের ট্রেন যদি ধরা যায়—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া ভাঙ্গাগলায় ক্ষণিকা বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে বাবার, বলনা? এখনও বেঁচে আছেন ত? আমায় লুকিও না।"

চিন্ময় তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "না, না, অত ভয় পেও না, বেঁচে আছেন বই কি, সার্‌বারও এখনও chance রয়েছে। সকলের এমন সময় কাছে থাকা ভাল, তাই যাবার কথা তুল্‌ছি। তোমার মা একলা কতদিকই আর সাম্‌লাবেন বল? মিনু ত ছেলেমানুষ।"

ক্ষণিকা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি বেশ পার্‌ব রাত্রের ট্রেনে যেতে। আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

চিন্ময় বলিল, "আচ্ছা, সাড়ে সাতটায় start কর্‌লেই হবে এখন। আবার কাঁদ্‌ছ কেন? অত ভয় পেলে চলে কখনও। ভাল করে খেয়েদেয়ে নাও গিয়ে, অস্থির হয়ে লাভ ত নেই কিছু, নিজেদের কাজের বার করে দেয় খালি," এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

ক্ষণিকার চোখে তখন চারিদিক আঁধার লাগিতেছিল। চিরজীবন কি তাহার এই ঢেউয়ের উপর মাথা জাগাইয়া রাখিতেই সব শক্তি ক্ষয় করিতে হইবে? এমন দিন কি তার ভাগ্যে একটাও নাই যখন নিশ্চিন্ত হইয়া সে একবার জগৎটার দিকে সংসারের লীলার দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে? এই চিন্তার ধারাটা যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই মনের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তাহার জাগ্রত চৈতন্য তখন এই সদ্যপ্রাপ্ত আঘাত সাম্‌লাইয়া উঠিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছিল। এখন ভাবিবার সময় নাই, কাঁদিবার সময় নাই, সাম্‌নে এখনও যে প্রকাণ্ড একটা সংশয়ের সাগর পড়িয়া। তাহার তীরে না আসিয়া পৌঁছিলে কিছু ভাবিবার অবসর ত সে পাইবে না।

তাহার মুখ দেখিয়া মন্দা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রে ক্ষণির? কাঁদ্‌ছে কেন ও?"

চারিদিক হইতে মেয়েরা হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। তাহাদের শত সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ক্ষণিকার চোখের জল শুকাইয়া গেল। একলা যে ভার অসহ্য ভাবিতেছিল, দশের মধ্যে পড়িয়া তাহাও সহনীয় মনে হইল। ইহাদের তরুণ মুখের মধ্যে আশা যেন বাসা করিয়াছে, চাহিয়াই ক্ষণিকার মনের আঁধার খানিকটা হাল্কা হইয়া গেল।

জিনিষপত্র গোছানো, রাত্রের ট্রেনে খাইবার খাবার ঠিক করা, সবেরই ভার তাহার সঙ্গিনীরা যাচিয়া গ্রহণ করিল। ক্ষণিকাকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য সকলে তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া অনুরোধ-উপরোধে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বিনোদিনী-দিদিকে সকল ঘটনা খুলিয়া বলা, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করা, সেটুকুও ক্ষণিকাকে নিজে করিতে হইল না।।

চিন্ময় আসিয়া দেখিল ক্ষণিকা বাক্স বিছানা গুছাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। গাড়ী ডাকিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল।

ট্রেনে সেদিন অসম্ভব ভীড়। ইণ্টারমিডিয়েটের ফিমেল গাড়ীর যাত্রিনীর দল দেখা গেল অধিকাংশই সর্দ্দিতে আক্রান্ত। তাঁহাদের দুর্গন্ধ কাঁথা কম্বল এবং আর্ত্তনাদকারী

শিশুদলের মধ্যে কোনমতে একটুখানি জায়গা করিয়া ক্ষণিকা বসিয়া পড়িল। অবিশ্রাম কলরব এবং মুক্ত বায়ুর একান্ত অভাবে দেখিতে দেখিতে তাহার মাথাটা ধরিয়া উঠিল। তাহার পাশের জান্‌লাটা খুলিয়া দিবা-মাত্র একজন সহযাত্রিণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া বসিবার প্রবল চেষ্টায় বেঞ্চিসুদ্ধ সকলকে উল্টাইয়া দিবার উপক্রম করিলেন। একটি প্রৌঢ়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "শীতকালে কি এত হাওয়া খাওয়ার ঘটা বাছা, ছেলেপিলে এতগুলো কচিকাচা রয়েছে, ঠাণ্ডা লেগে যে অসুখ কর্‌বে!" উল্লিখিত ছেলেপিলেগুলি তখন তিনচারখানা লেপ কম্বলের আবরণ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার সরব এবং প্রবল চেষ্টায় গাড়ীর মধ্যে মহা বিপ্লব বাধাইয়া দিয়াছিল। ক্ষণিকা তাহাদের লাল ঘর্ম্মাক্ত মুখগুলির দিকে তাকাইয়া প্রৌঢ়ার মন্তব্যটা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া গেল। জান্‌লা খোলাই রহিল।

তাহার গম্যস্থান বেশীদূরে ছিল না। তিন-চার ষ্টেশন পরে, আন্দাজ দশটা সাড়ে দশটার সময়ই সে তাহার খাঁচার মত গাড়ীখানি ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল। ষ্টেশনটি বিশেষ বড় নয়, আলোর ঘটাও অল্পই, যা দু-চারটি আছে তাহাতে প্ল্যাটফর্ম্মে আলো-আঁধারের খেলাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

কুলি-মজুরের উৎপাত বড় এসব জায়গায় দেখা যায় না। গাড়ীর একটানা দোলানিতে ক্ষণিকার একটু ঘুম আসিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় "এইখানে নাম্‌তে হবে," শুনিয়া সে চমকিয়া খাড়া হইয়া বসিল। চিন্ময় লাফাইয়া গাড়ীর ভিতর উঠিয়া বাক্স বিছানা টানাটানি করিতে লাগিল। মহিলার দল অধিকাংশই তখন নিদ্রার আরাধনা স্থরু করিয়াছেন, এ-হেন অনধিকার প্রবেশে সচকিত হইয়া লেপ তোষক যে যা হাতের কাছে পাইলেন তাহা দ্বারাই নিজের নিজের পর্‌দা-নশীনত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টিত হইলেন।

প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িয়া ক্ষণিকা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "রাত্রে কি গাড়ী পাওয়া যাবে?"

চিন্ময় বলিল, "হ্যাঁ, তেমনি দেশ আমাদের! একটু দাঁড়াতে পার্‌বে? এখান থেকে রহমতের গাড়ীর আড্ডা দেড়-দুই মিনিটের পথ বড় জোর, একবার ডাকাডাকি করে দেখি।"

ক্ষণিকা একবার চারিদিকে তাকাইল। ষ্টেশন বলিতে ত একটি প্ল্যাটফর্ম্ম, একটি পাকাঘর, এবং গোটা-দুই টিনের শেড্‌। লোকজনের চেহারা বড় কোথাও একটা দেখা যাইতেছে না, কেবল সাম্‌নের শেড্‌টাতে কয়েকটা বস্তার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া একজন মানুষ অকাতরে ঘুমাইতেছে,

মাথার কাছে তাহার একটা মিট্‌মিটে হ্যারিকেন লণ্ঠন। প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া নীচের পাকা রাস্তায় নামিয়া যাইবার সিঁড়িটা তাহার আলোয় অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। চিন্ময় আবার বলিল, "কি বল, দাঁড়াবে?"

ক্ষণিকা বলিল, "না চিন্ময়দা, কাজ নেই। সময় নষ্ট কর্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না, চল হেঁটেই যাব। বিছানাটা আমায় দাও, খুব হাল্কা, আমি নিতে পার্‌ব, বাক্সটা তুমি নাও।"

"হ্যাঁ, তা না ত আর কিছু!" বলিয়া বাক্স বিছানা দুই কাঁধে করিয়া চিন্ময় সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণিকা অগত্যা তাহার পিছনে চলিল।

রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াই কপালক্রমে একটা লোক পাওয়া গেল, সে মোট বহিতে রাজি হইল। তাহার মাথায় বাক্স বিছানা তুলিয়া দিয়া তখন দুইজনে খুব পা চালাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীর একঘেয়ে রাগিণী ছাড়া কোথাও আর বড় একটা শব্দ নাই। শীতের বাতাস যেন বরফের তীরের মত দেহ ভেদ করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। ছেঁড়া র‍্যাপারে আপনাকে তিন-চার পাকে জড়াইয়া, বুকের কাছে হাত জড়ো করিয়া ক্ষণিকা কোনওক্রমে

চিন্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল। চিন্ময়ের দীর্ঘ পদক্ষেপের সঙ্গে সমানে পা ফেলিতে ফেলিতে তাহার নিশ্বাস ক্রমেই দ্রুততর হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু নির্জ্জন আঁধার পথের দিকে চাহিয়া পিছাইয়া পড়ার ভয় তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। যাইবার আগ্রহ ক্ষণিকার তাহার চেয়ে বেশী বই কম নয়, চিন্ময় এইটুকুই মনে রাখিয়া সজোরে পা চালাইয়া চলিল, মনের আগ্রহকে যে শরীরের ক্ষমতার পরিমাণে চলিতে হয় সে-কথাটা মনে রাখিল না।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাহারা বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। একতলা ছোট বাড়ী, সদর দরজা তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার জীর্ণ বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া দুই-একটি আলোর ফোঁটা বাহিরের কালোর গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

দরজার গায়ে করাঘাত করিয়া চিন্ময় ডাক দিল, "প্রবোধ!"

দরজার হুড়্‌কাটা হড়াশ করিয়া খুলিয়া গেল। কেরোসিনের একটা কুপী হাতে করিয়া আলোর চেয়ে বেশী পরিমাণে ধূম ছড়াইতে ছড়াইতে প্রবোধ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। চিন্ময়কে দেখিয়া বলিল, "চিনে যে রে, একেবারে ক্ষণিকে শুদ্ধ নিয়ে হাজির!" তাহার সুগন্ধি কেশ-

তৈলের সঙ্গে কেরোসিনের সে জায়গায় যেন একটা যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কে কাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে।

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন দাদা ?"

প্রবোধ বলিল, "তেমনিই আর কি। ওসব রোগের ভালমন্দ কি আর চট্ করে বুঝ্‌বার জো আছে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "কি হয়েছে, কি অসুখ ? আমাকে চিন্ময়দা কিছু ভাল করে বলেনি।"

প্রবোধ হাত দিয়া একটা শ্লেষের ভঙ্গি করিয়া বলিল, "কি অসুখ তা না জানিয়েই ঘোড়দৌড় করে চলে এলে ? চিনের বুদ্ধিও আচ্ছা !"

চিন্ময় এতক্ষণ পয়সা দিয়া মুটেটাকে বিদায় করিতেছিল। প্রবোধের শেষ মন্তব্যটা শুনিয়া বলিল, "না, বুদ্ধি আর কৈ ? এইবার তোমার কাছে একটু ধার করব। এই বিছানাটা ঘরে নিয়ে চল। কাকাবাবু সেই ঘরেই ত ?"

প্রবোধ মাথা নাড়িয়া তাহার কথায় সায় দিয়া বিছানা লইয়া ঘরের দিকে চলিল। কথাবার্ত্তার শব্দে মেনকা উঠিয়া পড়িয়া বারাণ্ডায় আসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতেছিল। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "এই আস্তে, অত জুতোর শব্দ কোরো না।"

পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা দুই বোনে একটা ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে মলিন বিছানার উপর

তাহাদের পিতা নিশ্চল নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছেন, ক্ষণিকার মা তাঁহার পাশে বসিয়া। মেয়েকে দেখিয়া ইসারা করিয়া তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন।

ক্ষণিকা তক্তপোষের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। পিতার অচৈতন্য দেহের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। ফিশ্‌ফিশ করিয়া কোনোমতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে এমন হল মা ? কিছু ত আগে অসুখ ছিল না ?"

ক্ষণিকার মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "এই-খানে লেখা ছিল।"

ক্ষণিকা সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। এই-যে জড়পিণ্ডবৎ দেহ, এর মধ্যে কোথায় তাহার পিতা ? যাহাকে সে এতদিন ধরিয়া, সকল বিপদে সকল দুর্দ্দিনে নিজেদের একমাত্র সহায় ও রক্ষকরূপে জানিয়া আসিয়াছে, তিনি কেমন করিয়া এমন অসহায় শক্তিহীন কৃপার পাত্র হইয়া পড়িলেন ? যাহারা নিজেরা আশ্রয়ের জন্য চিরদিন ইঁহাকে অবলম্বন করিয়াছিল, আজ কি করিয়া তাহারা এক-সঙ্গে এই অসহায় মানুষটির আর আপনাদের ভার বহন করিবে ?

খানিক পরে তাহার মা বলিলেন, "যা ওঘরে গিয়ে শুগে যা। ট্রেন থেকে এলি ক্লান্ত হয়ে, খেয়ে এসেছিস্ ত ?"

ক্ষণিকা বলিল, "খেয়েছি। আমি এখন যাব না বাবার কাছ থেকে।"

তাহার মা বলিলেন, "একটু শুগে যা, খানিক পরে ডাক্‌ব, আমি ত সারারাত পারি না, মিনু প্রবোধ দুজনে সমানে রাত জাগে। না জেগে উপায়ই বা কি?"

ক্ষণিকা তবু নড়ে না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "গোড়া থেকেই কি এমনি হয়ে গেলেন মা?"

"গোড়া থেকেই বাছা। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে বল্‌লেন—'আজ আর ছেলে পড়াতে যাব না, শরীর কেমন কর্‌ছে, এক গেলাস জল এনে দাও ত।' রান্নাঘরে তখন কড়া চড়িয়েছি, মিনুকে দিয়ে জল পাঠিয়ে দিলাম, সে ঘরে গিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল। ছুটে গিয়ে দেখি খাটের উপর পড়ে, মাথাটা নীচে ঝুলে পড়েছে, চোক উল্টে গেছে। ভাগ্যে প্রবোধ তখন এসেছিল, তা না হলে কি সর্ব্বনাশই যে হত! ডাক্তার এল, দেখ্‌ল, ওষুধ-বিষুধ কত কি বলে গেল, কিন্তু তখন থেকে অমনিই ত রয়েছেন, জ্ঞানও হয়নি, কিছুই না।"

ক্ষণিকা আরও খানিক বসিয়া রহিল। ক্লান্তিতে তাহার পিঠ যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। অবশেষে মায়ের অনুরোধে পাশের ঘরে গিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া মিনুর পাশে

কোনোক্রমে একটু জায়গা করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রোদ আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছে, ভাই-বোনেরা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছে, সেই একেলা শুইয়া।

ধড়মড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল। মেনকা সেই-সময় আসিয়া ঘরে ঢোকাতে তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "মিনু, আমাকে রাত্রে তুল্‌লি না যে বড় ?"

মেনকা বলিল, "মা যে বারণ কর্‌লেন, বল্‌লেন 'আহা আজ রাত্তিরে ঘুমিয়ে নিক্‌, কাল থেকে ত জাগ্‌তেই হবে।' তাই আমি আর দাদা তিন্‌টে অবধি জাগ্‌লাম, তারপর চিন্ময়-দা ভোর অবধি ছিলেন, এই একটু আগে গেলেন।"

ক্ষণিকা ভাবিল—মন্দ নয়। পিতার শুশ্রূষা করিতে আসিয়া সে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়া দিল, মাঝখান হইতে পরের ছেলে চিন্ময় রাত জাগিয়া বসিয়া রহিল। যাহা হউক এখন সে-কথা ভাবিয়া কোনো লাভ নাই, সে উঠিয়া পড়িল।

রান্নাঘর ছাড়া, থাকিবার ঘর তাহাদের মাত্র দুইখানি। বাড়ীটাতে আরও দু-একটা ঘর আছে, কিন্তু তাহা স্থানীয় স্কুলকে ভাড়া দেওয়া। সেখানে তাহাদের কি-সব জিনিষ-পত্র তালাবন্ধ করা আছে। ইহাতে দরিদ্র পরিবারের অল্প

কিছু অর্থাগম হয়, কাজেই নিজেদের থাকিবার কষ্টটা তাহারা কোনমতে সহ্য করিয়া যায়।

গৃহকর্ত্তার অসুখে সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণীকে অধিকাংশ সময়ই পীড়িত স্বামীর সেবায় কাটাইতে হয়। প্রবোধ ডাক্তার ডাকা, ওষুধ কেনা এবং পিতার অল্প-স্বল্প পরিচর্য্যা করিয়াই এমন ভাব দেখায় যেন সমস্ত পরিবারকে সে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতার পাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বাকি মেনকা আর লালু। মেনকার শরীরটা কোনোকালেই বিশেষ সবল নয়, তাহার মা যথাসম্ভব তাহাকে সংসারের কাজে অব্যাহতি দিয়া চলিতেন। এখন সংসারের রন্ধনাদি সমস্ত কাজ তাহার স্কন্ধে পড়াতে সে একান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবু ভগিনীবৎসল লালু আপনার পৌরুষ-গর্ব্বের যথেষ্ট হানি স্বীকার করিয়াও তাহার মশলা বাঁটা, কুট্‌নো কোটার সাহায্য করিয়া কোনো রকমে দুবেলার খাওয়ার ব্যাপারখানা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ক্ষণিকা বাহিরে আসিয়া দেখিল, কনুই অবধি কয়লার গুঁড়া মাখিয়া মেনকা উনুন ধরাইতেছে, লালু একখানা ভাঙ্গা পাখা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দিদির কাজের অংশটা শেষ হইলেই সে আরম্ভ করিবে। ক্ষণিকা বলিল, "মিনু, তুই বেরিয়ে আয়, আমি করছি, তুই ঘরের বিছানা-

গুলো রোদে দিয়ে, ঘর-দুটোয় একটু ঝাঁটপাট দে। যা হয়ে রয়েছে!"

মেনকা মাথা দুলাইয়া বলিল, "আমি ওসব পার্‌ব না বাপু এখন। একটা কাজের মাঝ থেকে উঠে যেতে একটুও ভাল লাগে না আমার। তুমি ওগুলো সেরে ফেল গিয়ে, ওবেলা থেকে না হয় আমি কর্‌ব।"

মেনকার গিন্নিপনা দেখিয়া ক্ষণিকা একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। লালু আর মিনুতে মিলিয়া তখন উনুন খুব চট্‌পট্‌ ধরাইয়া ফেলিল। লালু বলিল, "ছোড়্‌দি দেখ, আজ আমি ডালটা রাঁধ্‌ব, তোমায় জলও দেখিয়ে দিতে হবে না কিচ্ছু না।

মেনকা নবলব্ধ গৃহিণীপনার মর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে বলিল, "হ্যাঁ, গঙ্গাসাগর বইয়ে দাও আর কি। তারপর সবাই ডালের বাটিতে সাঁতার কাটুক।"

লালু গাল ফুলাইয়া বলিল, "আহা, নিজে ত আমার চেয়ে কতই ভাল রাঁধেন! সেদিন ভাতের হাঁড়ি উল্টে দিল কে শুনি? যাও, তা হ'লে আমি কিছুই কর্‌ব না।"

অবশেষে রফা হইল ডালটা লালু স্বাধীনভাবে রাঁধিতে পাইবে বটে, কিন্তু নুনটার পরিমাণ বড়দিকে দেখাইয়া লইতে হইবে। লালু খুসি হইয়া বড় ঘটীর একঘটী জল আনিয়া কড়ায় ঢালিয়া ডাল চড়াইয়া দিল।

ক্ষণিকা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার পিতার শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। তাহার মা তখন হাতমুখ ধুইয়া আবার বিছানার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন এখন মা ?"

মা বলিলেন, "সকালে একবার চোখ চেয়েছিলেন, চিন্‌তে পার্‌লেন ত মনে হল ; কি একটা যেন বল্‌লেন, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।"

ক্ষণিকার বুকে যেন আশার জোয়ার আসিয়া পড়িল। সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এবার তা হলে সেরে উঠ্‌বেন, না ?"

তাহার মা বলিলেন, "তাই যেন ভগবান করেন। প্রবোধকে ত সকালেই ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি, দেখি তিনি কি বলেন।"

ক্ষণিকা পাশের ঘরে গিয়া সেই অসাধারণ এলোমেলো আর ধূলির মেলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। বিছানা রোদে দিয়া, বাক্স ঝাড়িয়া, ছেঁড়া বই-খাতার রাশ গুছাইয়া, চারিদিকে ছড়ানো কাপড় পুঁটলি বাঁধিয়া, সে যখন ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল, তখন বাহিরে জুতার শব্দে চাহিয়া দেখিল, প্রবোধ ও চিন্ময়ের সঙ্গে একজন অপরিচিত যুবক তাহাদের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

( ৪ )

ডাক্তার বাহির হইয়া যাইতেই ক্ষণিকা ছুটিয়া গিয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌লেন মা ?"

তাহার মা বলিলেন, "ভালই ত বল্‌ছেন বাছা, যে রোগ প্রথমে ভেবেছিলেন তা নাকি নয়। এক বৎসর অন্ততঃ একেবারে কাজকর্ম্ম কর্‌তে বারণ কর্‌ছেন, খুব যত্নে রাখ্‌তে হবে। কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা যাতে না করেন তাই দেখ্‌তে বল্‌লেন।"

ক্ষণিকা কিছু বলিবার আগেই প্রবোধ বিকট একটা মুখভঙ্গি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার রকম দেখিয়া ক্ষণিকার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাহার মা পিছন ফিরিয়া ছিলেন, কাজেই ছেলের ভাবখানা দেখিতে পান নাই, তাহার চলিয়া যাওয়ার শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ওমা, চলে গেল প্রবোধ, দুটো বেদানা এনে রাখ্‌তে হবে যে! ডাক্‌ ত ওকে ক্ষণু!"

ক্ষণিকা বলিল, "আর ডেকে কাজ নেই, আমি লালুকে দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে লালুর সন্ধানে চলিল। লালু তখন স্কুলে যাইবার আয়োজন করিতেছে, ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "ডাল খেয়ে দেখো, ছোড়্‌দিদির চেয়ে একটুও খারাপ

রান্না হয়নি। ছেলেরা ইচ্ছে কর্‌লে সব কাজই কর্‌তে পারে!"

ক্ষণিকা বলিল, "তা ত নিশ্চয়ই। আচ্ছা ইস্কুল থেকে ফির্‌বার সময় ইচ্ছে করে দুটো বেদানা নিয়ে আসিস্ ত। ভুলে যাস্‌নে যেন।"

লালু বলিল, "আচ্ছা, টিফিনের সময়ই কিনে রাখ্‌ব এখন, কাছেই একটা মেড়োর দোকান আছে।" সে চটি-জুতা-দুটোকে ফট্‌ফট্ করিতে করিতে বই খাতা লইয়া যাত্রা করিল।

ঠিক সেই-সময় ঘরে ঢুকিয়া প্রবোধ বলিল, "শুন্‌লি ডাক্তারের লম্বা অর্ডারখানা? ও-সব রোগ রাজা বাদ্‌শাহ হলে করা পোষায়, ও কি আর গরীব ইস্কুল-মাষ্টারের কর্ম্ম?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা ত বটেই, রোগ কর্‌বারই বা বাবার কি অধিকার? এমন সব গুণের ছেলেমেয়ে যাঁর তাঁর মর্‌তে বস্‌লেও শোবার কথা ভাব্‌তে নেই।"

প্রবোধ বলিল, "ইস্পিচ্ দিতে ত খুব তয়ের আছ, আর কিছু না পার! আমাকে অত শোনান কেন বাবা, আমি কিছু পার্‌ব-টার্‌ব না। আমাকে কি অক্‌স্‌ফোর্ড পাঠিয়ে পড়িয়ে এনেছেন যে এখন বসে খেতে চাইলেই খাওয়াব?

মুখে ত সারাক্ষণ কপ্‌চাচ্ছ যে ছেলেমেয়ে সব একেবারে সমান, পড়াশুনোতেও নাকি দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছ, তা এইবার ঠেলা সামলাও না ? আমার স্পষ্ট কথা, আমি অত ভূতের বোঝা বইতে পার্‌ব না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা, সেই ভাল কথা। আগের থেকে বকে মর্‌ছ কেন ? কেউ কি তোমার কাছে খেতে চেয়েছে ?"

এমন সময় রান্নাঘর হইতে মেনকা চীৎকার করিয়া বলিল, "দিদি শিগ্‌গীর এসো, আমি আলু-ভাতে মাখ্‌ছি, দুধটা এখুনি উথ্‌লে পড়ে যাবে। আর দাদাকে জিগ্‌গেস কর ত সে আজ খাবে-দাবে, না আমি সারাদিন তার ভাত আগ্‌লে বসে থাক্‌ব ? তুমি হয় আগে নেয়ে খেয়ে নিয়ে মাকে পাঠিয়ে দাও, না-হয় মাকে এখন খেয়ে নিতে বলো, তুমি বাবার কাছে গিয়ে বোসো।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি বোনের সাহায্য করিতে ছুটিল। বাড়ীর সকলকে খাওয়াইয়া, রুগ্ন পিতার পথ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া এবং নিজের খাওয়া সারিয়া উঠিতে তাহার বেলা একটা বাজিয়া গেল। মেনকা হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ওবেলা থেকে আমার ছুটি কিন্তু দিদি। আর পারি না বাপু খাট্‌তে।"

ক্ষণিকার হাসি পাইল। এই কাল অবধি সে পৃথিবীর শত সহস্র অনাবশ্যক মানুষের মধ্যে একটা বই আর কিছুই ছিল না, হঠাৎ আজ এত অত্যাবশ্যক কেমন করিয়া হইয়া পড়িল? অজ্ঞান অচৈতন্য পিতা হইতে মেনকা অবধি সকলে যেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সংসার-সাগরে ভাসিয়া থাকিতে চাহিতেছে। কিন্তু ইহাতে গৌরব থাকিলেও আশঙ্কা যে সে গৌরবের অর্দ্ধ আসন দাবি করিয়া বসিতে চায়! কাল অবধি তার সবার বড় এই দুঃখই ছিল যে ভগবান সংসারে তাহাকে হাত পাতিতেই পাঠাইয়াছেন, আজ কি সে দুঃখ রূপান্তরিত হইয়া দানে অক্ষমতার মূর্ত্তি ধরিল?

ক্ষণিকার মা মেনকার কথার উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ, এবার ক্ষণু এসেছে, আর আমিও একটু ছাড়া পাব, তোকে আর অত খাটতে হবে না। পড়াশুনো ত একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিস্, আবার অল্পে অল্পে সুরু কর্, তা না হলে চলে কখনো? এ ত আর আমাদের মত নয় যে দশ বছরে মা-বাপে টাকাকড়ি দিয়ে একজনের গলায় ঝুলিয়ে দেবে আর চিরজীবন তার ঘাড়ে বসে খাব? একদিন যদি মানুষের অসুখ বিসুখ হল ত পরদিনের চালের সংস্থান নেই।"

সকলের কথারই আজ এক সুর! এই যে অর্থসমস্যা

এই ক্ষুদ্র পরিবারের মনের আকাশে কালবৈশাখীর মেঘের মত অল্পে অল্পে ঘনাইয়া উঠিতেছে ইহাকে তাহারা কেহই কিছুতেই ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছে না। একটি-মাত্র মানুষের ভরসায় তাহারা এই নিষ্ঠুর সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও কোনো রকমে টিঁকিয়া আছে, কিন্তু এই ভরসাও ত লুপ্তপ্রায়। তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখা এবং নিজে বাঁচিয়া থাকা দুই ভাবনা মিলিয়া তাহাদের একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

মেনকা হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "চিরজন্ম কেবল এই করেই কাটল। আমাদের মত মানুষের বেঁচে থাকা না-থাকা দুইই সমান। কিসের জন্যে যে আমরা এত ভুগি তাও জানি না।"

ক্ষণিকার মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "অমন কথা বলতে নেই মা, আমরা কি সব বুঝি? কত লোক আমাদের চেয়েও দুঃখী আছে। ঐ দেখ না মধু জেলের ছেলে-মেয়েগুলোর দশা, বেচারীরা কোনো দোষে দুষী নয়, মেয়েটিকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় এমন ধীর শান্ত, অথচ কি দুঃখ!"

মেনকা অধীর হইয়া উঠিয়া বলিল, "আর ঐ যে সুখময়-বাবুর মোটা ধুম্‌সী মেয়ে পঙ্কজিনী, কি তার গুণ শুনি? কোন্ গুণে তার জন্মে অবধি মাটিতে পা দিতে হল না আর

রেশম ছাড়া সুতো পর্‌তে হল না? ভাল হলেও যদি দুঃখ হয়, আর মন্দ হলেও যদি সুখ হয় তবে কেন মন্দ হব না?"

ক্ষণিকা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "আচ্ছা ঢের পণ্ডিতি ফলানো হয়েছে, উঠে যা। ভারি এক সুখ চিনেছেন। যা পড়্‌গে যা, ওবেলা ঠিক আমি তোর পড়া নেব।"

মেনকা রাগ করিয়া গাল ফুলাইয়া চলিয়া গেল। গৃহিণী আবার স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে চলিলেন। ক্ষণিকা সেই-খানেই বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। মেনকা ছেলেমানুষ, কথাগুলা ছেলেমানুষের মতই বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথার এক জায়গায় ক্ষণিকারও মনটা সায় দিয়া উঠিল। সত্যই ত। এ জগতে কেনই বা সুখ, কেনই বা দুঃখ। মেনকা অবশ্য সুখকে কেবল ভোগসুখের দিক দিয়াই বুঝিয়াছে, তাহার মনে সুখ কেবল রজতচক্রের রূপেই এখনও বিরাজ করে। কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক উর্দ্ধে যে আনন্দের স্থান, তাহা কেন এমন কার্য্য-কারণ-পরম্পরার অতীত? বিধাতা কোন্ গোপন রহস্য-লোকে এই আনন্দের ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার চাবি মানুষের হাতে পাইবার উপায় নাই? অচিন্ পাখীর মত কেন এই আনন্দ হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলিয়া যায়? কেন মানুষের ক্ষুধিত প্রাণ তাহাকে হৃদয়-কারাগারে বন্দী করিয়া

রাখিতে পারে না? যোগ্যতম যে সেই ত কেবল ইহার দর্শন পায় এমন নয়? কত অযোগ্য পাত্রে সে এই রসের ধারা অজস্র ঝরিতে দেখিল, কত যোগ্য পাত্রকে চিরকাল শুষ্ক কঠিনতার বোঝা বহন করিয়া মরিতে দেখিল। শোনা যায় এই বিশ্বসংসার এক অলক্ষ্য নিয়ম-সূত্রে গ্রথিত, কেন সে নিয়মের সন্ধান সাধারণ মানুষ খুঁজিয়া পায় না? মন বলিয়া বালাই যাহারই আছে, তাহাকে কেন চিরদিন এই প্রশ্ন মনে বহিয়া বেড়াইতে হয়? উত্তর কেন কোথাও নাই? আর উত্তর যদি নাই, তবে সে কথাই মানুষ মানিয়া নেয় না কেন? যাহা পাইবার নয়, তাহারই সন্ধানে কেন তাহাদের প্রাণ কেবলই আকুল হইয়া ছুটিয়া যাইতে চায়?

কিন্তু ভাবনার সময় তাহার বেশীক্ষণ রহিল না, মেনকা ঘর হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, একবার এ দিকে আসবে?"

ক্ষণিকা রান্নাঘর ছাড়িয়া শোবার ঘরে আসিয়া বলিল, "কি?"

মেনকা একটা ছাই-রঙের ময়লা গরম শার্ট তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এর থেকে লালুর একটা জামা হয় না কি, দেখ। আমি ওসব পারি-টারি না। এদিকে শীতে ও-বেচারার হাড়গোড় সুদ্ধ জমে যাবার জোগাড় হয়েছে।

এই মাসে ওকে একটা কোট কিনে দেবার কথা ছিল, তা এ মাসে পেটের ভাত জুট্‌বে কি না তারি ঠিক নেই তা গায়ের কোট।”

মেনকার এমন মূর্ত্তি ক্ষণিকা আগে কখনও দেখে নাই। এক বৎসর আগে অবধি যাহাকে দেখিয়া গিয়াছে, সে অপরিণতবুদ্ধি বালিকা মাত্র, দেহ মন কোনোখানেই তাহার সংসারের তপ্তলোহের ছেঁকা লাগে নাই। খেলাধূলা, পড়া ফাঁকি দেওয়া এবং লালুর সহিত ঝগ্‌ড়া-বিবাদ এবং ভাব এই লইয়াই তাহার দিন কাটিত। হঠাৎ সে নিজের শৈশবকে কেমন করিয়া ডিঙাইয়া আসিল? তাহার কথার সুর যে অবিকল সংসারভারপ্রপীড়িতা প্রৌঢ়ার মত? এই একটু আগেও যখন সে লালুর সহিত ডাল রাঁধা লইয়া ঝগ্‌ড়া করিতেছিল, তখন ক্ষণিকা মনে করিয়াছিল যে অন্ততঃ ইহাদের মনকে এখনও দারিদ্র্য-রাক্ষসী আক্রমণ করে নাই, শৈশবের স্বপ্নরাজ্যে এখনও দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল আসিয়া দেখা দেয় নাই; বাল্যজীবনের যে ঐশ্বর্য্য অর্থ দিয়া কিনিতে হয় না তাহাই এখন পর্য্যন্ত এই দুটি বালকবালিকার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। মেনকার তীব্র গলার আওয়াজ তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল, যে, দুটির মধ্যে একটির অন্ততঃ চোখের রঙীন ঘোর চিরদিনের মত কাটিয়া

গিয়াছে, এবং যাহাদের অক্ষমতায় সে এত অল্পবয়সে এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল তাহাদের প্রতি মেনকার শ্রদ্ধাভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিমাণ বুঝিতেও তাহার একটুও দেরি হইল না। নিজের নিরানন্দ ক্লিষ্ট বালিকাজীবনের স্মৃতিই যেন পথপ্রদর্শক হইয়া তাহাকে মেনকার মনোরাজ্যের সকল অলিগলিতে ঘুরাইয়া আনিল। মেনকার কথার আর কোনো উত্তর না দিয়া সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নিজের গরম জ্যাকেট আছে ত ?"

মেনকা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "কচু আছে। তিন বছর আগে তুমি যেটা দিয়েছিলে সেটার হাতটা ছিঁড়ে গেছে, পরে কোথাও বেরতে লজ্জা করে। সেদিন চিন্ময়দাদের বাড়ীতে মুটকী পঙ্কজিনী এসেছিল, আমায় দেখে বল্‌লে—আমার একটা কচি কলাপাতা রঙের গরম জামা ছোট হয়ে গিয়েছে, মিনুকে পর্‌লে দিব্যি মানায়, তা আমার পরা জামা কি আর মিনু নেবে !"

ক্ষণিকা বলিল, "তুই কি বল্‌লি ?"

"বল্‌ব আবার কি ? দিলে নিতাম, তাই বলে চেয়ে নিতে ত আর পারি না ?"

ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, নিতে হবে না ওর জামা। আমার একটা ব্লাউস্ বেশী আছে তাই তোকে

দেব এখন। পরের জিনিষ যত কম নেওয়া যায় ততই ভাল!”

মেনকা বলিল, “আহা, পরের জিনিষ নিতে বড়ই কসুর করেছি আমরা।”—বলিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। পঙ্কজিনীর প্রতি বিরাগ তাহার যতই থাক্, তাহার জামাটার প্রতি নিছক অনুরাগ ভিন্ন আর কোনো ভাব ছিল না। দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার আত্মসম্মান-বোধ মোটেই বাড়িতে পায় নাই, কারণ দুর্ব্বল দেহে দুর্ব্বল মনোবৃত্তি লইয়াই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যে আঘাতে ক্ষণিকা দলিতা ফণিনীর মত মাথা উঁচু করিয়া উঠিত, তাহা মেনকাকে সহজেই ধূলার মাঝে পাড়িয়া ফেলিতে পারিত। সংসারে যে ক'টা দিন আছে, একটু সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পায় এই ছিল তার আন্তরিক ইচ্ছা। বাড়ীর লোকে তাহাকে এ দুইটার একটাও দিতে পারে নাই, ইহাতে সে একান্ত অসন্তুষ্ট ছিল, এবং বাহিরের লোক যাচিয়া যে-উপকারটুকু করে তাহার পথেও যে ইহারা বাধা দিতে চায় ইহাতে সেই অসন্তুষ্টি বাড়িতেছিল বই কমিতেছিল না।

মেনকা চলিয়া গেলে ক্ষণিকা নিশ্বাস ফেলিয়া পিতার ছেঁড়া পুরাণো জামাটা কাটিয়া ভাইয়ের পরিবার উপযুক্ত কিছু একটা বানাইতে বসিয়া গেল। মেনকার রাগ আর

বিরক্তি তাহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন হুল ফুটাইয়া দিয়াছিল। সত্যই ত তাহারা পরের দান গ্রহণ করিতে কখনও ত্রুটি করে নাই, বিশেষ করিয়া ক্ষণিকা নিজে। পরের টাকায়ই ত সে এতদিন ধরিয়া সুখে কাটাইয়া আসিল। সত্য বটে সে সুখকে সে নিজে বরণীয় মনে করে নাই, কিন্তু সুখ বলিতে মেনকা যাহা বোঝে ক্ষণিকা খানিক পরিমাণে ত তাহা উপভোগ করিতে পারিয়াছে। তবে আজ কোন্ মুখে সে মেনকাকে পরের দান গ্রহণ করিতে বাধা দিবে? এই সুখের গোলাপের রঙিন পাপ্‌ড়ির আড়ালে কি যে বেদনাময় কণ্টকের সমষ্টি, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যদি মেনকার না হইয়া থাকে তবে সে নাই বুঝুক্! কিন্তু তাহাকে বুঝাইবার অধিকার ক্ষণিকার কোথায়?

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ক্ষণিকা একমনে নিজের কাজ করিয়া চলিল। মেনকা কোথা হইতে একখানা ছেঁড়া-মলাট সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল, সে সেখানা হাতে করিয়া ক্ষণিকার পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পাশের ঘর চুপচাপ, প্রবোধ খাইয়া-দাইয়া কোথায় যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর ঠিক-ঠিকানা নাই। শোনা যায় সে নাকি এখন এক সওদাগরি আফিসে কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু

বাড়ীর লোকের কাছে সে কথা স্বীকার করিতে তাহার বিষম আপত্তি।

সাড়ে তিনটার সময় লালু স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এই নাও দিদি বেদানা, আর একবাক্স আঙুর নিয়ে এসেছি, বেশ ভাল এগুলো।"

ক্ষণিকা মাথা তুলিয়া বলিল, "আঙুরের পয়সা কোথায় পেলি, তোকে ত দিইনি?"

লালু বলিল, "সে আমার কাছে ছিল।"

ক্ষণিকা জেরা করিয়া বলিল, "কি করে ছিল বল্‌না?"

লালু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমার দুতিন দিনের টিফিনের পয়সা জমান ছিল।"

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, টিফিনের পয়সা জমিয়ে রাখিস কেন, খাস্ না?"

লালু হঠাৎ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আঃ কি যে কর তুমি। আমার পয়সা আমি এমনি জমিয়েছিলাম!" সে বই খাতা ফেলিয়া "মা, আমায় খাবার দাও," বলিয়া হাঁক দিয়া মায়ের সন্ধানে চলিয়া গেল।

মেনকার ঘুম ছুটিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "লালুটা এখন থেকে যা হয়ে উঠেছে, যেন পঞ্চাশ বছরের বুড়ো। লাট্টু কিন্‌বেন বলে ত পয়সা জমিয়েছিলেন, নিয়ে এলেন আঙুর

কিনে। ওকে গোটাকয়েক দিও, সব ক'টা বাবার খাটের কাছে রেখে এসো না।"

ক্ষণিকা তাহার কথার উত্তর দিল না। ছোট ভাইয়ের এই ত্যাগটুকুর মূল্য সে তাহার সমস্ত পীড়িত হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল। এই জ্বালাময় কণ্টকবৃক্ষের মাঝে ছোট একটি ফুল যে ফুটিয়া আছে তাহার শোভা ক্ষণিকাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। ভালবাসার খাতিরে এই বালক ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহাই তাহাকে উপহার রূপে ফিরাইয়া দিয়া অপমান করিতে ক্ষণিকার একেবারেই ইচ্ছা হইল না। সে আঙুর বেদানা লইয়া পিতার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মা তখন সবে ছেলেকে খাওয়াইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন, জিনিষগুলি তাঁহার হাতে দিয়া সে বলিল, "এই নাও মা, আঙুরগুলো আগে দিও বাবাকে, আমি যাই রান্নাবান্নার জোগাড় দেখি। এ বেলা কি তর্কারি হবে ?"

মা বলিলেন, "দেখ্‌গে যা না কি আছে। আধখানা কপি ছিল তারি ডাল্‌না কর্ এ বেলা, আর ও-বেলার ডাল তর্কারি একটু আধটু যা আছে তাই দিয়ে চলে যাবে এখন। মিনুকে ডাক্‌না, তরকারিগুলো না-হয় কুটে দিক্।"

ক্ষণিকা বলিল, "থাক্‌না, উন্নুনে আগুন দিয়ে আমিই কুটে নিচ্ছি। ও বেচারা একটু ছাড়া পেয়েছে, একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিক।"

ভাঁড়ার এবং রান্নাঘর একখানাই ঘরে, তবে ঘরটা বড় বলিয়া বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। উন্নুন ধরানো শেষ করিয়া সে বঁটি পাতিয়া তর্‌কারি কুটিতে লাগিল।

এমন সময় বাহির হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বাবা! এ যে একেবারে ধূম্রলোক! বেরিয়ে এসো শিগ্‌গীর, এখুনি দম বন্ধ হয়ে মর্‌বে যে!"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "কে চিন্ময়দা! আমি এত নীচু হয়ে বসে আছি যে ধূঁয়ো আমার মাথার উপর দিয়েই যাচ্ছে, কাজেই দম বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। মা ও-ঘরে আছেন।"

চিন্ময় সোজা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বলিল, "অনেক সময় খুব ছোট হবার ঐ একটা মস্ত লাভ, ঝড় ঝাপ্‌টা যা-কিছু তা মাথার উপর দিয়েই চলে যায়। মাথা খাড়া করাতে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু গুঁতোও বেশ খেতে হয়।"

ক্ষণিকা বলিল, "তা আর বল্‌তে। কিন্তু তুমি এই ধোঁয়ার মধ্যে এসে বস্‌লে কেন?"

চিন্ময় বলিল, "কল্‌কাতার মানুষের অত ধোঁয়াকে ভয় কর্‌লে চলে কখনো? সেখানে যে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও নিস্তার নেই এর হাত থেকে। আর এখানে পালাতে পারি বলেই কি এতবড় কাপুরুষ হব?"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা, তা ত বেশ বুঝ্‌লাম যে তুমি মস্ত বীর! কিন্তু সত্যিই ত আর তুমি কেবলমাত্র ধোঁয়া খেতে এসোনি? আসল কথা কি তাই বল না?

চিন্ময় বলিল, "এই দেখ! সব সময়েই কি একটা আসল কথা থাকৃতে হবে? সব সময়টা যদি কেবল কাজের কথা কইতেই যায়, তা হলে ত আর বাঁচ্‌তে হয় না। অনেকখানি অকাজের মধ্যে মাঝে মাঝে কাজের কমা সেমিকোলন, ইত্যাদি থাকৃলেই ঢের।"

ক্ষণিকা হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল, সে চিন্ময়কে বেশ ভালরকম করিয়াই চিনিত। সোজাসুজি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবার পাত্র সে নয়। একরাশ বাজে বকিয়া তাহার পর আপনা হইতেই সে কাজের কথা পাড়ে, কিন্তু কাজের কথা জোর করিয়া বাহির করাইতে চাহিলে, সে ঘণ্টা পাঁচ ধরিয়া বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই বলিবার লক্ষণ দেখায় না।

খানিকক্ষণ বক্‌বক করিয়া চিন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা ত আজ ভালই আছেন বোধ হয়? ডাক্তার

বলে carefully রাখ্‌লে, আবার যেমন ছিলেন তেমন হওয়াও বিচিত্র নয়।”

ক্ষণিকা বলিল, “কিন্তু সেই carefully রাখা নিয়েই যে ষোলো আনা গোলমাল।”

চিন্ময় বলিল, “প্রবোধ কি বলে? কাজকর্ম্ম কিছু করা ঠিক কর্‌ল? এখন ত ওর ঘাড়েই সব পড়্‌বে, অন্ততঃ একটি বছর ত তোমার বাবার কাজ করার কথা মনেও আন্‌তে পাবে না।”

ক্ষণিকা বলিল, “দাদার কথা আমি কি করে বলি বল? সে ত চটেই আগুন হয়ে আছে। আর কাজ কর্‌বার যোগ্যতাও ত থাকা চাই।”

চিন্ময় বলিল, “হ্যাঁ, রাখ তোমার যোগ্যতা! সুস্থ সবল জোয়ান পুরুষ মানুষ, কাজের অযোগ্য কিসে শুনি? কেরাণী-গিরি আর স্কুলমাষ্টারি ছাড়া দুনিয়ায় কাজ নেই নাকি? আর ও কর্‌বে না ত লালু কর্‌বে নাকি?”

ক্ষণিকা অল্প হাসিয়া বলিল, “আমাকে একেবারেই বাদ দিচ্ছ কেন?”

চিন্ময় হঠাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তুমি কাজ করে যত অকর্ম্মণ্যের দলকে খাওয়াবে আর কি? তাদের লজ্জা কর্‌বে না? তা ছাড়া তোমার দু-মাস বাদে পরীক্ষা।”

ক্ষণিকা বলিল,"পরীক্ষা দেওয়ার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। বাবাকে ছেড়ে কি করে এখন যাব? মা একলা কি কর্‌বেন? আর অকর্ম্মার দল তুমি কোথায় দেখ্‌ছ চিন্ময়-দা? মিনু লালুকে ত ধর্‌তেই নেই, ওরা যে-দুঃখ এই বয়সে পাচ্ছে তারি জন্যে আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। এত-বড় অক্ষম আমরা যে ওদের শৈশবটাও ঘা না খেয়ে কাট্‌ল না। বাবা অসুস্থ আর দাদাকে সত্যিই কোনো কাজের উপযুক্ত training দেওয়া হয় নি। যেমন করেই, যে কারণেই হোক, আমিই এ বাড়ীতে যা-একটু লেখা-পড়া কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমারই ত কাজ করে সকলের ভার নেওয়া উচিত।"

চিন্ময় বলিল, "হ্যাঁ, কথা ত ঢের বল্‌লে। সবগুলোই যে ঠিক কথা বলেছ তা অবিশ্যি নয়। পরীক্ষাটা আমার মতে দিয়ে ফেলাই ভাল; যদি নিতান্তই সব তোমার ঘাড়েই পড়ে তা হলে ত তোমাকে এতটা রোজগার কর্‌তে হবে যাতে সব খরচ চালাতে পার? কিন্তু আই-এটাও না যদি দাও ত কি কাজ পাবে? যা না আজকাল চাকরীর বাজার!"

ক্ষণিকা বলিল, "দেখি ভেবে। এখন কল্‌কাতায় যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়, আর এখানে থেকেও পড়াশুনো একটুও

হবে না। এবছর অন্ততঃ আমায় পরীক্ষার আশা ছাড়ুতেই হবে।”

চিন্ময় বলিল, “ও-সব চট্‌পট্‌ সেরে ফেলাই ভাল। তা হলে সত্যিকারের লেখাপড়া কর্‌বার একটু অবসর মেলে।”

ক্ষণিকা বলিল, “সে আর এজন্মে হয়েছে!”

চিন্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “হবে না কেন শুনি? এখুনি তোমার জন্ম কেটে গেল আর কি? কাল এসে তোমার আর প্রবোধের সঙ্গে বোঝা-পড়া করে ফেল্‌তে হবে। আজ আমার সময় নেই, চল্‌লাম এখন।”

( ৫ )

ছোট ভাইবোনদের জলখাবার দিয়া ও পিতার পথ্যের বাটি মায়ের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া ক্ষণিকা সবে নিজের দিকে একটু মন দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় চিন্ময় আসিয়া ডাক দিল, “প্রবোধ, বাড়ী আছিস্‌?”

লালু এক-মুখ দুধ-রুটি লইয়া উত্তর দিল, “দাদা এখুনি বেরিয়ে গেল।”

চিন্ময় ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, “কখন্‌ এলে তার দেখা সত্যি-সত্যি পাওয়া যায় বল্‌তে পার? সকালে এলে শুনি সন্ধ্যের

সময় সে বাড়ী থাকে এবং সন্ধ্যায় এলে শুনি সকাল ছাড়া সে বাড়ী থাকে না, আসল সময়টা কখন্ ?”

লালু আর-একটা কি বলিতে যাইতেছিল, মেনকা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “আসল সময় একটাও নেই। দুপুরে একবার আর রাত্তিরে একবার দশ মিনিটের জন্যে সে খেতে আসে। পাছে দশ মিনিটের বদলে পনেরো মিনিট হয়ে যায় এই ভয়ে সে বাড়ীতে স্নানও করে না, কোথায় তাদের সাঁতার শিখ্‌বার ক্লব্ হয়েছে সেইখানে নেয়ে আসে। দিদি আসার পর থেকে ঘরে জায়গা নেই বলে বাড়ীতে শোয়ও না। কাজেই দেখা আর পাবেন কখন্? আফিসে গেলে বরং দেখা পেতে পারেন।”

ক্ষণিকা মেনকাকে থামাইয়া বলিল, “মাকে জিগ্‌গেষ করে আয় ত বাবার জন্যে আর দুধ চাই কি না।” মেনকা যাইতেই সে চিন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, “এত সকালেই দাদার খোঁজে এলে যে ?”

চিন্ময় রান্নাঘরের বারাণ্ডায় ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, “দাদার খোঁজ পাওয়াটাই আসল দর্‌কার, সকালেই হোক কি বিকেলেই হোক। মেনকার কাছে যে রকম detailed বর্ণনা পেলাম তাতে বাড়ীতে তাকে পাবার ভরসা আর কর্‌ছি না, কিন্তু তার আফিস্‌টা যে

সহরের কোন্ অংশে তা ত তিন দিন ঘুরেও খোঁজ পেলাম না। একদম আছে কি না তাই সন্দেহ হচ্ছে।"

ক্ষণিকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ও কথাটা আমিও ভেবেছি অনেকবার, যদিও বল্‌তে একবারও সাহস করিনি। তাকে কোনো কথা জিগ্‌গেষ করাও বৃথা, হয় খেঁকিয়ে বকে ওঠে, না-হয় মস্ত একটা বক্তৃতা দিয়ে উঠে চলে যায়। কোনো বিশেষ দর্‌কার ছিল নাকি তার কাছে ?"

চিন্ময় বলিল, "একটা কাজের খোঁজ পেয়েছি, তাই জান্‌তে এসেছিলাম যে his highness সেটা গ্রহণ কর্‌বেন কি না। তা যে-রকম দেখ্‌ছি, যেন সব গরজ আমারই।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল। চিন্ময় একটুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজের মন্তব্যটাকে খানিকটা মোলায়েম করিয়া লইবার চেষ্টায় বলিল, "তা গরজ যে আমার একেবারে নয় তাও নয়, কিন্তু কাজটা আমি নিলে ত আর কোনো সুবিধে হবে না, তা না হলে তাই নিতাম। আচ্ছা, প্রবোধ যখন খেতে আস্‌বে তাকে একথাটা বোলো একবার। যদি ইচ্ছে হয় ত একবার আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। চারটে সাড়ে-চারটের মধ্যে যখনই যাবে আমি বাড়ী থাক্‌ব।"

সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ক্ষণিকা বলিল, "বোসোনা একটু, এত তাড়া কিসের ?"

চিন্ময় তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বলিল, "না, তাড়া আর কিসের, তোমারই কাজ মাটি হবে তাই উঠ্‌ছিলাম। কাকা-বাবু আছেন কেমন এখন ?"

ক্ষণিকা বলিল, "ভালই ত বোধ হয়। খেতে-টেতে বেশ পার্‌ছেন। ডাক্তার-বাবু কাল বল্‌ছিলেন, এই-রকম যদি চলে ত তিন-চার দিনের মধ্যেই উঠে বস্‌তে পার্‌বেন। আচ্ছা, দাদার কাজের ভাবনা ত ঢের ভাব্‌ছ, যদিও সে কাজ নেবে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। আমার একটা কাজ যদি জুটিয়ে দাও তাহলে ঢের ভাল হয়। আমি ত নিতে খুব বেশী-রকম রাজি আছি।"

চিন্ময় বলিল, "তোমার এক কথা! এখনও ও-খেয়াল মাথার থেকে যায়নি ?"

ক্ষণিকা বলিল, "চিন্ময়দা, একটু ভেবে তবে কথা বল। কি বলে বল্‌ছ যে এটা আমার খেয়াল ? আমি বেশ জানি যে তুমি মোটেই আমার কাজ করা পছন্দ কর্‌ছ না, আর তারি জন্যে এটাকে seriously দেখ্‌তেও চাও না। কিন্তু ভেবে দেখ, কি করে আমাদের চল্‌বে ? দাদার কাছে কিছু প্রত্যাশা কোরো না, সে সাহায্য কিছু ত কর্‌বেই না, উল্টে নূতন

কোনো বিপদ না টেনে আনে তা হলেই ঢের। বাবাকে এক বছর অন্ততঃ খুব যত্নে রাখা দর্‌কার, মিনুকে আর বাড়ী বসিয়ে রাখা যায় না, তাকে একেবারে আমরা মাটি কর্‌তে বসেছি। লালুটা কপালগুণে মানুষের মত শরীর মন নিয়ে জন্মেছে, তার জন্যে খুব বেশী ভাব্‌না নেই, নিজের ভার এরি মধ্যে সে নিজে নিতে শিখেছে। আজকাল খরচ কেমন তা ত জান? এই ক'দিন যে কি কষ্টে চল্‌ছে তা আমিই জানি।"

চিন্ময় বলিল, "তুমি চলে গেলে তোমার মা একলা সংসার সাম্‌লাতে পার্‌বেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি এখানে বসে থাক্‌লে সংসার সাম্‌লানো আরও বেশী দায় হয়ে উঠ্‌বে। আর বেশী বাজে কথা বকে দর্‌কার কি? তুমিও জান এবং আমিও জানি যে বেঁচে থাক্‌তে হলে টাকা দর্‌কার এবং রোজ্‌গার করা ছাড়া টাকা পাবার আমাদের কোনো উপায় নেই। এবং বাড়ীতে রোজ্‌গার কর্‌তে সক্ষম এবং ইচ্ছুক মানুষ একমাত্র আমি।"

চিন্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখি কিছু খুঁজে যদি পাই। কিন্তু স্কুলে কাজ নিলে যা মাইনে পাবে, তাতে তোমার সংসার চল্‌বে না। অন্য-রকম কাজ যে নেই তা নয়, কিন্তু

সে-সব কাজে তোমার মত ছেলেমানুষের যাওয়া ঠিক হবে না, তোমার মা-বাবারও মত হবে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "সংসারে সবাই ছেলেমানুষ থাক্‌বার অধিকার পায় না। অনেককে দশ-বারো বছরেই বুড়ো সাজ্‌তে হয়। আমার ত তবু তার চেয়ে ঢের বেশী বয়স হয়েছে। তুমি যেখানে টাকার offer বেশী পাও আমাকে জানিও। আত্ম-সম্মান বজায় রেখে সে কাজ করা যদি সম্ভব হয় ত আমি নিশ্চয় কর্‌ব। যা বিপদ নয় তাকে বিপদ ভাব্‌বার, যা অপমান নয় তাকে গায়ে পড়ে অপমান মনে কর্‌বার সময়ও আমার নেই, সুবিধাও নেই।"

চিন্ময় আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা রান্নাঘরে ঢকিয়া নিজের নিত্যকর্ম্ম আরম্ভ করিল। হাঁড়ি কড়ার মধ্যে সে যখন একেবারে মনকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে তখন মেনকা আসিয়া বলিল, "মা বল্‌লেন আরও আধ-পোওয়া-খানেক দুধ লাগ্‌বে।"

ক্ষণিকা মাথা তুলিয়া বলিল, "তা এতক্ষণ পরে বল্‌তে এলে? দুধ ত জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। এতক্ষণ কি কর্‌ছিলে শুনি?"

"ঘোড়ার ঘাস কাট্‌ছিলাম। তোমাদের বাড়ীতে বসে

থাক্‌বার আর আমোদ কর্‌বার অনেক সময় আছে কিনা? বিছানাগুলোর লালু যা ছিরি করে রেখে গিয়েছে, সেগুলো গোছাতে হল না? তুমি দাও দুধ, আমি কাগজ জেলে গরম করে নেব এখন। আমারি দোষে যখন জুড়িয়েছে, তখন আমারই শাস্তি পাওয়া উচিত।" হুড় হুড় করিয়া এক নিশ্বাসে কথাগুলা বলিয়া, ক্ষণিকার হাত হইতে দুধের বাটি একরকম জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া মেনকা দুম্‌দুম্ করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে আপনার বিরক্তি ও অভিমান প্রচার করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণিকার মুখে একটু শ্লেষের হাসি দেখা দিল, সে আপন মনেই যেন বলিল, "হ্যাঁ, এই সংসারই সব-রকম ছেলে-মানুষির প্রশ্রয় দেবার মত বটে। এখানে ফুল ফোট্‌বার আগেই তার কাঁটাগুলো তিন-গুণ বড় হয়ে ওঠে।"

বেলা ক্রমে বাড়িয়া চলিল। লালু নাইয়া খাইয়া স্কুলে গেল। মেনকাও বক্‌বক্ করিতে করিতে কোনো-প্রকারে খাওয়া-দাওয়া শেষ করিল। কর্ত্তা, গৃহিনী, ক্ষণিকা, একে একে সকলেই আহার সাঙ্গ করিয়া বিশ্রামের চেষ্টা দেখিতে লাগিল, কিন্তু প্রবোধের আর দেখাই নাই। ক্ষণিকা কিছুক্ষণ তাহার জন্য বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মা বলিলেন, "তুই বসে রইলি কেন? সারাদিন খাট্‌লি, আবার বসে

থাকৃতে হবে না। খেয়ে-দেয়ে শুগে যা একটু। ও অবুঝ হবে বলে ত সকলে ভুগ্‌তে পারে না ?"

ক্ষণিকা বলিল, "একবার শুলে আমি আর উঠ্‌তে পারব না বাপু। একেবারে সব সেরে রাখি, তা যতক্ষণে হয়।"

মা বলিলেন, "না, না, তুই খেয়ে নে। প্রবোধ এলে, হয় আমি নয় মিনু দেবো এখন খেতে। নে, তুই ওঠ্।"

মেনকা মুখখানা যথাসম্ভব বাঁকাইয়া উঠিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল, "নিজে বেড়ে নিয়ে খায় যেন। ছেলের এদিক নেই ওদিক আছে।"

তাহার মা বকিয়া উঠিলেন, "মেয়ের কথার ছিরি দেখ! হাজার হোক বড় ভাই। কি শিক্ষাই তোমার হচ্ছে বাছা!"

মেনকা বলিল, "আহা, আমাকে শিক্ষা দিয়ে ত সব উল্টে দিলেন। যেমন হাড়ীর হালে রেখেছ, তেম্‌নি স্বভাবও হয়েছে। আমি যাচ্ছি ও-বাড়ী, শেলাইটা একবার জ্যেঠাই-মাকে দেখিয়ে নেব।" মা অনুমতি দিলেন কি না তাহা দেখিবার অপেক্ষা না করিয়াই সে একটা সাবানের বাক্সে শেলাইয়ের জিনিষপত্র ভরিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণিকার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "গরীব মানুষের ছেলেপিলে হওয়া মহাপাপের ফল! একটাও যদি

মানুষ হল। ছেলে যে সারাদিন কোথায় টো টো করে ঘুরছেন তাঁর আর খোঁজই নেই। মেয়ে কথায় কথায় যেন তেড়ে মারতে আসছেন। আমি কি করব রে বাপু, যত রাগ ঝাল আমার উপর ঝাড়লে কি হবে?"

ক্ষণিকা বলিল, "অত শত ভেবে কি আর মিনু ও-রকম করে মা? ছেলেমানুষ, সমবয়সীদের নানা-রকম আমোদ আহ্লাদ করতে দেখে, নিজেরও ইচ্ছে হয়। না পেলেই রেগে যাকে সামনে পায় তাকেই দশ কথা শোনায়।"

তাহার মা বলিলেন, "যে যেমন কপাল নিয়ে জন্মেছে, তা রাগ করলে কি হবে? মেয়ে-মানুষের অত অধৈর্য্য হলে চলে না। যাই দেখি ওঁর কিছু দরকার আছে কি না।"

ক্ষণিকা খাইতে বসিল। অধৈর্য্য হইতে নাই তাহা ত বেশ সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু যে শিক্ষার গুণে মানুষ কি হইতে হয় আর কি হইতে নাই এই জ্ঞান লাভ করে, গোড়ায় সেটাকে বাদ দিয়া তাহার ফলটা চাহিলে চলিবে কেমন করিয়া? পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই চাষ করিতে হয়। যে শিশুতরু বাড়িবার মুখে না পাইল জল, না পাইল যত্ন, প্রখর রৌদ্রের তাপ আর পথিকের পদদলনের সঙ্গেই যাহার পরিচয়, তাহাকে আজ ফলপুষ্প-প্রসবিনী মনোহারিণী মূর্ত্তি ধরিতে বলিলেই কি সে তাহা করিতে পারে, না করিতে

চায়? অন্ধের মত তাহার ফুল তুলিবার আশায় গিয়া তাহার কাঁটার খোঁচা খাইলে রাগ হয় বটে, কিন্তু রাগ করার অধিকার সেখানে পূরাপূরি আছে কি?

হঠাৎ তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া প্রবোধের গলার স্বর তাহার কানে আসিয়া বাজিল, "হ্যাঁ রে, তোদের সকলের খাওয়া হয়ে গেছে নাকি?"

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ, আর-সকলেরই হয়েছে। তুমি দাঁড়াও একটু, আমি উঠে তোমায় ভাত দিচ্ছি।"

প্রবোধ বলিল, "থাক্, থাক্, তোকে আর তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আমি একলা বাকি ত? হাঁড়ি কড়া উজাড় করে নিজেই একটা থালায় ঢেলে নিচ্ছি, তা হলেই হবে।"

প্রবোধ নিজের কথা-মত কাজ করিবার সবে উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সাবানের বাক্স হাতে মেনকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রবোধের হাতে ভাতের হাঁড়ি দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "দাদা, ও কি কর্‌ছ? এখুনি ভাঙ্‌বে তুমি হাঁড়িটা, নামিয়ে রাখ শিগ্‌গির। আমি দিচ্ছি তোমায় ভাত বেড়ে।" আনাড়ি পুরুষমানুষকে আপনাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাহার নারীত্ব একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। শেলাই রাখিয়া দিয়া

দাদার হাত হইতে হাঁড়ি কাড়িয়া লইয়া সে পরম গম্ভীর মুখে পরিপাটি করিয়া ভাত বাড়িতে বসিয়া গেল। ক্ষণিকা হাসি চাপিয়া উঠিয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া ক্ষণিকা দেখিল, প্রবোধ খাইতেছে এবং মেনকা মোজা বুনিতে বুনিতে তাহাকে সকালে চিন্ময়ের আগমন-সংবাদ দিতেছে। ক্ষণিকাকে দেখিয়া প্রবোধ বলিল, "কি এত তার দর্‌কার আমার কাছে? বলেছে কিছু নাকি তোকে?"

ক্ষণিকা বলিল, "কি একটা কাজের খোঁজ পেয়েছে, তাই তোমায় বল্‌তে এসেছিল।"

প্রবোধ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "আমি কি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে একসঙ্গে দশগণ্ডা কাজই কর্‌ব? আমার কাজের ভাব্‌না তাকে অত ভাব্‌তে হবে না।"

ক্ষণিকার আর কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না, সে উঠিয়া গিয়া শোবার ঘরে একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। খানিক পরে মেনকাও আসিয়া জুটিল, হাতে তখনও পশম আর কাঁটা, ক্ষণিকাকে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত খবর দিল, "আমার মোজা-জোড়া দেখে জ্যাঠাইমা খুব প্রশংসা কর্‌লেন আজ, তিনি যে জন্মাবধি বুন্‌ছেন তা তাঁর চেয়েও আমারটা সুন্দর হয়েছে।"

বেচারী মেনকার আনন্দের ভাণ্ডারে খুদ কুঁড়া ভিন্ন বড় কিছু জোটে না, ক্ষণিকা তাহার আনন্দে খুসি হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ তোর শেলাইয়ের হাত বেশ আছে, স্কুলে যারা শেলাইয়ের প্রাইজ্ পায় তারাও সবাই এত ভাল করে না।"

মেনকা বলিল, "দিদি ও-বেলা আমি রাঁধ্‌ব এখন। তুমি এসে অবধি একবারও জ্যাঠাইমার ওখানে যাওনি, একবার ঘুরে এসো।"

ক্ষণিকা বলিল, "দেখি, রান্না ছাড়াও আরও কাজ ত আছে? তুই ও-বেলা রাঁধিস্ যদি ত আমি লালুর কোটটা শেষ করে ফেলি।"

মেনকা বলিল, "সারাদিন কেবল কাজ আর কাজ। শীত ত ঢের কমে গিয়েছে, গরম কোটের কি এমন দর্‌কার?"

দুই বোনে আর কথা না বলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

বিকাল হইতেই মেনকা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দিদি, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। লালুর খাবার ঠিক আছে ত, না হলে স্কুল থেকে এসে সে আমার মাথা খেয়ে ফেল্‌বে।"

ক্ষণিকা মাদুর ছাড়িয়া তখনও ওঠে নাই, মেনকার রান্নার উৎসাহ দেখিয়া তাহার হাসি পাইতেছিল। তবু

উৎসাহটা কাজে লাগাইবার ইচ্ছায় বলিল, "হাঁ, খাবার আছে, দুধটা একটু গরম করে দিস্। আমি লালুর কোটটা নিয়ে ও-বাড়ী যাই একবার, কলে শেলাইও তাড়াতাড়ি হবে, জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করাও হবে।"

মেনকা আনন্দটাকে চাপিবার চেষ্টায় মুখখানা গম্ভীর করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা উঠিয়া বসিয়া আপন মনে খানিকটা হাসিয়া লইল, তারপর দিবানিদ্রার মায়া ত্যাগ করিয়া একেবারে উঠিয়া পড়িল। চিন্ময়দের বাড়ী খুব কাছেই। গলিটা পার হইয়া সদর রাস্তায় পা দিতেই প্রথম বাড়ীখানা তাহাদের। মফঃস্বলে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের রাস্তায় হাঁটা দস্তুর নয়, তবুও অতটুকুর জন্য গাড়ীভাড়া করাটা ক্ষণিকাদের পক্ষে অতিরিক্ত বাবুয়ানা হয় বলিয়া এধার ওধার চাহিয়া তাহারা দ্রুতপদে রাস্তাটুকু পার হইয়া যাইত। প্রবোধ বাড়ী থাকিলে বোনদের বকিতে বকিতে পথটা দাঁড়াইয়া দিত, সে বাড়ী না থাকিলে তাহারা আপনা-আপনিই চলিয়া যাইত। লালু একদিন দাদার দেখাদেখি মেনকার অভিভাবকত্ব করিতে গিয়া ছোড়দির কাছে চড় খাইয়া আর সে দিক দিয়া হাঁটে না।

চুল বাঁধিয়া মুখ ধুইয়া, লালুর কোটের টুক্‌রাগুলি একত্রে বাঁধিয়া লইয়া ক্ষণিকা বাহির হইয়া পড়িল। গলির মধ্যে

নামিয়া পড়িয়া দেখিল চিন্ময় তাহাদের বাড়ীর দিকেই আসিতেছে। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "ও কি! পুঁটুলি নিয়ে এরি মধ্যে চাকরী করতে বেরিয়ে যাচ্ছ নাকি?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "আপাততঃ তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি, চাকরী জুটিয়ে দাও ত সেখান থেকেই না-হয় পুঁটুলি নিয়ে যাত্রা করব।"

চিন্ময় তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরিয়া চলিল। রাস্তায় লোকজন গাড়ীঘোড়ার ভীড় তখন কমিয়া গিয়াছে, পদচারী পথিক দুচারজন করিয়া এধার-ওধার যাওয়া-আসা করিতেছে। বুটিদার ঢাকাই মস্‌লিনের লম্বা পাঞ্জাবী পরা একটি যুবক রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিবামাত্র তার কণ্ঠে সঙ্গীতের বান আসিয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া সে গান ধরিল—

"ও বাগবাজারের হাবি,
তোকে পরিয়ে দেব নাকছাবি।"

দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা চিন্ময়দা, আমাদের দেশের মেয়েরা সবাই যদি দেবী, তা দেবীপূজার বন্দোবস্ত এমন বিচিত্র রকমের কেন?"

চিন্ময় বলিল, "তোমরা দেবী থাকতে চাও না ত ওরা কি করবে? দেবীদের ত রাস্তায় হটহট করে বেড়ান, কথায় কথায় কাজ করতে যাওয়া, মানুষের সব কাজে ভাগ বসাতে যাওয়া, এ-সব কন্নার কথা নয়? চাল-কলার নৈবিদ্যি খেয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাক, তা হলে পূজো পাবে এখন।"

ক্ষণিকা বলিল, "তাই বা পাই কৈ? চাল-কলাও ত জোটে না, আর হাত-পা গুটিয়ে বসতে চাইলে ভক্ত পূজারীর দল ঠ্যাঙ্গা মেরে হাত-পা খোঁড়া করে দিতে আসে।"

চিন্ময় বলিল, "ওসব তোমাদেরই দোষ। আগেকার কালে মেয়েদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, এখন তোমরা সব সাহেবীয়ানা করতে গিয়ে সব দিক মাটি করেছ।"

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল অবস্থাটা কি রকম?"

চিন্ময় হাত নাড়িয়া বলিল, "তা কি জানি? ভাল আবার কি রকম, ভাল। শাস্ত্রে, পুরাণে, তন্ত্রে সব লেখা আছে পড়ে নিও। ওসব ত পড়বে না, পড়বে H. G. Wellsএর বই, কাজেই এই দশা।"

ক্ষণিকা বলিল, "পড়তে শিখেই ত যত আপদ, আবার বল পড়তে? তা হলে ত জ্বালা বাড়বে বই কমবে না।"

চিন্ময় বলিল, "সংস্কৃত অক্ষর পড়লে দোষ নেই, তা পড়তে পার!"

এমন সময় উপর হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "হাঁরে, আধ ঘণ্টা ধরে নীচে দাঁড়িয়ে দুজনে কি ভারত-উদ্ধার কর্‌ছিস্? ক্ষণুর ত এসে অবধি একবার বুড়ী জ্যাঠাইমাকে মনেও পড়েনি, যদি বা এল তা নীচে দাঁড়িয়ে ছেলে তাকে বক্তৃতা শোনাচ্ছেন। ওপরে আয় না।"

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে চিন্ময় বলিল, "আমার কোন দোষ নেই মা। আমাকেই ও বক্তৃতা শোনাচ্ছিল, আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েকে বক্তৃতা শোনাবার মত বিদ্যে আমার নেই।"

"আচ্ছা, তুই ত মস্ত টুলোভট্‌চাজ, এখন উপরে আয়।"

ক্ষণিকা ওপরে উঠিয়া জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত বড় হয়ে উঠ্‌লি! এই সে-দিন এতটুকু মেয়ে ছিল, আমার কাছে আচার চাইতে আস্‌ত আর এরি মধ্যে লম্বায় আমায় ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।"

( ৬ )

পিওনের হাত হইতে গোটা-কয়েক চিঠি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া লালু বলিল, "দিদি, তোমার দুখানা চিঠি আছে। বেশ মজা তোমার, রোজ রোজ কেমন চিঠি পাও। তোমার ক্লাশের মেয়েরা লেখে বুঝি? আমার ক্লাশফ্রেণ্ড-

গুলো এমন idiot যে জিওমেট্রির পড়া ভুলে না গেলে কখনো চিঠি লেখে না।"

লালুর দুঃখকাহিনী শুনিয়া ক্ষণিকা বলিল, "আর তুই পড়া মনে থাক্‌লেও তাদের অনেক অনেক চিঠি লিখিস্ ত?"

লালু বলিল, "বা রে, তা কেন আমি লিখ্‌ব? তারা আমায় হ্যাংলা ভাব্‌বে যে? চিঠি না পেলে চিঠি লিখ্‌ব কেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "তাদের বুঝি আর সে ভয় নেই? তারাই বা চিঠি না পেলে চিঠি লিখ্‌বে কেন?"

লালু এ সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, তুমি ত বেশ চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার! আমার চিঠি এলে সেই সেকেণ্ডেই আমি খুলে ফেলি।"

ক্ষণিকা চিঠি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সেই সময় মেনকা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কার চিঠি এল দিদি? তোমার মনোজাদির বুঝি? আমি শুদ্ধ তাঁর লেখা চিনে গিয়েছি। আর ওখানা কার?"

মনোজার চিঠি শেষ করিয়া আর-একখানা চিঠি খুলিয়া ক্ষণিকা বলিল, "চিন্ময়দা লিখেছে।"

মেনকা বলিল, "কি লিখেছেন বলনা বাপু? এ ত আর মনোজাদির চিঠি নয় যে পৃথিবীর কাউকে দেখাতে পার না?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "তোর কথা কিচ্ছু লেখেননি। ওখানে একটা কাজ খালি আছে, তাই লিখেছেন।"

মেনকা বলিল, "কোথায়? ইস্কুলে নাকি? এবার তুমি গেলে নিশ্চয় আমি তোমার সঙ্গে যাব, চিরকাল মুখ্যু হবার জন্যে আমি বাড়ী বসে থাকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি না গেলেও এবার তোমাকে ঠিক পাঠাব। এখন থেকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।"

মেনকা আর কিছু বলিবার না পাইয়া চলিয়া গেল।

চিন্ময় লিখিয়াছিল কলিকাতায় সে একটা কাজের খোঁজ পাইয়াছে, তবে সে কাজ ক্ষণিকার নেওয়া উচিত কি না তাহা সে কিছু বলিতে পারে না। কাজ স্কুলে নয়, এক পরিবারে। সে বাড়ীর গৃহস্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তবে তিনি কলিকাতার একজন নামজাদা মানুষ। তাঁহার পরিবারে একটি মেয়েকে তিনি রাখিতে চান, তাহাকে একাধারে শিক্ষয়িত্রী এবং সংসারের তত্ত্বাবধায়িকার কাজ করিতে হইবে। ভদ্রঘরের কোনো সুশিক্ষিতা মহিলার জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। মাহিনা

১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে তিনি রাজী আছেন। যদি সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মা-বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া ক্ষণিকা এই কাজ নেওয়া ঠিক করে, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার কলিকাতা আসা প্রয়োজন। আর দুই-একটা কাজ মফঃস্বলের স্কুলে খালি আছে বটে, তবে তাহার মাহিনা তেমন বেশী কিছু নয়। তবে কাজগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এই যা।

চিঠি শেষ করিয়া ক্ষণিকা তাহার মায়ের সন্ধানে চলিল। পিতার এখন যেমন অবস্থা তাহাতে তাঁহার সহিত পরামর্শ করা কথার কথা মাত্র। মাও যে খুব সৎপরামর্শ দিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা নাই, তবু এত বড় একটা ব্যাপারে যেমন হোক একজন পরামর্শদাতা থাকা ভাল। মানুষ সম্পূর্ণ একাকী যেদিকে পা বাড়ায়, সেদিকে বিভীষিকা বড় বিরাট হইয়া দেখা দেয়। যে কাজ করিতে হইবে বলিয়া নিশ্চিত জানা আছে, তাহাও যদি অন্য কেহ একবার করিতে বলে ত মানুষের দায়িত্বের বোঝা একটুখানি যেন কমিয়া যায়। বিপদে যদি পড়িতে হয়, তাহা হইলে এই সান্ত্বনাটুকু থাকে যে ভুল সে একলাই করে নাই, আর-একজন মানুষও অন্ততঃ ভুল করিয়া এই পথটাকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল।

ক্ষণিকার মা চিন্ময়ের চিঠি পড়িয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ, না, একটা কিছু বল? চাক্‌রী ত এমন সস্তা নয় যে যতদিন খুসি ফেলে রাখ্‌লে চল্‌বে? আর আমাদের অবস্থাটাও ভেবে দেখ।"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "ভাব্‌ছি ত সব বাছা, কিন্তু ভেবে যে কিছু কূল-কিনারা পাই না। উনি পড়ে, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি আরও ঘুলিয়ে গিয়েছে। চিরকাল মাথার উপর একজন ছিলেন, এ-সব ভাব্‌না তিনিই ভাব্‌তেন, আমাকে ত ভাব্‌তে হয়নি।"

ক্ষণিকা বলিল, "এখন ত হচ্ছে, আগের কথায় কাজ কি?"

তাহার মা বলিলেন, "তুই কি বলিস্? তোর সাহস হয়? কি জানি বাপু, নানা জনে নানা কথা বলে ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়। ইস্কুলের কাজ ভাল, না-হয় মাইনে কম, কিন্তু কোনো আপদ বালাই নেই। সেখানে থাক্‌লে জান্‌ব যে হ্যাঁ মেয়ে আমার কাছেও যেমন ছিল ওখানেও তেমন আছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "কিন্তু তাই জেনে কি সকলের পেট ভর্‌বে? স্কুলে পঞ্চাশ টাকার বেশী মাইনে কোথাও পাব না,

কল্‌কাতায় হয়ত তার অর্দ্ধেকও পাব না। এদিকে ধার ত কত হয়েছে তার ঠিকানা নেই। মিনুকে স্কুলে দিতে হবে, বাবার খরচ চালাতে হবে। ১০০৲ টাকা পেলে তবু কষ্টেসৃষ্টে চল্‌তে পারে। আমি বলি এ কাজ নেওয়াই ভাল। চিন্ময়দা যখন এটার কথা লিখেছে, একেবারে না জেনে-শুনে কি লিখেছে ?”

মেনকা কখন ঘরে ঢুকিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা দিদি, একবার কল্‌কাতায় গিয়ে দেখনা, যদি তাদের খুব বিচ্ছিরি লাগে ত পালিয়ে এলেই হবে, তোমাকে ত আর কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না ?”

ক্ষণিকার মা বলিলেন, “তাই না-হয় যা। সেখানে সব দেখে-শুনে, যদুবাবুরা পাঁচ-জনে কি বলেন শুনে যা হয় করিস্। লালু না-হয় রেখে আস্‌বে। প্রবোধকে বল্‌লে ত যাবে না, তা না হলে ওকেই বল্‌তাম।”

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, “মা, যদি আমাকে যুদ্ধ কর্‌তে যেতে হয়, তা হলেও বোধ হয় তুমি এগিয়ে দিতে লালুকে সঙ্গে দেবে ? পুরুষ মানুষ, ছ মাসের হলেও, সঙ্গে থাক্‌লে তোমাদের অনেক ভরসা হয়, না ?”

মেনকা বলিল, “সত্যি দিদি, এইজন্যেই ত ছেলেগুলো

অত আস্পর্দ্ধা পায় ? ভাবে, তাদের নইলে দুনিয়া একেবারে উল্টে যাবে আর-কি। লালুকে এখনো আমি চড় মেরে বসিয়ে দিতে পারি, আর তিনি আসেন সর্দ্দারী করে আমাকে জ্যাঠাইমার বাড়ী পৌঁছে দিতে। সেদিন অবধি মনে পড়ে ওকে কোলে করে বেড়িয়েছি। মা ওর আহ্লাদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।”

নারীশক্তির এমন অপমান শুনিয়া ক্ষণিকা বলিল, “না, আর ওর আহ্লাদ বাড়ুতে দেওয়া হবে না। আমি যাব একলাই। তুই ঘাড়ে করে আমার বাক্স-বিছানা ষ্টেশনে দিয়ে আসিস্।”

মেনকা বলিল, “আহা, পারি না যেন আর-কি ! পঙ্কজিনী সে-দিন গল্প করছিল দার্জ্জিলিংএ এই এত বড় বড় পাঁচ-মণে বাক্স সব পাহাড়ী মেয়ে কুলিরা দিব্যি পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠে। আমি অন্ততঃ এক মণ ওজনের জিনিষ বইতে বেশ পারি। তা পার্লে কি হবে, এখুনি সহরের যত গোভূত আছে সব পেছনে লাগ্‌বে না ?”

ক্ষণিকা বলিল, “তা লাগ্‌লেই বা ? তুই চাঁটি মেরে বিদায় করে দিস্।”

মেনকা বলিল, “দিদির এক কথা ! তুমি পার চাঁটি

মার্‌তে ? যা সাত-জন্মে করা অভ্যেস নেই, তা কি অম্‌নি চট্‌ করে করা যায় ?”

তাহাদের মা আলোচনাটা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, “নে, নে, পরের জন্মে মেম্ হয়ে জন্মাস্‌, তা হলে খুব চাঁটি মারা অভ্যেস কর্‌তে পার্‌বি। এ জন্মে যা চাঁটি-খাওয়া মায়ের পেটে জন্মেছিস্‌, এ জন্মে আর কিছু হবে না। এখন দুধটা জ্বাল দিয়ে দিগে যা।”

মেনকা অগত্যা ভবিষ্যৎ জীবনে আপনাকে বীরাঙ্গনা রূপে চিত্রিত করা সমাপন করিয়া দুধ জ্বাল দিতে চলিয়া গেল।

কলিকাতা যাওয়াটা স্থির হইবামাত্র ক্ষণিকা তখনই যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার সংকল্প পাছে সময়ের প্রভাবে ক্ষীণবল হইয়া আসে, এই ভয় তাহাকে পাইয়া বসিল। একটুখানি ভাবিতে বসিলেই কত জানা অজানা ভয় যে সম্মুখে আসিয়া সার দিয়া দাঁড়ায় তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। যাহা অনিশ্চিত, যাহার আকার প্রকার কিছুই জানা নাই, কখন্‌ আসিবে, কি বেশে আসিবে বুঝিবার কোনোই উপায় নাই, সে আশঙ্কার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করা বড় কঠিন। ক্ষণিকা যখনি মনে করে, এখনো সময় আছে, এখনও না-যাওয়া চলে, অমনি তাহার

সকল সাহস যেন ভাঁটার টানে জোয়ারের জলের মত বাহির হইয়া যায়। সে বুঝিল, বেশী দিন এত ভাব্না ভাবিবার অবকাশ পাইলে তাহার ভাব্নাই অবশেষে সার হইবে, যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিবে না। সে ব্যস্ত হইয়া মাকে বলিল, "মা, কালই তবে যাওয়া ঠিক করি, শুধু শুধু দেরি করে লাভ কি?"

তাহার মা বলিলেন, "যাবি ত। মিনুর কি ব্যবস্থা কর্বি? তাকে না স্কুলে দিবি বল্‌ছিলি? আচ্ছা, তুই ত এখন আর পড়্বি না, তা মিনুর খরচটা কি তোর মনোজাদি দিতে রাজি হবে না? তা হলে তবু স্কুলের কাজ অল্প মাইনে হলেও নেওয়া চল্‌বে। লোকের বাড়ী কাজ করা, কি রকম যেন আমার লাগ্‌ছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ তুই।"

ক্ষণিকার মুখখানা কেমন যেন হইয়া গেল। সে বলিল, "মা, মনোজাদির কাছে ও-কথা আমি অন্ততঃ কিছুতেই পাড়্‌তে পার্‌ব না। নিজের কপালে যা জুট্‌বার জুটেছে, মিনুটাকে আর আমি পরের গলগ্রহ হতে দেব না। ও কাজ নেওয়া যখন ঠিকই করেছি তখন আর ভয়ের কথা ভেবে লাভ কি? বরং ভয় যাতে দূর হয় সেই ভাব্নাই করা ভাল। মিনুকে সঙ্গেই নিয়ে যাই না-হয়, আমার সঙ্গে গেলে প্রথমটা তবু ভাল, একেবারে মুষ্‌ড়ে যাবে না।

আমার যা দশা হয়েছিল। কাল তা হলে আর হয় না। ওর কাপড়-চোপড় সব ঠিক করে দিতে হবে ত? পরশু কি তার পরদিন যাব।"

মেনকার পোষাক-পরিচ্ছদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। দুই-তিন দিন ধরিয়া দুই বোনে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া এবং লালুর আহ্লাদ বাড়াইবার আশঙ্কা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাহাকে ঘন ঘন দোকানে পাঠাইয়া মেনকার সাজসজ্জার আয়োজন একপ্রকার শেষ হইল। তার পর চোখের জল জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া, সকলের কাছে বিদায় লইয়া, হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ বর্ষার প্রভাতের মত করিয়া দুই বোন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

লালু তাহাদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিল। কলিকাতা অবধি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ক্ষণিকা কিছুতেই রাজী হইল না। যাহাকে ইহার পর একান্ত একেলা, নিজের দুই পায়ের উপর ভর দিয়াই চলিতে হইবে, তাহার পক্ষে একেলা দাঁড়ানোর অভ্যাস সকাল-সকাল আরম্ভ করাই ভাল।

কিন্তু ট্রেন ছাড়িয়া দিতেই তাহার বুকটা ভয়ে যেন দুলিয়া উঠিতে লাগিল। সংসার যে কত নিষ্ঠুর তাহা ত জানিতে বাকি নাই, দুই চোখ মেলিয়া যেদিন সে সংসারের দিকে

তাকাইয়াছে সেইদিনই চোখে পড়িয়াছে তাহার ভ্রুকুটি। আঘাত যে খাইতে হয় তাহাও ত নূতন কথা নয়। কিন্তু নূতন এইটুকু যে ভ্রুকুটি দেখিয়া কাহারও আঁচলের আড়ালে আর মুখ ঢাকিবার উপায় নাই। যে আঘাত তাহারই মত হতভাগ্য আরও কয়েকটা জীব ভাগাভাগি করিয়া গ্রহণ করিত, এখন তাহা একেলা তাহারই অঙ্গে সম্পূর্ণরূপে আসিয়া পড়িবে। শুধু তাহাই নয়, যে পথে আগে সে অন্যের হাত না ধরিয়া কখনো চলে নাই, আজ সেই পথেই তাহাকে ধাত্রীরূপে অনেককে বহন করিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু যাহার হাত এড়াইবার আর কোনই উপায় নাই, তাহাকে ভয় করিয়াই বা লাভ কি?

মেনকার জীবনে ট্রেনে চড়া তো বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই, সে তাই আনন্দে অধীর হইয়া একবার এ-জানলার কাছে ছুটিয়া যাইতেছিল, একবার ও-দরজায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মাথা বাহির করিয়া চারিদিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। পিছন পানে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না, সামনের দিকে চাহিয়াও সে কল্পনার রঙীন আলোকে সবই অপূর্ব্ব সুন্দর দেখিতেছিল। বাড়ীতে থাকাটা যে খুব আরামদায়ক নয় এই শিক্ষা তাহার ভাল করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর বাহিরটা যে তাহার চেয়েও কঠিন

হইতে পারে এ জ্ঞান হইতে তাহার তখনও দেরি ছিল।

দিদিকেও নিজের আনন্দের ভাগ দিবার জন্য উৎসুক হইয়া সে একবার ডাকিয়া বলিল, "কোণের মধ্যে এমন মুখ হাঁড়ি করে বসে রইলে কেন? দেখ মাঠের মাঝ দিয়ে কেমন সুন্দর রাস্তাটা গিয়েছে। পাড়াগাঁগুলো এমন চমৎকার দেখ্‌তে, তবু লোকে কেন যে সহরে ছুট্‌তে চায় তার ঠিক নেই।"

ক্ষণিকা বলিল, "তুই ছুট্‌ছিস্ কেন?"

মেনকা বলিল, "আহা, আমার কথা আলাদা। লেখা-পড়া শিখ্‌তে হবে না আমাকে?"

কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতে খুব বেশী সময় লাগিল না। ষ্টেশনের সীমানায় আসিয়া পড়িয়া ট্রেনের গতি যখন মন্দ হইয়া আসিল, তখন মেনকা শুষ্কমুখে বলিল, "আচ্ছা দিদি, চিন্ময়দা যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন; ষ্টেশনে যদি নিতে না আসেন ত কি হবে?"

সে আশঙ্কা যে দিদিরও একবারও হয় নাই তাহা নয়। কিন্তু ভয় পাইবার অধিকার তাহার আর কোথায়? হালের মাঝি বলিয়া যখন দুটি শঙ্কাকুল চোখ তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তখন কোন্ মুখে সে বলিবে যে এই অচেনা সাগরে

পাড়ি দিতে তাহারও বুক ভয়ে কাঁপে ? কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব সহজ করিয়া সে হাসিয়া বলিল, "তা হলে কি আবার হবে ? নিজের বাক্স বিছানা মাথায় করে রাস্তা দিয়ে চলে যাব।"

প্ল্যাট্‌ফর্মের বিপুল জনতা আর বিরাট কোলাহলের আভাস পাইয়া মেনকার মুখ আরও শুকাইয়া গেল। সে কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "না দিদি ঠাট্টা নয়, বলনা ? তুমি গাড়ী করে যদুবাবুদের বাড়ী যেতে পার্‌বে, কখনও গিয়েছ ?"

মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণিকার নিজের ভয় সত্য-সত্যই চাপা পড়িয়া গেল। এমন করিয়া যদি কেহ আশ্বাস চায় তবে তাহাকে আশ্বাস দিবার মত শক্তি যে সঞ্চয় করিতেই হয়। ক্ষণিকা বলিল, "পার্‌ব রে পার্‌ব। তোকে অত ভয় পেতে হবে না। এ দিকে ত লালুর ওপর অত তম্বি করিস, লালু হলে এত ভয় পেত ?"

মেনকা একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "ওরা যে কত একলা একলা বেড়ায় ? ওদের ত কেউ কিছু বলে না, সবাই যে কেবল মেয়েদের পেছনে লাগে।"

ক্ষণিকা বলিল, "এখন থেকে আমরাও একলা একলা বেড়াব। পেছনে লাগে ত আর কি করা যাবে ?"

ট্রেন থামিতেই তাহারা দুই বোনে নামিয়া পড়িল। চারিদিকে তখন ভীষণ কোলাহল, লোকজনের চীৎকার,

মোট-মাথায় কুলির ধাক্কায় এক জায়গায় দু মিনিট দাঁড়ানো যায় না। কানের কাছে একসঙ্গে যখন পাঁচ-ছয় জন "কুলি চাহি মাইজি" বলিয়া চেঁচাইয়া ক্ষণিকাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তখন মেনকা হঠাৎ উচ্ছলিত আনন্দের স্বরে বলিয়া উঠিল, "দিদি, চিন্ময়-দা আস্‌ছেন।"

দুইজন কুলিকে তাহাদের জিনিষপত্র নামাইবার আদেশ দিয়া, ক্ষণিকা বলিল, "কৈ দার্জ্জিলিংএর মেয়ে-কুলির মত জিনিষ নিয়ে যেতে পার্‌লি না ত?"

মেনকা বিনুনীসুদ্ধ মাথাটাকে সজোরে দুলাইয়া বলিল, "আমার যে এখানকার রাস্তাঘাট কিছু চেনা নেই, তা না হলে বেশ পার্‌তাম। নিজে না পারি, লোকজন ডেকে নামাবার ব্যবস্থা বেশ কর্‌তে পার্‌তাম।"

চিন্ময়কে দেখিবামাত্রই মেনকার সাহসের আর কূল-কিনারা রহিল না। চট্ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া সে খাবারের হাঁড়ি যে কুলি নামায় নাই সেই ভুলটা ধরিয়া দিল, কুলিকে বকুনি দিতেও ছাড়িল না। চিন্ময় কাছে আসিয়া বলিল,"এই যে, একেবারে স্বাধীনভাব! জিনিষপত্র নামানোও হয়ে গেছে? গাড়ী করে চলে যাওয়াটা শুধু বাকী?"

মেনকা বলিল, "তাও যেতাম, আপনি আর-একটু দেরি কর্‌লে।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ট্রেন থাম্‌বার আগেই মিনু গাড়ী ডাক্‌বার উপক্রম কর্‌ছিল বটে।"

চিন্ময় গাড়ী ঠিক করিয়া, বাক্স বিছানা ও মানুষ সব তাহার ভিতরে ও বাহিরে বোঝাই করিয়া শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল। ক্ষণিকার ইচ্ছা ছিল কাজটার আরও একটু বিবরণ শোনে, কিন্তু "এই বাড়ীটা কার, ওটা দোকান না থাক্‌বার বাড়ী, মাড়োয়ারীদের যদি অত টাকা ত তারা হাঁটুর উপর ময়লা কাপড় পরে বসে কেন, এ-রাস্তার নাম কি, সব রাস্তায় ট্রাম আছে কি না"—মেনকার এই-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে চিন্ময়ের নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ রহিল না।

যদুবাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া নাইয়া খাইয়া সুস্থির হইতেই তাহাদের ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেল। যদুবাবুর মেয়ে মাধবী মেনকারই সমবয়সী হইবে, প্রথম সাক্ষাতেই দুজনের অতিরিক্ত রকম ভাব হইয়া গেল। দুপুরে বিছানায় একটু-খানি গড়াইয়া লইয়া ক্ষণিকা যখন উঠিয়া বসিল, তখন দেখা গেল যে মাধবী-মেনকার ভাব এতখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে মাধবীর হাতের সোনার চুড়ী মেনকা পরিয়া বসিয়া আছে এবং মেনকার হাতের সরু দুগাছি রুলি, বন্ধু-প্রীতির খাতিরে মাধবী নিজের শ্রীহস্তে ধারণ করিতে ত্রুটী

করে নাই। ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "এরি মধ্যে এত ভাব হয়ে গেল মাধু?"

মাধবী বিজ্ঞভাবে বলিল, "ভাব হবার হলে এরি মধ্যেই হয়, না হলে চিরজন্মেও হয় না।"

চিন্ময় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "যা বলেছিস, পৃথিবীর সার কথা। কিন্তু কি করে জান্‌লি বল্ ত? তোর ইস্কুলে এই-সব শেখায় বুঝি?"

মাধবী রাগিয়া বলিল, "আহা, ভারি এক ঠাট্টা পেয়েছেন। আমাদের স্কুল তোমার স্কুলের চেয়ে এক ফোঁটাও কম নয়।"

ক্ষণিকা বলিল, "যাক্, এখন বাজে কথা রাখ। ওঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌বার কি বন্দোবস্ত করা যায় তাই বল। শনি-রবিবার ছুটো দিন হাতে, সোমবারে মেনকাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি কর্‌তে যেতে হবে।"

চিন্ময় বলিল, "দেখা করা আর শক্তটা কি? তোমার চিঠির উত্তরে অনাদি-বাবু লিখেইছিলেন ত এ-সপ্তাহের যে-কোনো দিন বিকেলে গেলে দেখা হতে পার্‌বে। তা গেলেই হবে আজ। না হয় বল ত একবার ভাতুড়ির দোকানে গিয়ে phone করে আস্‌তে পারি। তাঁদের বাড়ী আবার ওল্‌ড্ বালিগঞ্জের এক টেরে। গিয়ে জেনে আস্‌বার উপায় নেই।"

ক্ষণিকা বলিল, "একবার phone করে দেখা ভাল।

যদি না থাকেন ত অতখানি যাওয়া বিফল হবে। আমার সঙ্গে যাবি মিনু, না থাক্‌বি ?"

মাধবী তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনার সঙ্গে গিয়ে কি কর্‌বে ? আপনারা ত রাজ্যের কথা বল্‌বেন আর ও বুঝি হাঁ করে বসে থাক্‌বে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা কাজ নেই গিয়ে। হাঁ করে থাকার চেয়ে এখানে মুখ চালাবার এত সুবিধা পাচ্ছে, তাই করা ভাল।"

চিন্ময় খানিক পরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "অনাদি-বাবু আজ বিকেলে বাড়ী থাক্‌বেন না, কাল দুটোর থেকে পাঁচটার মধ্যে যাবার কথা বল্‌লেন। মানুষ ভালই বোধ হচ্ছে, নিজে যেচে বল্‌লেন যে গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।"

মেনকা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "যদি মোটর্‌কার হয়, দিদি, তা হলে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

মাধবী মেনকার এ-হেন ছেলেমানুষী দেখিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

( ৭ )

বেলা একটা বাজিতে না বাজিতেই মেনকা ক্ষণিকাকে অস্থির করিয়া তুলিল—"দিদি, বেশ ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছ ? ওদের গাড়ী এসে পড়ে যদি ?"

ক্ষণিকা মেজের উপর মাছুর পাতিয়া একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল মেনকার সাজসজ্জা এরি মধ্যে প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। বাক্স খুলিয়া নিজের স্বল্প পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা চটক্‌দার সেটি পরিয়া, মাধবীর একটা চওড়া গোলাপী রেশমের ফিতার দ্বারা খোলা চুল বেষ্টন করিয়া মুখে পাউডার ও অঙ্গে এসেন্সের আভাস লইয়া সে ক্ষণিকাকে সচেতন করিতে আসিয়াছে। ক্ষণিকার হাসিও পাইল, একটু বিরক্তিও বোধ হইল। উদরের অন্নের সংস্থান করিতে যাহাদের বাড়ীতে তাহাকে খাটিতে যাইতে হইবে, তাহাদের কাছে ধার-করা সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া যাওয়ায় আনন্দের পরিবর্ত্তে লজ্জাই হওয়া উচিত। কিন্তু মেনকাকে সেই কথা বলিয়া মুষ্‌ড়াইয়া দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। যে ক'টা দিন সে জ্ঞানবৃক্ষের তিক্ত ফলের আস্বাদ নিজে না পায়, জোর করিয়া তাহাকে সে রস বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি? ধনীর পরিবারের লোক না-হয় আড়ালে একটু হাসিবে, সে হাসি যতক্ষণ চোখে না পড়ে, ততক্ষণ সহিয়া যাওয়া যায়। মাছুরের উপর উঠিয়া বসিয়া ক্ষণিকা বলিল, "তা হলে আমার বদলে তোকেই পাঠিয়ে দেব, তুই ত ঠিক হয়ে আছিস!"

"আচ্ছা নাও, ওঠ ত এখন। আমাকে পেয়ে তারা ত বর্ত্তে যাবে আর-কি! যা না কাজের মেয়ে আমি।" মেনকা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু মেনকার এত উৎসাহ সত্ত্বেও গাড়ী তিনটার আগে আসিয়া পৌঁছিল না। ক্ষণিকা চুল বাঁধা কাপড় পরা শেষ করিয়া ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মেনকা ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিয়া, বাঙ্গালীর সময়-জ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া, এবং ক্ষণিকার বেশ-ভূষায় সহস্র ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া নিজেও অস্থির করিয়া তুলিল। অবশেষে একখানা কালো রঙ্গের মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইতেই সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "এইটা নিশ্চয়ই অনাদি-বাবুর গাড়ী, তা না হলে আর কার মোটর আসবে?"

মাধবী তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে পথ পর্য্যবেক্ষণে সাহায্য করিতেছিল। মেনকার কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "আহা, অনাদি-বাবু ছাড়া সংসারে আর কারু মোটর নেই যেন? আর আমাদের বাড়ীর সামনে ত রোজ দশ গণ্ডা মোটর দাঁড়াচ্ছে। বাবার বন্ধুরা ত নাইন্টি-ফাইভ্ পার্-সেন্ট্ মোটরে করেই আসে।"

চিন্ময় তাহাদের তর্কে বাধা দিয়া বলিল, "আচ্ছা,

পার্-সেণ্ট্ কথা পরে হবে, এখন ক্ষণিকাকে ডেকে দেও। মিনু তোমার যা সাজ দেখ্ছি, তোমার না বড়মানুষের বাড়ী একটা ভাল রকম কাজ জুটে যায়। নিয়ে যেতেই ত ভরসা হচ্ছে না, ফিরে পাব কি না সন্দেহ।"

মেনকা মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বাহিরে মুখখানা বেশ বাঁকাইয়া নাকি সুরে বলিল, "আহা, আপনার যা কথা। যান্, আমার পেছনে লাগ্বেন না।"

ক্ষণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "চল, আর দেরি কেন?"

চিন্ময় বলিল, "মুখখানা যা বানিয়েছ, চাকরী কর্‌তে যাচ্ছ কি ফাঁশীর জায়গায় যাচ্ছ কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দেখ ত মিনুকে, দেখে শেখ। আমি ভেবেছিলাম তোমরা ত সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তোমাদের একলাই ছেড়ে দেব, কিন্তু মুখ দেখে ত আর ভরসা হচ্ছে না। সঙ্গে যাব নাকি?"

অজানা সাগরে পাড়ি দিবার মুখে ক্ষণিকার তখন বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। তবু সে শুষ্ক মুখে কোনো ক্রমে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "যা তোমার খুসি! কিন্তু যা কর্‌বে, শীগ্‌গীর কর, ভদ্রলোকের গাড়ী আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখ্‌বে?"

চিন্ময় ঘর হইতে একখানা শাল টানিয়া আনিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল, "চল।"

তিনজনে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। সজোরে একটা দোলা দিয়া মোটর ছাড়িবা মাত্র, মেনকা ক্ষণিকাকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিল। চিন্ময় বলিল, "এঃ! তুমিও দেখ্‌ছি এক গোয়ালের গরু, এত ভয় পেলে কি আর স্বাধীন হওয়া যায়?"

মেনকা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি কেবল ভয়ই দেখ্‌ছেন সব তাতে। উল্টে পড়ি আর-কি?"

ক্ষণিকা সারাপথ নীরবে বসিয়া আকাশ-পাতাল কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার ঠিক্ ঠিকানা নাই। চিন্ময় এক-এক বার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দু-একটা আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মেনকার অনর্গল প্রশ্নের উত্তর জোগাইতে গিয়া তাহার আর কিছু বলিবার বা ভাবিবার অবসর একেবারেই মিলিতেছিল না।

ক্রমে কলিকাতার বিপুল জনসঙ্ঘ আর গাড়ী-ঘোড়ার বিরাট মেলা ছাড়িয়া তাহারা বালিগঞ্জের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথ ধরিল। মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি পাড়া-গাঁ নাকি?"

বিনয় বলিল, "হাঁ, এই বনগাঁয়ে তোমাকে শেয়াল-রাজা কর্‌বার জন্যে আনা হয়েছে।"

মেনকা একটুকু চটিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আপনাকে আর একটা কথাও জিগ্‌গেষ কর্‌ব না। কেবল আপনি আমাকে ঠাট্টা করেন।"

চিন্ময় এবং মেনকার ঝগ্‌ড়ার পালা শেষ হইতে না হইতে মোটরখানা একটা গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ক্ষণিকা এতক্ষণ পরে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাড়ীখানি মোটের উপর দেখিতে বেশ। সাম্‌নে একটু ফুলের বাগান, পিছনে একটু সবুজ ঘাসে ঢাকা জমিও আছে। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে ওখানে টেনিস্‌-কোর্ট ছিল, এখন ঘাস গজাইয়া সব চিহ্ন প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে। বাড়ীটি দুতলা, তবে অধিকাংশ ঘরেরই দরজা জান্‌লা এই শীতের দিনেও বন্ধ।

গাড়ী থামিবার আগেই চিন্ময় দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। মেনকা ও ক্ষণিকা নামিবার পর, একজন ঝি ও একজন দরোয়ান বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া চলিল। মেনকার চঞ্চল চোখ অস্থির হইয়া কেবলি চারিদিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ইহারই

মধ্যে সে মুখের ভাবখানা এমন করিবার চেষ্টায় ছিল, যেন জগতে সবই তাহার কাছে এমন পুরাতন ও নগণ্য যে কোনো কিছু দেখিয়াই আর তাহার একবিন্দুও বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না।

দোতলার সিঁড়ি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানটা চেয়ার টেবিল দিয়া বেশ বসিবার ঘরের মত করিয়া সাজানো। কিন্তু সমস্ত জায়গায়ই একটা যত্ন এবং তত্বাবধানের অভাব ক্ষণিকার নারী-চক্ষে ধরা পড়িতেছিল। এককালে এই গৃহস্থালী বেশ সুসজ্জিতই যে ছিল তাহা বোঝা যায়; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা শোভা ছিল, যত্নের অভাবে এখন তাহা অনেক স্থলেই আবর্জ্জনার আকার ধারণ করিয়াছে। ঝি তাহাদের বসিতে বলিয়া সাম্‌নের ঘরের ভারী সবুজ পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। দরোয়ান নীচে নামিয়া গেল।

চিন্ময় বসিয়া বলিল, "কেমন ঠেক্‌ছে ?

ক্ষণিকা বলিল, "বাড়ীটা শুধু দেখে আর কেমন ঠেক্‌বে ? মানুষগুলো দেখ্‌লে বল্‌তে পার্‌তাম।"

মেনকা বিজ্ঞের মত বলিল, "আমার কিন্তু দেখে-শুনে ভালই লাগ্‌ছে।"

এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে ঝিয়ের সঙ্গে একজন মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন—আগাগোড়া তিনি এমনভাবে

শীতবস্ত্রে আবৃত যে একমাত্র পাকাচুল ও বলিচিহ্নিত মুখের কিয়দংশ মাত্র দেখা যাইতেছে। ক্ষণিকা আন্দাজ করিল ইনিই বাড়ীর গৃহিণী হইবেন। সে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, মেনকাও দিদির অনুসরণ করিল। চিন্ময় আপনার পৌরুষ-গর্ব্ব বজায় রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে একটা নমস্কার করিল।

বৃদ্ধা একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "বসো বাছা, বসো। অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি ? আমি ভাবছি, অনাদিই তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে বুঝি। ও মা! এতক্ষণ পরে ঝি-মাগী গিয়ে বলে কি, কাদের বাড়ীর সব ছেলে-মেয়েরা এসে বসে আছে। আমি বলি, 'সে কি রে, তোদের বাবু কই ?' তখন বলে, 'তিনি ত নীচে কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইছে।' তখন আমিই উঠে এলুম। বুড়ো হয়েছি একে, তার উপর বাতে আর জ্বরে শরীরে আর পদার্থ রাখেনি। নড়তে-চড়তে পারি না, হাঁটুতে ব্যথা, হাতে ব্যথা, গায়ে ব্যথা, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। জ্বর ত লেগেই আছে, সকালে ছাড়ছে ত সন্ধ্যেয় আসছে, সন্ধ্যেয় ছাড়ছে ত রাত্তিরে আসছে। কাজ-কর্ম্ম কিছু করতে পারি না, ঝি চাকর আসকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে। একটা কি কথা শোনে ? সেদিন ঝি-মাগীকে বললাম 'এত দেরি কেন ?'

মুখের উপর বলে কি 'ঘুমিয়ে পড়েছিনু গো, ঘুমিয়ে পড়েছিনু, গরীবের শরীল কি আর শরীল নয়?' শুন্‌লে মা কথা!"

তাঁহার আধিব্যাধির ইতিহাসে বাধা দিবার জন্য ক্ষণিকা বলিল, "তবে ত বড় অসুবিধায় পড়েছেন দেখ্‌ছি।"

"অসুবিধে বলে অসুবিধে মা, অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দুটো মানুষের সংসার তাই চালানো দায়। টাকা থেকেই কি হচ্ছে? চাকর-বাকর কি আর যত্ন করে? নিজের বৌ ঝি থাক্‌লে কি আর এত দুর্গতি হয়? একটা নাত্‌নী ছিল কাছে, তা এমন অযত্ন হতে লাগ্‌ল যে তার মামা তাকে তার পিসীর কাছে দিয়ে এল। তা না হলে মারা যেত মেয়েটা।"

ক্ষণিকা দেখিল কাজের কথা ইঁহার সঙ্গে হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নাই। তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। বলিল, "অনাদিবাবু যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে, তারি জন্যে আমরা এসেছি।"

"ওমা তাই নাকি? আমি বলি আমার ছেলের কোনো বন্ধু-বান্ধব বুঝি? কতই আছে মা, চিনিও না সবাইকে, নামও মনে থাকে না। হ্যাঁ অনাদি বলেছিল বটে, আজ একজন আস্‌বে কাজের জন্যে। তা আমি ভেবেছিলাম আমাদেরি বয়সী হবে, তুমি ত নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখ্‌ছি। এ-দুটি তোমার ভাই বোন বুঝি?"

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ, এইটি আমার বোন!"

"আর ঐ ছেলেটি, ওটি কে হয় তোমার?"

ক্ষণিকা উত্তর দিবার আগেই মেনকা বলিল, "উনি আমাদের মাস্তুতো ভাই।"

বৃদ্ধা মহিলা বলিলেন, "বেশ বেশ, তা বাছা তুমি যদি থাক আমার কাছে খুব যত্নেই থাক্‌বে। খাবার পরবার কষ্ট কখনো এ-বাড়ীতে কেউ পায়নি। এক যদি ঝি-চাকরে বজ্জাতি করে যন্ত্রণা দেয়। নিজে পারি না দেখ্‌তে শুন্‌তে, ওরা যা খুসি করে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনার যাতে আর অসুবিধা ভোগ না কর্‌তে হয় সেইজন্যেই ত আমার আসা। আমি যতটা পারি ভাল করে চালাতে চেষ্টা কর্‌বো।"

"হ্যাঁ তা ত কর্‌বেই বাছা, আমাদেরি বাঙ্গালী গেরস্ত ঘরের মেয়ে ত তুমি! সবই জান। কিছুদিন আগে অনাদি কোথা থেকে এক ফিরিঙ্গি ছুঁড়ীকে নিয়ে এল, বাবা তার কি তেজ! আমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে ধমক দেয়। আমি বলি—বিদায় কর বাপু ওকে, আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তা সে ঝগ্‌ড়া করে নিজেই চলে গেল।"

চিন্ময় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল,

"অনাদিবাবুর আজ বোধহয় অবসর হবে না? আমরা কি আরেকদিন আসব?"

"না, সে এই এল বলে। ও কদম, ওরে ও পঞ্চা, বাবুকে খবর দিস্‌নি?"

বলিতে বলিতেই সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। গৃহকর্ত্তা অনাদিনাথ মৈত্র এতক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনজনেই ব্যগ্র হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। কারণ গৃহিনীর কথাবার্ত্তায় তাহারা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে নামে গৃহিণী হইলেও কার্য্যতঃ গৃহিণী-পনার সঙ্গে ইঁহার অল্পই সম্পর্ক আছে। অতএব কারবার বিধি-ব্যবস্থা যাহা-কিছু করিতে হইবে তাহা গৃহকর্ত্তারই সহিত। সুতরাং অনাদিনাথের আবির্ভাব মাত্রেই তিনজোড়া চোখ অনেকখানি আগ্রহ লইয়াই তাঁহার উপর গিয়া পড়িল।

ক্ষণিকা দেখিল, বর্ণনা শুনিয়া মানুষটিকে সে যেরূপ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি ঠিক সে-প্রকারের নহেন। একবার তাকাইলে মনে হয় ভদ্রলোক যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিতেই তাঁহার চোখের একটা সতেজ তরুণভাব তাঁহার মাথার পাকাচুলের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেয়। বয়স হয়ত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ

হইতে পারে, কি দু-এক বৎসর বেশীও হইতে পারে। চেহারাখানা যে ঠিক সুন্দর তাহা নয়, কিন্তু তাহার ভিতর এমন একটা কিছু আছে যাহাতে সৌন্দর্য্যের অভাবের কথাটা সহজে মনে পড়ে না।

আর-এক পালা অভিবাদন-অভ্যর্থনার পর সকলে আবার বসিলে পর অনাদিনাথ বলিলেন, অনেকক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রাখ্‌লাম। কতকগুলি ছেলে হটাৎ এসে উপস্থিত হল, তারা একেবারে নাছোড়বান্দা, তাদের বিদায় কর্‌তে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।"

আরও ঘণ্টা-দুই বসিয়া সদালাপ করিবার ইচ্ছা চিন্ময়ের একেবারেই ছিল না, সে কাজের কথা পাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনার সময় ত আর আমাদের মত শুধু-শুধু নষ্ট কর্‌বার জন্যে হয়নি।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "এইবার একটু নষ্ট কর্‌ব ভাব্‌ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কল্‌কাতা ছেড়ে বেরবার কথা আছে, দিন পাঁচ-সাত পরেই। তার মধ্যে কি আপনি প্রস্তুত হয়ে নিতে পার্‌বেন?"

প্রশ্নটা ক্ষণিকাকেই করা হইল, অতএব সে বলিল, "তা পার্‌ব বোধ হয়।" যাক্‌ কাজ পাওয়া না-পাওয়ার ভাবনার তাহা হইলে অবসান হইল।

চিন্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, আজ তবে আমরা আসি। তিন-চার দিনের মধ্যেই ওঁর সব গোছানো হয়ে যাবে বোধ হয়।"

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃদ্ধা গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "বাঁচলাম বাছা, তুমি ঠিক আমার ঘরের মেয়ের মতই থাক্‌বে। ছেলেমানুষ আছ, তা আর কি হবে? আমার বাড়ী কোনো ভয়-ভাবনা নেই। মানুষের মধ্যে ত এক অনাদি। তা নিজের ছেলে, বল্‌তে নেই, কিন্তু এমন সৎ-ছেলে তুমি কল্‌কাতার শহরে আর দুটি দেখ্‌তে পাবে না। এই যে খ্রীষ্টান ছুঁড়ী ছিল, একদিনের বেশী দুদিন তার সঙ্গে কথা কয়নি, বাড়ীতে কে থাকে কে না থাকে তার খোঁজই রাখে না ও।"

মেনকার এমনই হাসি পাইল যে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। চিন্ময় মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া সোজা সাম্‌নের দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্ষণিকা অত্যন্তই অপ্রস্তুত বোধ করিল। গৃহিণীর কি কোনো প্রকারের কাণ্ডজ্ঞান নাই? ছেলের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে এ-হেন সার্টিফিকেট্‌ দিবার কি এমন প্রয়োজন পড়িয়াছিল।

কিন্তু অনাদিনাথের বিশেষ কোনো ভাব-ব্যতিক্রম

দেখা গেল না। তিনি যেন কথাগুলি শুনিতেই পান নাই এমনভাবে বলিলেন, "শুক্রবারের মধ্যে যদি আস্‌তে পারেন তাহলে বড় ভাল হয়। আমাদের যাবার কথা আস্‌চে-রবিবারে, দুতিন মাস থাকৃতে হবে বোধ হয়। জিনিষপত্র সেই আন্দাজে নিতে হবে। আপনি এলে সে-সব গোছানোর পক্ষে মায়ের খুব সাহায্য হয়, আমি ও-সব কাজে একেবারেই লাগি না।"

ক্ষণিকা বলিল, "তাই আস্‌ব।"

গৃহিণাকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। অনাদিনাথও তাহাদের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। মোটরকে চালাইবার সরব আয়োজনের অবসরে তিনি চিন্ময়ের পাশে আসিয়া বলিলেন, "ওঁর যতটা কম অসুবিধা হয় আমি প্রাণপণে তার চেষ্টা করৃব, তবে দেখ্‌ছেন ত অবস্থা? সব এমন ওলোটপালট্ হয়ে আছে যে সে-সব ঠিক করাই এক মহা পরিশ্রমের ব্যাপার। আশা করি উনি অসুবিধাগুলো অবস্থা বুঝে ক্ষমা করে চল্‌বেন।"

চিন্ময় গম্ভীরভাবে বলিল, "তা পারৃবে ও। জন্মাবধি chaosকে orderএ আনাই ওর অভ্যাস।"

গাড়ীতে চড়িবার মুখে ক্ষণিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাদিনাথকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল। মেনকাকেও

অগত্যা প্রণাম করিতে হইল, কিন্তু সেটা যে তাহার বিশেষ পছন্দ হইল না তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল। মোটর চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র সে বলিল, "দিদির ভক্তির জ্বালায় অস্থির! সবাইকে কেবল ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণামই কর্‌ছে। বাবা, কি অদ্ভুত অনাদিবাবুর মা! এমন যা-তা কথা বল্‌তে পারেন। দিদি আর আপনি যে কি করে না হেসে রইলেন তার ঠিক নেই। আমার ত হাসি চাপ্‌তে গিয়ে পেটে ব্যথা হয়ে গেল।"

চিন্ময় বলিল, "এই বেলা হেসে নাও, তা না হলে রোগ সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌বে।"

মেনকা তাহার কথায় কান না দিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, এইবার ত বাড়ীর লোকদের দেখ্‌লে, কেমন লাগ্‌ল? মাগো মা, অমন অদ্ভুত বুড়ীর সঙ্গে কি করে থাক্‌বে? আর একটাও লোক নেই যে একটু কথা ব'লে বাঁচ্‌বে। অনাদি-বাবু ত এমন ভাল যে তিনি কথাই বলেন না। আচ্ছা তুমি পড়াবে কাকে? অনাদি-বাবুকে ত নয়ই, তিনি ত অত বড় প্রফেসার। তাঁর মায়েরও ত পড়্‌বার বয়েস নেই, তার উপর আবার বাত আর জ্বর। বাবা, আমি হলে অমন কাজ কখনও নিতাম না। কথা না বলে বলে যে বোবা হয়ে যাব?"

ক্ষণিকা বলিল, "তোমার মত কথা বলার উপর অত ঝোঁক নেই আমার। যা বাড়ী-ঘরের দশা দেখ্‌লাম তা গোছাতেই আমার চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যাবে, কথা কইবার সময় পাব কখন? আর এখন ত ওঁরা চেঞ্জে যাবেন, জিনিষ বাঁধা আর খোলা কর্‌তেই দিন কেটে যাবে।"

মেনকা বলিল, "অনাদিবাবুর মায়ের কিন্তু মাথা খারাপ বাপু, যাই বল। তোমাকে জ্বালিয়ে মার্‌বেন, সারাদিন ছেলের অপূর্ব্ব গুণ ব্যাখ্যা করে।"

চিন্ময় হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তাতে তোমার দিদির খুব বেশী আপত্তি হবে বলে ত মনে হচ্ছে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "কি দেখে সেটা আবিষ্কার কর্‌লে হঠাৎ?"

চিন্ময় বলিল, "যা দেখেই করি, কথাটা ঠিক। এই নাও, বাড়ী ত এসে পড়্‌ল। এর পর মিনুকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পার্‌লেই সব হাঙ্গাম চুকে যায়। তোমার কর্ম্মস্থানটা তোমার যে পরিমাণে পছন্দ হল, মিনুরও যদি স্কুল সেই পরিমাণে পছন্দ হয়, তবে ত আর ভাবনাই থাকবে না।"

মেনকা বলিল, "আহা ভাবনায় ত ঘুম হচ্ছে না আপনার। আচ্ছা অনাদি-বাবু কি খুব বেশী বুড়ো? চুল ত রগের কাছে বেশ পেকেছে, কিন্তু বেশী বুড়ো মনে হয় না।"

চিন্ময় হাসিয়া উঠিয়া তাহার সহিত ঠাট্টা আরম্ভ করিল। ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল।

( ৮ )

মেনকার স্কুলে যাইবার জন্য আগ্রহও যত ছিল, আশঙ্কাও প্রায় তার সমান ছিল। তাহার বয়সের পক্ষে লেখাপড়া সে তেমন শিখিতে পারে নাই, ছোট মেয়েদের সঙ্গে পড়িতে হইবে, সে এক ভাবনার কথা। তার চেয়ে বড় ভাবনা এই ছিল যে, তাহার পাড়াগেঁয়ে ধরণ-ধারণ দেখিয়া বোর্ডিংএর মেয়েরা হাসিবে কি না, সকল বিষয়ে সে তাহাদের সহিত সমান চালে চলিতে পারিবে কি না। কাজেই যেদিন তাহার স্কুলে যাইবার দিন স্থির হইল, সে দিনটা ভয়ে আশায়, আগ্রহে ও বিচ্ছেদ-দুঃখে তাহার মনটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল।

মাধবীও ঐ স্কুলেরই ছাত্রী, সে সকাল হইতেই মেনকাকে তালিম দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোন্ শিক্ষয়িত্রী ভাল, কে মন্দ, কে সুন্দরী, কে বা কুৎসিত, কাহাকে কতখানি ভালবাসা সঙ্গত, এ-সকল তথ্য মেনকা আগেই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল। এখন তাহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, কাহার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিলে ভবিষ্যতে সুখ ও

সুবিধা লাভ হয়। কারণ মাধবী তাহাকে বারবার করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে যে শিক্ষয়িত্রীদের ধরণই এই যে প্রথমে যে মেয়ের সম্বন্ধে তাঁহাদের যেমন ধারণা হয়, সেই ধারণারই বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা চিরদিন চলেন। দৃষ্টান্ত দেখাইতেও সে ক্রটী করে নাই, "এই দেখনা, আমাদের ক্লাশে নীরদা বলে একটা মেয়ে পড়ে, তার মত অহঙ্কেরে মেয়ে দুটো দেখিনি। কিন্তু সরসী-দি তাকে যে কি সোনার চক্ষেই দেখেছিলেন, তাঁর মতে অমন মেয়ে আর হয় না। গুণের মধ্যে মেয়ে প্রথম দিন ট্রান্‌স্‌লেশনে একটাও ভুল করেনি। হয়ত ঐ প্যাসেজ্‌টাই বাড়ীতে কখনও করে থাক্‌বে কে জানে? তার পর থেকে যেমনই লিখুক না কেন, তার খাতাই আগে দেখা হবে, ক্লাশ সুদ্ধকে পড়ে শোনান হবে। নীরদা ত একেবারে কোলাব্যাঙের মত ফুলে ওঠে। আর দেখ স্বর্ণকে, বেচারী এমন ভাল, অথচ বিনোদিনী-দি তাকে উঠ্‌তে বস্‌তে বকুনিই লাগাচ্ছেন, প্রথম দিন সে থতমত খেয়ে তিনটে অঙ্কই ভুল করেছিল, তাই যেন চিরজন্মই সে সব ভুল কর্‌বে।"

মেনকা সভয়ে বলিল, "বাবা! তা হলেই গিয়েছি, আমি আবার অল্পেই এমন ভড়্‌কে যাই!"

ক্ষণিকা বলিল, "এখন থেকে ভয়ে মূর্চ্ছা যেও না যেন। মাধবী তোমাকে খুব ত দেখি বুঝিয়ে দিল। আমিও ত প্রথম

প্রথম পড়া একেবারেই পার্‌তাম না, তাই বলে চিরজন্ম আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখেনি। তোরা নিজেরা পড়া কর্‌বি না, আর দোষ চাপাবি সব লোকের ঘাড়ে।"

মাধবী মাথা নাড়িয়া বলিল, "আহা, আপনি যে পড়েছিলেন মনোজা-দি তরুদির হাতে? তাদের নামে ত আর বল্‌ছি না? তাই বলে সব টীচারই যে তাঁদের মত, তা মোটেই নয়।"

ক্ষণিকা বলিল "আচ্ছা, এখন টীচারের সমালোচনা থাক, নিজেরা নিজেদের কাজ কোরো, অন্যে যা করে কর্‌বে।" সদুপদেশ দিয়াই তাহার যদিও হাসি পাইল, এই প্রকার সমালোচনা নিজের ছাত্রী-জীবনে কত অসংখ্যবার যে সে করিয়াছে তাহার ঠিক্ ঠিকানা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া পরকে উপদেশ না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?

যথাসময়ে ভাড়াটে গাড়ীর উপরে মেনকার ছোট টীনের ট্রাঙ্ক ও শতরঞ্চি-মোড়া বিছানা চাপাইয়া তাহারা স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। মেনকা থাকিয়া থাকিয়া কেবলি বলিতে লাগিল, "বাবারে, আমার এমন ভয় কর্‌ছে, হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

চিন্ময় বলিল, "মিনুই ঠিক উপযুক্ত স্কুলের মেয়ে হতে

পার্‌বে। তোমার দিদির শিক্ষা একেবারে বৃথাই গেল। না শিখ্‌ল ইঁদুর আর্‌শোলা দেখে লাফাতে, না শিখ্‌ল 'বল হরি' শুনে মূর্চ্ছা যেতে। তুমি যথাকর্ত্তব্য বেশ পালন কর্‌তে পার্‌বে।"

গাড়ী আসিয়া স্কুলের সাম্‌নে দাঁড়াইতেই চিন্ময় নামিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি আর ও প্রমীলার রাজ্যে ঢুকে কি কর্‌ব? ততক্ষণ ফুটপাথে ঘুরে বেড়াই, সময় হলে ডাক দিও।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি কি তোমায় রাস্তায় বেরিয়ে ডাক্‌ব নাকি? তুমি চল না ভিজিটার্স রুমে বস্‌বে।"

চিন্ময় বলিল, "থাক্‌না, আচ্ছা আমায় ডাক্‌তে হবে না, আমিই আন্দাজ করে ঠিক সময়ে আস্‌ব।"

অগত্যা চিন্ময়কে বাহিরেই রাখিয়া তাহারা দুই বোনে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তখন স্কুলের সময়, কাজেই ছুটী কাহারও নাই, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইয়া, মেনকাকে পরীক্ষা করিয়া ক্লাশে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মাধবীর তালিম দেওয়ার ফলে মেনকা দু-একটার বেশী ভুল করিল না। ক্ষণিকা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, গাড়ীতে মেনকার রকম দেখিয়া তাহার ভয় হইয়াছিল যে বুঝি স্কুলে ঢুকিয়াই তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইবে।

ভর্ত্তি করা চুকিয়া যাইতেই ক্ষণিকা বলিল, "একে একটু বোর্ডিংটা ঘুরিয়ে আনি ?"

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ যাও, তোমার ত আর গাইডের দর্‌কার নেই। তুমি নিজে তাহলে আর আস্‌ছ না ? বোনকেই বদ্‌লি দিয়ে গেলে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "কিছুদিনের মত ত বটে, তার পর নিজেও এসে জুট্‌তে পারি।"

দুই বোনে বাহির হইয়া আসিবামাত্র মেনকা বলিল, "উনি ত বেশ হেসে কথা বল্‌লেন, ঠিক এমনি মানুষের মত!"

ক্ষণিকা বলিল, "তবে কি দেখা হবামাত্রই রুল দিয়ে দু ঘা কষিয়ে দেবেন নাকি ? মাধবী তোর দেখ্‌ছি একেবারে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

বোর্ডিংএর বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহারা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইটা খাবার ঘর, এইটা কাপড় পরিবার ঘর, এইটা শোবার ঘর, ক্ষণিকা সব ক'টার পরিচয় দিয়া বেড়াইতে লাগিল। মেনকা খানিক এধার ওধার চাহিয়া বলিল, "তোমার মনোজা-দি কই ভাই ? তাঁকে ত একবারও দেখ্‌লাম না ?"

ক্ষণিকা বলিল, "এখন ক্লাশে পড়াচ্ছেন, ছুটী হলেই আস্‌বেন বোধ হয়।"

বলিতে বলিতেই টীফিনের ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। দলে দলে মেয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। খাওয়া, খেলা, চীৎকার কোলাহলে সরস্বতীর কুঞ্জ একেবারে মুখর হইয়া উঠিল।

প্রভা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এই ক্ষণি, আজ এলি নাকি? এত দেরি যে? তোর বাবা ভাল ত? বোন বুঝি তোর?"

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ, একেই দিতে এসেছি; আমার এখানকার অন্ন উঠ্‌ল, চাকরী কর্‌তে যাচ্ছি।"

প্রভা বলিল, "বেশ বাবা, খুব তোমরা মানিকজোড়, তুমি চলে গেলে ভাব্‌লাম এবার মনোজাদি কি করে থাক্‌বেন। দুদিন যেতে-না-যেতে শুন্‌লাম তিনিও যাচ্ছেন চলে। তখন ভাবনা হল তোমার জন্যে যে, তুমি যদি ফিরে এস ত বিরহে শুকিয়ে মর্‌বে, তা দেখ্‌ছি তুমিও সরে পড়্‌ছ!"

প্রভার শেষের কথাগুলো উপেক্ষা করিয়া ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মনোজাদি চলে যাচ্ছেন? কই আমাকে ত কিছু লেখেননি? কবে যাচ্ছেন, কোথায়?"

প্রভা ঘাড় বেঁকাইয়া বলিল, "ওমা কোথায় আমিই তোমার কাছে খবর নিতে যাচ্ছিলাম, না তুমিই উল্টে আমাকে জিগ্‌গেস কর্‌ছ? কেন যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন,

তা বিশেষ কিছু জানি না, তবে কবে যাচ্ছেন জানি। তোমার অভাবে কাল কাপড় পাট কর্‌বার জন্যে আমার ডাক পড়েছিল, তাই খবর জেনে এলাম। কেন যাচ্ছেন, তাও একটু একটু জানি, কিন্তু বল্‌ব না। শেষে ভুল হলে সবাই ত আমার গলা টিপে ধর্‌বে ?"

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "মনোজাদি কোথায় ?"

প্রভা বলিল, "উপরে, নিজের ঘরে, জিনিষপত্র গুছচ্ছেন বোধ হয়। স্কুলের পালা ত চুকে গিয়েছে। যাই, টিফিন খেয়ে আসি, তুই এখন আছিস্ ত ?" ক্ষণিকার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল।

ক্ষণিকা বলিল, "মিনু, একটু মাধবীর কাছে বস্‌বি ? আমি উপরে একবার মনোজাদির সঙ্গে দেখা করে আসি ?"

মেনকা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বা রে, আমি বুঝি তাঁকে দেখ্‌ব না ? আমায় নিয়ে চল।" বোনকে সঙ্গে লইয়াই অগত্যা ক্ষণিকা উপরে চলিল।

মনোজার ঘরের সামনে আসিয়া ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "ভিতরে আস্‌ব ?"

ভিতরে তখন মহা ব্যস্ততা, ক্রমাগত বাক্সর ডালা উঠিতেছে, নামিতেছে, ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া বই খাতা টানিয়া খাটে ও মেঝেতে ফেলা হইতেছে। প্রশ্ন শুনিয়া ঘরের

অধিষ্ঠাত্রী বলিলেন, "এসো, এসো, কে তুমি? আমার এখন মর্‌বারও সময় নেই।"

ক্ষণিকারা ঘরে ঢুকিতেই মনোজা বলিয়া উঠিল, "ওমা তুমি কোথা থেকে ধূমকেতুর মত উদিত হলে? আমি ত কালই চলেছি।"

মেনকা অবাক্ হইয়া দেখিল যে দিদি তাহার এমন ভালবাসার পাত্রীকে প্রণাম করিল না। সে নিজে অগ্রসর হইতেই মনোজা বলিল, "ও-সবে কাজ নেই বাছা, তুলে রাখ, যোগ্যপাত্রে দান কোরো।" শিক্ষয়িত্রীর চেহারা ও কথার ভঙ্গি দুইই মেনকার বিস্ময় বাড়াইয়া দিল। এ আবার কি রকম টীচার?

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "হটাৎ চলে যাচ্ছেন যে, কিছু ত জান্‌তাম না?

মনোজা ট্রাঙ্কের ভিতর বই গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "জান্‌বে কি করে? আমিই কি জান্‌তাম? হটাৎই সব ঠিক হয়ে গেল। ভেবে দেখ্‌লাম ক'টা দিনই বা বাঁচ্‌ব—যা ত শরীরের ছিরি! সব দিনগুলোই কি আর গুরু-মা-গিরি করে কাটাব? তাই একটু বৈচিত্র্যের সন্ধানে যাত্রা কর্‌ছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "কোন্ পথে যাচ্ছেন?"

মনোজা বলিল, “কে জানে? বেরিয়ে ত পড়ি, তার পরে আশা আছে ‘পথ আমারে পথ দেখাবে’।”

এমন সময় টিফিনের ঘণ্টা শেষ হওয়ার তান তাহাদের কানে আসিয়া বাজিল। মনোজা বলিয়া উঠিল, “ঐ রে, আমাকে আবার এখুনি নীচে দৌড়তে হবে লেনা-দেনা চুকোতে। যাক, ভাগ্যে তুই এলি, তাই দেখা হল, তা না হলে আবার কবে দেখা হত কে জানে? মস্ত বড় জায়গা পৃথিবীটা, মানুষকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। তা তোর দরকার যা হয় তার আমি ব্যবস্থা একরকম করে যাচ্ছি।”

ক্ষণিকা বলিল, “আমারও যে বোর্ডিংবাস ফুরিয়েছে। আমার জায়গায় আমার বোনকে রাখ্‌তে এসেছি, ওকে স্কুলে আর বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করে এলাম।”

মনোজা নীচে যাইবার জন্য তখন চুলের রাশ হাতে জড়াইয়া খোঁপায় নির্ম্মমভাবে কাঁটা গুঁজিতেছিল। একখানা শাল টানিয়া লইয়া বেশভূষার আর সকল অসম্পূর্ণতা ঢাকিতে ঢাকিতে সে বলিল, “বেশ, আমরা প্রায় একসঙ্গেই এসেছিলাম, একসঙ্গেই বিদায় হলাম। আচ্ছা, আমি পরে চিঠিতে তোকে সব কথা লিখ্‌ব, এখন কাজটা সেরে আসি।”—এই বলিয়া সে চটী ছাড়িয়া জুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল।

মনোজা বাহির হইতেই মেনকা বলিল, "তোমার মনোজাদিকে কিন্তু আমি এর চেয়েও সুন্দর ভেবেছিলাম।"

ক্ষণিকা গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল। বোনের কথায় হাসিয়া বলিল, "কেন, দেখ্‌তে ভাল নয়?"

মেনকা বলিল, "আহা, তা কেন? তবে তুমি যেরকম বর্ণনা কর্‌তে আমি ভেবেছিলাম নুর্‌জাহান কি পদ্মিনীর মত বুঝি।"

দুই বোনে আবার নীচে নামিয়া গেল। মাধবী তখন কি উপায়ে একটু ছুটী সংগ্রহ করিয়া দুইটি বোর্ডিংবাসিনীর সঙ্গে মেনকার সন্ধানে ফিরিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র সে ছুটিয়া আসিল। বলিল, "কোথায় ছিলি? এই তোর ক্লাশের মেয়ে একজন, আর এর seat ঠিক তোর পরে, তাই ভাব করাতে নিয়ে এলাম।"

মেনকাকে নূতন বন্ধুদের হাতে সমর্পণ করিয়া ক্ষণিকা অগ্রসর হইয়া গেল। এইবার বিদায় গ্রহণের পালা। তাহার নিজের যাত্রার আয়োজন এখনো সম্পূর্ণ বাকি, অথচ হাতে সময় মাত্র দু-তিন দিন। কলেজের মেয়েদের 'কমন-রুমে' একবার উঁকি মারিয়া দেখিল পাঁচ-ছজন মেয়ে বসিয়া আছে, একজন সেই মাসের একখানা Strand

Magazine খুব মন দিয়া উল্টাইতেছে, তুজন মেয়ে একটা নূতন সেলাইয়ের নমুনা লইয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, বাকিরা যথেচ্ছভাবে শুইয়া বসিয়া কাল কাটাইতেছে। ক্ষণিকা ঢুকিতেই একজন বলিল, "এসো এসো, খুব ডুমুরের ফুল হয়েছ।"

সেখানে বসিয়াও খানিকক্ষণ গল্প হইল। তারপর প্রভাকে একটু মেনকা সম্বন্ধে অনুরোধ করিবার জন্য ক্ষণিকা তাহার সন্ধানে চলিল। প্রভা বলিল, "তা দেখ্‌ব এখন, কিন্তু জান ত কাণ্ড, স্কুলের মেয়ের সঙ্গে বেশী ভাব কর্‌তে দেখ্‌লে আবার আমার উপর দেবতার কোপ না হয়।"

ক্ষণিকা বলিল, "ভাবে কাজ নেই ভাই, কেবল দেখো, পড়াশুনোটা যেন করে, admirerগিরি করে সব সময়টা না নষ্ট করে, আর, যে কয়েকটি ন্যাকামীর উৎস আছেন তাঁদের সঙ্গে যেন একটু কম মেশে।"

প্রভা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "খুব সোজা কাজ দিলি ভাই। ও বয়সে 'নদী যথা ধায় সিন্ধু-পানে' তেমনি করে মানুষের মন ন্যাকামীর দিকে ছোটে। আমি ত ছার ঐরাবতের মত ভেসে যাব বাধা দিতে গিয়ে।"

মেনকার কাছে ঘটা করিয়া বিদায় লওয়ার ইচ্ছা ক্ষণিকার ছিল না। সে যা মেয়ে, কাঁদিয়া কাটিয়া হাট বসানো

তাহার পক্ষে বিচিত্র নয়। অতএব সংক্ষেপে, "মিনু, আমি এখন যাচ্ছি, চিন্ময়দা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, কাল বিকেলে আবার আস্‌ব"—বলিয়া সে সরিয়া পড়িল। কাঁদিবার ইচ্ছা থাকিলেও মেনকা অবসর খুঁজিয়া পাইল না।

গাড়িতে উঠিয়াই চিন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "মিনু কি খুব কান্নাকাটি লাগালো নাকি?"

ক্ষণিকা বলিল, "কি জানি, আমি সেদিকে না তাকিয়েই চলে এসেছি। আচ্ছা একেবারে জিনিসপত্র কেনা সেরে বাড়ী ফির্‌লে হয় না? তোমাকে রোজ রোজ আর কত ঘোরাব?"

চিন্ময় বলিল, "আমার ভাবনা অত তোমায় ভাব্‌তে হবে না। তোমার জিনিষ কিন্‌তে না হলেই যেন আমি সমস্তক্ষণ ঘরের কোণে বসে ধ্যান কর্‌তাম আর-কি। এখন ইচ্ছে না করে—দোকানে যেতে হবে না, কাল দুপুরে আসা যাবে।"

ক্ষণিকা বলিল, "ইচ্ছে ফলাবার সময়ও নেই সুবিধাও নেই। চল, যা কর্‌বার একেবারে করে ফির্‌ব।"

দুজনের মনই তখন বেশ ভার হইয়া আসিতেছে, তৎসত্ত্বেও আরও ঘণ্টা তিন ধরিয়া তাহারা কাপড়ের দোকান, জুতার দোকান ও বইয়ের দোকানে ঘুরিয়া

বেড়াইল। তারপর অসংখ্য পুঁটুলি আর কাগজের মোড়ক লইয়া সন্ধ্যার মুখে বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

ক্ষণিকাকে দেখিয়াই মাধবী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা, ক্ষণুদি, তোমার বোনের যা কান্না, তুমি চলে আস্‌বার পর, আর থামেই না, শেষে বিনোদিনী-দি কত করে বোঝাতে তবে চুপ কর্‌ল।"

ক্ষণিকা সবে তখন জিনিষপত্রগুলি একটু গুছাইয়া রাখিবার উপক্রম করিতেছে। মাধবীর কথা শুনিয়া তাহার হাত আর যেন নড়িতে চাহিল না। সমস্তদিনব্যাপী পরিশ্রমের ক্লান্তির উপর একটা গভীর ব্যথা তাহার মনের উপর চাপিয়া বসিল। জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়ানো পড়িয়া রহিল, সে জামা কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই যে অজানা জগতের মধ্যে তাহার ডাক আসিয়াছে ইহাতে সাড়া ত সে দিল। কিন্তু আঁধার ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার জন্য কি লুকানো আছে? এই জীবনযাত্রার আরম্ভে কেবলি ত আশঙ্কা আর অশ্রুজল, ইহার পরিসমাপ্তিও কি এমনি ভাবেই হইবে? পৃথিবী কেন তাহাদের কাছে এমন নির্ম্মমমূর্ত্তিতে দেখা দিল? সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুই তাহাদের ছিল না, কিন্তু ভগ্নগৃহে একসঙ্গে মাথা গুঁজিয়া থাকা, তাহাও নিয়তির সহ্য হইল না? ব্যথা-কাতর হৃদয়, চোখের জল সব

উপেক্ষা করিয়া এ কাহার নিষ্ঠুর হাত তাহাদের পরস্পরের কাছ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে। এই ব্যথার ভিতর দিয়া তাহারা কি কোনও পূর্ণতর জীবনে জন্মলাভ করিবে, না বৃন্তচ্যুত ফুলের মত মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে?

কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ চোখে তীব্র আলোকপাত অনুভব করিয়া জাগিয়া দেখিল মাধবীর মা তাহার সামনে আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "এইবার খেয়ে নেবে চল, ঘুরে এসে ঘুমিয়ে পড়্লে, আমি তাই আর জাগাইনি, এখন রাত ন'টা হতে চল্লো যে।"

আহারাদি সারিয়া আবার যখন সে ঘুমাইতে চেষ্টা করিল তখন ঘুম আর কিছুতেই আসিতে চাহিল না। যাহাদের সে ছাড়িয়া যাইতেছে তাহাদের অতিপরিচিত মুখগুলির সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের মধ্যে তাহাকে ইহার পর গিয়া পড়িতে হইবে, তাহাদের সদ্যপরিচিত মুখগুলি কেবলি তাহার মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পরের দিনটা জিনিষপত্র গোছানো আর মেনকার সুখ-সুবিধার যেটুকু বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় তাহা করিতেই

কাটিয়া গেল। মেনকাকে দেখা দিয়া আর-একবার কাঁদাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, কিন্তু সে যে কথা দিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় আবার সে বোর্ডিংএ আসিয়া উপস্থিত হইল।

মেনকার মানসিক অবস্থা এখন অনেকটা ভাল দেখা গেল। সমবয়সী একদল মেয়ের মধ্যে পড়িয়া সে কাঁদিবার অবসর কমই পাইতেছিল, তাহার উপর দিদি যখন তাহাকে দুখানা নূতন শাড়ী দান করিয়া ফেলিল, তখন ত তাহার মুখে রীতিমত হাসিই ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণিকাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কালই বুঝি তুমি অনাদি-বাবুদের ওখানে চলে যাবে? জান, আজ দুপুরে তোমার মনেজাদির যাবার সময় মেয়েরা যা চ্যাভ্যাঁ করতে লাগ্ল সে আর বল্বার নয়। আমি বাড়ী থেকে আস্তেও ওর অর্দ্ধেক চেঁচাইনি।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "সবাই কি আর তোমার মত বীরাঙ্গনা? অনেকেই অমন চ্যাচায়। কালই ত যাবার কথা আমার, দেখি কি হয়। তোর এখন কেমন লাগ্ছে।"

মেনকা ঠোঁটটা উল্টাইয়া বলিল, "ভাল কিছু নয়, তবে যতটা ভয় পেয়েছিলাম তেমন কিছু নয়। ও কি এখুনি যাচ্ছ যে?"

ক্ষণিকা বলিল, "যাই, একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। আবার

কাল ওদের বাড়ী গিয়েও ত জিনিষ গোছানোর পালা সুরু হবে ?”

চিন্ময়ের কি একটা জরুরী কাজ পড়ায় সে আর পরদিন ক্ষণিকাকে বালিগঞ্জে পৌঁছাইয়া দিতে যাইতে পারিল না। তাহার সেজভাই হিরণ্ময় একজন চাকরের সাহায্যে ক্ষণিকাকে যথাস্থানে পৌঁছাইতে চলিল।

অনাদিনাথের বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়াইতেই হিরণ্ময় লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। বিদায় দেওয়া বা নেওয়া জিনিষটাতে প্রায়ই একটুখানি করুণ-রস আসিয়া পড়ে, এবং ঐ রসটার প্রতি বারো-তেরো বছরের ছেলেদের একটা প্রবল বিরাগ আছে। গাড়ীর ছাত হইতে বাক্স বিছানা নামান হইতেই “আমি তবে চল্‌লাম,” বলিয়া সে একরকম দৌড় মারিল। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিল কি না তাহা দেখিবারও তাহার অবসর হইল না।

চার-পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ের হাত ধরিয়া একজন ঝি সিঁড়ির মাঝে দাঁড়াইয়া ছিল, সে ক্ষণিকাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, “ওপরে আসুন, দিদিমণি।”

( ৯ )

উপরে উঠিয়া ক্ষণিকার এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল সে যেন একটা হাটের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরে বাহিরে

সিঁড়িতে, আনাচে কানাচে এত-প্রকারের জিনিষ নির্ব্বিচারে একসঙ্গে ঢালা সে আর ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। যাত্রার আয়োজনের প্রথম পর্ব্ব দেখিয়া বিরক্তি এবং আশঙ্কায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। এই বিকট এলোমেলোর মেলাকে শৃঙ্খলার পাশে বদ্ধ করিবার লঘুভারটি যে গৃহকর্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্কন্ধে তুলিয়া রাখিয়াছেন, সে-কথা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিকার মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহাকে আর যাহাই বলা যাক, কৃতজ্ঞতা বলা চলে না।

কিন্তু বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে যে বিরক্তির কারণ-গুলি আপনা হইতেই শূন্যে মিলাইয়া যাইবে এমন কোনই সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই ক্ষণিকাকে তাহাদের দূর করার ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে। এ বাড়ীর অবস্থা আগের দিন সে যে-রকম দেখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে খুব সাড়ম্বর অভ্যর্থনা পাইবার আশা সে করে নাই, তবে এও ভাবে নাই যে বাক্স বিছানা লইয়া সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং বাড়ীর অধিবাসীগুলি যে যার আপনার ঘরেই বসিয়া থাকিবে। সব-কিছু মিলিয়া তাহার নব-জীবনের প্রভাতটিকে এতখানি সুপ্রভাত করিয়া তুলিল দেখিয়া তাহার চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

ঝি যে তাহাকে উপর অবধি আনিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার আর খোঁজ মিলিল না। কিন্তু তাহার কোলের সেই ছোট মেয়েটি কোথা হইতে খুটু খুটু করিয়া আসিয়া হাজির হইল। মেয়েটি দেখিতে বেশ। মুখখানি গোল-গাল, রংটিও ফর্শা, ঠোঁট-দুটি প্রবালের মত টুকটুক করিতেছে। সে আসিয়া একবার ভাল করিয়া ক্ষণিকাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মাসিমা ?"

ক্ষণিকা তবু একটা মানুষ দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তুমি কি করে জান্‌লে ?"

শিশু মাথা দোলাইয়া বলিল—"বা রে, মামা-বাবু যে বল্‌লেন যে আজ মাসিমা আস্‌বে ?"

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মামা-বাবু কোথায় ?"

মেয়েটি বলিল, "মামা-বাবু মাক্কেটে আমার পুতুল কিন্‌তে চলে গেছে। জান, আমার-একটা দুটো তি—ন্‌টে পুতুল আছে, আর-একটা আস্‌বে।"

ক্ষণিকা মামাবাবুর খবর পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দিদিমা কোথায় খুকু ?"

খুকী প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুকু না, বেণু। খুকু বিচ্ছিরি, দুষ্ট, হতভাগা।"

ক্ষণিকা বুঝিল কোনো কারণে খুকু-নামক কোনো জীবের প্রতি বেণুর বিদ্বেষটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অগত্যা ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টায় সে আবার বলিল, "তোমার দিদিমা কোথায় বেণু?"

বেণু বলিল, "কাঁথার তলায় শুয়ে আছে দিদি, তার গায়ে ব্যথা, হাতে ব্যথা, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা।"

এতক্ষণ পরে ক্ষণিকা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার বিচিত্র অভ্যর্থনাটা যে একান্তই ইচ্ছাকৃত অবহেলা নহে ইহা বুঝিয়াই যেন তাহার বুকের উপর হইতে দশ মণ বোঝা নামিয়া গেল। ঠিক সেই সময় পূর্ব্বদৃষ্টা ঝি আসিয়া বলিল, "মা ত বাতের ব্যথায় নড়্‌তেই পার্‌ছেন না আজ দিদিমণি। চলুন আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। পঞ্চা, বাক্স আর বিছানাটা নিয়ে চল্‌।"

ঝি আগে আগে, বেণুকে কোলে করিয়া তাহার পশ্চাতে ক্ষণিকা এবং সর্ব্বশেষে বাক্স-বিছানা-ঘাড়ে পঞ্চা, তিনজনে সার দিয়া ক্ষণিকার ঘরের উদ্দেশে চলিল। ঘরখানি দেখিয়া ক্ষণিকার মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। কলিকাতা সহরে ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকিলে দেখা যায় ইঁট, পাথর আর কাঠ, জান্‌লা খুলিয়া বাহিরে চাহিলেও দেখা যায় সেই ইঁট কাঠ, পাথর, উপরন্তু ধূলা ও ধোঁয়া। এই ঘরখানির বিশেষত্ব

এই যে জান্‌লা খুলিলে কোনদিকেই ইঁটের পর ইঁট সাজানো মানুষ-কীটের বাসা দেখা যায় না। একদিকে বাড়ীর বাগান আর ঘাসে-ঢাকা জমি, আর-একদিকে সদর-রাস্তার ধারে গাছের সার। ইচ্ছা করিলেই মনে করিয়া লওয়া যায় যে কলিকাতা ছাড়িয়া সে পল্লীলক্ষ্মীর শ্যামল অঞ্চলের ছায়ায় আসিয়া জুটিয়াছে।

পঞ্চা জিনিষপত্র রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ঝি বিছানাটা খাটের উপর তুলিতে তুলিতে বলিল, "ঘর যা হয়েছিল দিদিমণি! দশ ঘড়া জল ঢেলে তবে ধূলো মরে। মা ত কিছু দেখেন না, দাদা-বাবু হুকুম দিয়েই খালাস—'কদম, পঞ্চাকে দিয়ে ঘরটা সাফ্ করিয়ে রাখিস্।' তেমনি ওঁর পঞ্চা কিনা, কারু কথা শোনে ও? চালচলন যেন লাটের ব্যাটা, তা আমাকেই ধুতে হলো।"

ক্ষণিকা তাহার দুঃখে কোনই সহানুভূতি দেখাইল না। ইহাতে কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়া ঝি বলিল, "চল বেণুদিদি, তোমার খাবার সময় হলো।"

বেণু বলিল, "তোমার বিচ্ছিরি হাত, মাসির হাতে ভাত খাব।"

"তবে তাই খাও গে যাও," বলিয়া ঝি ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ক্ষণিকাও একটু হাঁফ ছাড়িয়া নিজের স্বল্প জিনিষপত্র গুছাইতে বসিল। বেণু ক্রমাগত কথা বলিয়া চলিল, কিন্তু তাহার গল্প একান্তই একতর্ফা, উত্তরের প্রত্যাশা সে বিশেষ করে না। কাজেই তাহাতে ক্ষণিকার কাজের ব্যাঘাত কিছু হইল না।

তাহার কাজ যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় "ঐ যে মামা, পুতুল আন্‌ছে," বলিয়া বেণু লাফাইয়া দর্‌জার দিকে দৌড় দিল। পরমুহূর্ত্তেই চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ক্ষণিকা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া তুলিল। ঠিক তথনই অন্য দিক হইতে অনাদিনাথ আসিয়া তাহার দর্‌জার সামনে উপস্থিত হইলেন। বেণুর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, এত কান্নাকাটি বেধে গেল কেন?"

বেণু তখন প্রাণপণে চীৎকার করিতে ব্যস্ত, কাহারও কথার উত্তর দিবার অবসর তাহার একেবারে নাই। ক্ষণিকা তাহাকে শান্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "আপনার কাছে দৌড়ে যাচ্ছিল, চৌকাঠে লেগে পড়ে গিয়েছে।"

অনাদিনাথ ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এসেই আপনি আচ্ছা বিপদে পড়্‌লেন যা-হোক।

মায়ের অসুখ বেড়েছে, বেণুও আজ পিসির বাড়ী থেকে এসে হাজির, তার উপর জিনিষপত্র গুছতে বলেছিলাম বলে ঝি-চাকররা বাড়ীর সব জিনিষ এক জায়গায় ঢেলে গোড়ার থেকে গোছাবার আয়োজন করে রেখেছে। অনেকখানি প্রত্যাশা করেই এসেছিলেন, কিন্তু এতখানি করেননি নিশ্চয় ? বেণু দেখ্‌ছি আপনাকে জ্বালাতন করে তুল্‌ল, কদম গেল কোথায় ?”

বেণু আছাড় খাওয়ার বেদনা ভুলিয়া স্বর আরও সপ্তমে তুলিয়া বলিল—“বিচ্ছিরি কদম, ছাই কদম, তার কাছে যাব না, মাসির কাছে থাক্‌ব।”

ক্ষণিকা যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অনাদিনাথের অত কথার উত্তরে একটা কিছু বলা উচিত, কিন্তু বলিবে কি ? বিপদে পড়ে নাই—কেবল এই কথাটা ত সোজা বলা যায় না ? তার উপর বেণুর মুখে কদমের বর্ণনা শুনিয়া হাসি সাম্‌লানোও দায়।

অনাদিনাথ মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তুমি এসো আমার কাছে বেণু, চল তোমার পুতুল দিচ্ছি। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন, এসেই কাজে লেগে গেছেন দেখ্‌ছি। কাজের কিছু অভাব নেই, তবু কাল থেকেই সুরু কর্‌বেন না-হয়। আপনার খুবই

অসুবিধা হবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু প্রতিকার কর্‌বার ক্ষমতা আমার অল্পই। তবু কিছু যদি পারি বল্‌বেন আমায়।"

বেণু ইতিমধ্যে এমন অতিরিক্ত উৎসাহে ক্ষণিকার কোল হইতে অনাদিনাথের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল যে ক্ষণিকাকেও প্রায় তাঁহার ঘাড়ের উপর আনিয়া ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি আরক্তমুখে সরিয়া দাঁড়াইতেই অনাদিনাথ বলিলেন, "এইটিই আপনার ছাত্রী; ইনি স্বভাবের পরিচয় এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেরকম দিলেন, তাতে আপনার কার্য্যভারের এ অংশটুকুও যে বিশেষ লঘু হবে সে আশা কর্‌বেন না।"

ক্ষণিকা বলিল, "ভার লঘু না হওয়াতে আমার কিছু দুঃখ নেই, নিজে যদি বইবার শক্তি পাই তা হলেই যথেষ্ট হবে।"

অনাদিনাথ একটু হাসিয়া বেণুকে লইয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিয়া দর্‌জাটা ভেজাইয়া দিয়া খাটের উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল। ইহার পর দিনগুলা না-জানি তাহার কেমন ভাবে কাটিবে? কিন্তু আসিয়া অবধি গৃহিণীর সহিত ত দেখাই হইল না। একবার যাওয়া উচিত বোধহয় তাঁহার কাছে। ক্ষণিকা আবার উঠিয়া দর্‌জা খুলিয়া গৃহিণীর শয়নকক্ষের উদ্দেশে বাহির হইল।

মাঝে একটা মস্ত হল্‌ পার হইয়া যাইতে হয়। এই

স্থানটি পার হইয়া নিজের ঘরে যাইবার সময় ক্ষণিকাকে রীতিমত বিছানা, বাক্স, কাপড় এবং বইয়ের স্তূপ ডিঙাইয়া যাইতে হইয়াছিল। এবার কিন্তু দেখিল যে জিনিষগুলি সবই যদিও এখন ঘরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, তবু তাহাদের শ্রেণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একটু গুছাইয়া রাখা হইয়াছে এবং ঘরের মাঝখানটা অন্ততঃ খালি হইয়াছে, হাঁটিতে হইলে সোজাই যাওয়া যায়। তা ছাড়া সন্ধ্যার ছায়ায় আচ্ছন্ন বাড়ীখানাকে যেমন নিরানন্দের আবাসভুমি মনে হইয়াছিল, এখন আর তেমন যেন লাগিতেছে না। ঘরে ঘরে আলো জ্বালা, ঝি-চাকরের কলরব, বেণুর কাকলি, মানুষের হাঁটা-চলার শব্দ, সব মিলিয়া বাড়ীর চেহারাই যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে।

গৃহিণীর ঘরের সাম্‌নে আসিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে ক্ষণিকা দেখিতে পাইল তিনি আগাগোড়া লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন, ঝি কদম পাশে বসিয়া পা টিপিয়া দিতেছে, বেণু ঘরময় একটা খেল্‌নার মোটরগাড়ী হাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, এবং গাড়ীর দ্বিগুণ আকারের একটি ডলি পুতুলকে তাহার সওয়ার করিবার বৃথা চেষ্টায় অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মামা খাটের পাশে দাঁড়াইয়া শয্যাশায়িনী মাতার সঙ্গে কি কথা বলিতেছেন।

ক্ষণিকার আগমনটা গৃহিণীর চোখেই আগে ধরা পড়িল। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "এসো বাছা এসো, আজ উঠ্‌তেই পার্‌ছি না একেবারে, তা না হলে তুমি এলে এতক্ষণ কতবার দেখা হত। খাটের ওপর বস্‌তে পার্‌বে, না একটা চেয়ার এনে দিতে বল্‌ব ওঘর থেকে ;"

ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, আমি খাটেই বস্‌ছি, চেয়ার আন্‌তে হবে না। আপনার গায়ের ব্যথা আজ কি খুব বেড়েছে ?"

গৃহিণী কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আর মা, এখন গেলেই বাঁচি, কতকাল যে আর ছেলেকে জ্বালাব আর নিজে জ্বল্‌ব তা জানি না। ওরে, একটু জোরে দেনা, পা-খানা যে খসে গেল। আর বেণুটাকে খাওয়ালি না,এখুনি ঘুমিয়ে পড়্‌বে যে।"

ক্ষণিকা খাটে উঠিয়া বসিয়া ঝিকে বলিল, "তুমি যাও ওকে খাওয়াও-গে, আমি পা টিপে দিচ্ছি।"

কদম উঠিতেই গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি! তুমি ভদ্দর্‌ লোকের মেয়ে তোমাকে দিয়ে আমি পা টিপাবো কি ? না বাছা থাক্‌।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "পায়ে সেঁক দেবার জন্যে যে ব্যাগ এনে দিয়েছিলাম সেগুলো কি হল ? তাতে ত বেশ ভাল ছিলে ?"

"কি জানি বাপু কি হল। বেণু ত ভিস্তিওয়ালা খেল্‌বে বলে নিয়েছিল পর্‌শু, কোথায় ফেল্‌ল কে জানে।"

অনাদি বিরক্তিপূর্ণ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, ক্ষণিকা গৃহিণীর আপত্তি সত্ত্বেও বসিয়া বসিয়া তাঁহার পা টিপিতে লাগিল। খানিক পরে পঞ্চা দুইটা 'হটওয়াটার ব্যাগ' গরম জলে পূর্ণ করিয়া আনিয়া দরজার কাছে রাখিয়া দিল। তাহার সাহায্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহিণীর ঘুম আসিয়া পড়িল। ক্ষণিকা তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল।

খানিক পরে কদমের সঙ্গে একজন বামুন-ঠাকুর আসিয়া ঘরেই তাহাকে ভাত দিয়া গেল। ক্লান্তিতে তখন তাহার আর কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। আজকার মত সে অতিথিরূপে কেবল নিজের সুখসুবিধাটুকু দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইল। কাল হইতে সংসারের সকল ভার ত তাহার উপর আসিয়াই পড়িবে, এই ক'টা ঘণ্টা সে তবু অনুভব করিয়া লউক যে তাহাকেও লোকে আদর-যত্ন করে, পৃথিবীতে কেবল পরের যত্ন করিতেই তাহার জন্ম হয় নাই। ভাত খাওয়া হইতেই কদম বলিল, "পান না খান ত মশলা-টশলা এনে দেব? ঘরে একলা থাকৃতে যদি ভয় করে ত আমি শুতে পারি। বেণু-দিদি দাদাবাবুর কাছে শোবেন এখন।"

ক্ষণিকা বুঝিল এ কদমের স্বতঃপ্রবৃত্ত পরোপকার নয়, কথাকয়টি অন্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এ বাড়ীতে খাটিতে তাহাকে হইবে বটে, কিন্তু পরিশ্রমকে সহনীয় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা যে জিনিষের আছে তাহার অভাব ঘটিবে না। সে বলিল, "আমার ঘরে থাক্‌বার কিচ্ছু দর্‌কার নেই, তোমাদের যেমন শোবার ব্যবস্থা আছে তাই থাক।"

কদম চলিয়া যাইতেই সে শুইয়া পড়িল। পরিশ্রান্ত থাকাতে ঘুম আসিতে তাহার বিলম্ব হইল না। মাঝরাত্রে হঠাৎ চমকিয়া তাহার একবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভীত বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার সে আপনার নূতন পরিবেষ্টনের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণেই তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া ভয়ের ভাবটাও দূর হইয়া গেল। স্বপ্নের মধ্যে কি দেখিয়া সে ভয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মনে পড়াতে হাসিয়া সে আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোর বেলা উঠিয়া জান্‌লা খুলিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু নীরবতা এখনও অটুট। শীতের হাওয়া তাহার মুখে বরফের কণার মত আসিয়া লাগিতে লাগিল। ফিরিয়া আর-এক পালা ঘুমাইতেও তাহার ইচ্ছা করিল না, অতএব শাল-মুড়ি দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত বাড়ী তখনও নিদ্রাবতী রাজকন্যার প্রাসাদের মত নিস্তব্ধ, নীরব। দোতলায় ঘর অনেকগুলি, কিন্তু থাকিবার লোক নাই। গৃহিণীর ঘরেই ভিন্ন খাটে বেণুর শুইবার স্থান, কদমও সেই ঘরেই থাকে। অন্য ঘরগুলিতে ধূলা আস্‌বাব এবং মাকড়্‌সা আর্‌শোলা ভিন্ন বড় কিছু থাকে না। ক্ষণিকা আসাতে তবু আর-একটা ঘরে মানুষের বাস হইয়াছে। অনাদিনাথের বোধহয় দোতলার সহিত বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই, কারণ কোনো ঘর দেখিয়াই ক্ষণিকার বোধ হইল না যে সেটা গৃহস্বামীর ব্যবহারে লাগে।

নীচের দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ ক্ষণিকা দেখিল, বাগানের মধ্যে ভোরের অস্পষ্ট আলোকে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে এ বাড়ীতে এখন সে-ই একলা জাগিয়া নাই; বড় বড় শূন্য ঘরগুলার মধ্যে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার কেমন যেন গা ছম্‌ ছম্‌ করিতেছিল, সে ভাবটা এক নিমেষেই কাটিয়া গেল। আপনার ঘর হইতে বাহির হইয়াই তাহার একবার বাগানে নামিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। ভাগ্যে নামে নাই, অমন সময় হঠাৎ অনাদিনাথের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে মনে করিতেন কি! ক্ষণিকা আবার নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

দিনের আলো স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই বাড়ীতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। কদম আসিয়া খোঁজ করিয়া গেল ক্ষণিকা চা খাইবে কি না, এবং তাহার খাবার তাহার ঘরে আনা হইবে, না সে সকলের সঙ্গেই খাইবে, ইত্যাদি। ক্ষণিকা একটু বিপদে পড়িল। চা খাইতে তাহার আপত্তি নাই, তবে এ বাড়ীতে আর কেউ যদি চা না খায়, তাহা হইলে কেবল তাহার জন্য এত হ্যাঙ্গাম করার কি দর্‌কার? অনাদিনাথের সাম্‌নে বসিয়া খাইতে তাহার লজ্জা করিবে খুব সম্ভব, কিন্তু সে ত এবাড়ীতে ঠাকুর-সেবা লইতে আসে নাই যে কুড়ি বার ঝি চাকর তাহার জন্য খাবার লইয়া কেবল উঠাউঠি করিবে? একটু থামিয়া সে বলিল, "চল আমি নীচেই যাচ্ছি, চায়ের জল কি চড়ানো হয়েছে?"

কদম বলিল, "হ্যাঁ, দাদাবাবু যে ভোরেই চা খান, আজ তবু একটু দেরিতে চড়াতে বলেছিলেন।"

অনাদিনাথ যে ক্ষণিকার সুবিধার জন্য এতখানি চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে সে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। তাহারই কোথায় সকলের সুবিধার ব্যবস্থা করিবার কথা, না তাহার পরিবর্ত্তে সে মান্যগণ্য অতিথির মত বসিয়া বসিয়া আদর উপভোগ করিতেছে, এবং কর্ম্মভারাক্রান্ত অনাদিনাথের উপর তাহাকে যত্ন করিবার ভারটাও

তুলিয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। এ মন্দ চাকুরি নয়। যদিও যত্ন পাইতে লাগে ভাল, কিন্তু অধিকার যেখানে নাই, সেখানে অধিক আদর যে সঙ্কোচেরই কারণ হইয়া ওঠে।

নীচে খাইবার ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল, এক ঘরেই দেশী বিলাতি দুইরকম বন্দোবস্ত। এক দিকে টেব্‌ল চেয়ার, সাইড্‌বোর্ড্‌ সাজানো ; অন্যদিকে বড় বড় গালিচার আসন, কাঠের চৌকীর উপর পিতল কাঁসার বাসন-কোশন সাজানো। পঞ্চা চা করিতে ব্যস্ত, এবং কদম বেণুর জলযোগের আয়োজনে নিযুক্ত।

পঞ্চার চা করার জ্ঞানটা খুবই মোটামুটি রকমের। গরম জলটাকে কোনোরকমে রঙ্গীন করিয়া তুলিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হইত। ঐটুকু ব্যাপারের জন্য জলটাকে দশবার কেট্‌লি হইতে টী-পটে, সেখান হইতে পেয়ালায় ঢালার উৎপাত তাহার ভাল লাগিত না। সে জল চড়াইয়া, তাহা গরম হইতেই কেট্‌লির মধ্যে চা, দুধ, চিনি একসঙ্গে ফেলিয়া তাহা পেয়ালায় ছাঁকিয়া দিয়া কাজ শেষ করিত। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিয়া তাহার অভিনব পদ্ধতি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। অবশেষে নবাগতের সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিল, "ও কি কর্‌ছ? অমন করে কি চা করে?"

তাহার অনধিকারচর্চ্চায় বিরক্ত হইয়া পঞ্চা বলিল, "চট্ করে হয়ে যায়।"

ক্ষণিকা বলিল, "চট্ করে যা-তা করায় লাভ কি? তুমি আবার জল চড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে কর্‌তে হয়।"

বিরক্তমুখে সমস্ত কেট্‌লিসুদ্ধ নর্দ্দমায় ঢালিয়া দিয়া পঞ্চা আবার জল চড়াইয়া দিল। অনাদিনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আপনার কি দেরি হয়ে গেল?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "দেরি ত আপনারই হল। আমার অত সময়ের কড়াকড়ি নেই।"

অনাদিনাথের বোধহয় কথা বলার খাতিরেই কথা বলিয়া যাওয়ার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছিল। তিনি আর কিছু না বলিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন।

বেণু খাইতে আসিয়া দেখিল আজ মামা-বাবুর ভারি খাওয়ার ঘটা, পেয়ালা পিরিচ কেমন চকচকে, কেমন সাজানো। ফুলকাটা বড় ছোট কতরকম কেট্‌লি বাহির করা হইয়াছে। মাসিমা কেমন সোনালি চা করে, পঞ্চার চায়ের মত কালো নয়। সে নিজের দুধের বাটি হাতে করিয়া একটা চেয়ারে কোনো-প্রকারে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আমিও চা খাব।"

চা খাওয়ার পালা সাঙ্গ হইতে না হইতেই ভাঁড়ার দেওয়া, রান্নার জোগাড় দেওয়ার ধুম পড়িয়া গেল। দশটা বাজিবার আগে ক্ষণিকা আর ছাড়া পাইল না। এমন কোনো স্থান সে সংসারে দেখিতে পাইল না যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন নাই, সব যেন লণ্ডভণ্ড। তবু কাজের ভীড়ের মাঝে মাঝে সে এক-একবার অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল তাহার মনটা এত হাল্কা কি করিয়া এখনও রহিয়াছে।

( ১০ )

ক্ষণিকা তখন গোটা পাঁচ-ছয় অতিকায় বাক্স ও বিছানা চটে মোড়াইবার জন্য চাকর-বাকর ডাকিয়া ছুঁচ সূতা সন্ধান করিয়া অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় বেণু আসিয়া বলিল, "মাসি, মোনা আর সোনা দুষ্টুমি কচ্ছে।"

ক্ষণিকা মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, "কি করেছে?"

"মোনা শিল্কের ফক্ পরবে, গরম পরবে না। সোনা দুড্ খাবে না, মাছ খাবে।"

পঞ্চাকে চট শেলাই করিবার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি দেখাইতে ক্ষণিকা তখন ব্যস্ত, সে বলিল, "যাও লক্ষ্মী মেয়ে, তাদের বুঝিয়ে আদর করে ঠাণ্ডা করো, আমি একটু পরে যাব।"

বেণু অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে মোনার বাঁ পাখানা ধরিয়া তাহাকে

শূন্যে ঝুলাইয়া এবং সোনাকে কোলে চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কিন্তু চট শেলাই শিক্ষাটা নিরুপদ্রবে সমাপ্ত হওয়া বোধ-হয় পঞ্চার কপালে ছিল না। তৃতীয় ট্রাঙ্ক্‌টা যখন মোড়া হইতেছে, তখন কদম আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা বল্‌লেন তাঁর গরম শাল ভুলে বাক্সের ভিতর চলে গিয়েছে, সেখানা বার কর্‌তে হবে, তা না হলে গাড়ীতে তাঁর শীত কর্‌বে।"

ক্ষণিকা বিরক্তমুখে অর্দ্ধসমাপ্ত চটের বন্ধনী টান মারিয়া খুলিয়া দিল। ভিতর হইতে শাল বাহির করিতে গিয়া দেখিল গৃহিণীর ভুলে শাল যে কেবল বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, একেবারে তলদেশ আশ্রয় করিয়াছে। থানধুতি, গরম জামা, দড়ির জুতো, মহাভারত, অমিয় নিমাইচরিত, পূজার বাসন, সব একে একে বাহির করিয়া সে শালখানা উদ্ধার করিল। কদমের হাতে সেটিকে সমর্পণ করিয়া বলিল, "যাও দিয়ে এস, আর কিছু চাই না কি জিগ্‌গেষ করো।"

অনাদিনাথের খাস্‌ চাকর মুকুন্দ একগাদা বই হাতে করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে উঠিয়া আসিল। বইয়ের গাদা সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল—"এগুলো বাবুর বইয়ের সঙ্গে যাবে।"

ক্ষণিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—"তা এতক্ষণ ছিলে কোথায় ? বইয়ের বাক্সে যে এখুনি পেরেক মারা হয়ে যাচ্ছিল ?"

মুকুন্দ বলিল, "এই ত সবে দশটার সময় বাবু এগুলো দিলেন। তারপর খেয়েদেয়েই ত আসছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "খেতে তোমার দশটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি লাগ্‌ল ? আর একবার উপরে উঠে বইগুলো দিয়ে গেলে তোমার আর আজ খাওয়া হত না, না ?"

মুকুন্দ হাঁড়িমুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণিকা তাহাকে বকিতে-বকিতেই প্যাকিং বাক্স খুলিয়া তাহার উপরের বাজে কাগজপত্র টানিয়া ফেলিয়া নবাগত বইগুলিকে স্থান দান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মুকুন্দ নড়িলও না, অথচ তাহাকে কোনো সাহায্য করিবারও লক্ষণ দেখাইল না।

বেণুর আবার আবির্ভাব হইল। "মাসি মোনা ফক্ পর্‌ছে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা নাই পরুক্।"

মোনা না হয় ফ্রক্ নাই পরিল, তাই বলিয়া ক্ষণিকা সমস্ত দিন কতগুলো বিশ্রী বাক্স লইয়া বসিয়া থাকিবে, বেণুর কাছে আসিবে না, তাহাকে কোলে লইবে না, গল্প বলিবে না, এ কি-প্রকার ব্যবস্থা ? বেণু মুখ ভার করিয়া

বাক্স-বিছানার স্তূপের ভিতর ঘুরিতে লাগিল, দুচারবার ঠোকর খাইয়া ঠোঁট ফুলাইতেও ছাড়িল না।

"মাসি, আমরা কি করে গিরিডি যাব?"

ক্ষণিকা বলিল, "ট্রেনে চড়ে।"

"বাক্সগুলোও ট্রেনে উঠ্‌বে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা ওরা ত হাঁট্‌তে জানে না, কি করে ট্রেনে উঠ্‌বে?"

ক্ষণিকা বলিল, "যাও বেণু, খেয়ে এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"না, তুমি বলনা?"

"কি বল্‌ব?"

"বাক্স কি করে যাবে বলো, তুমি কি করে যাবে বলো, আমি কি করে যাব বলো।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি এই মস্ত কাঠের বাক্সে ঢুকে যাব, আর সবাই তালা বন্ধ করে আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব না, তুমি কথা শোন না।"

"না মাসি, তুমি ঢুকো না বিচ্ছিরি বাক্সে, তুমি নিশ্বেস বন্ধ হয়ে মরে যাবে।" বলিয়া বেণু ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে বেণু, কাঁদ্‌ছ কেন?" বলিয়া অনাদিনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেণু তাহার গৌরবর্ণ হাত দুখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চোখের জল মুখময় সঞ্চারিত করিয়া বলিল, "মাসি মরে যাবে?"

অনাদিনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার ক্ষণিকার দিকে তাকাইয়া বেণুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "না, না, কেউ মর্‌বে না, তুমি যাও ত কদমের কাছে, একটু ঘুমিয়ে নাও, তা না হলে গাড়ী চড়্‌লেই ঘুম পাবে আর কিচ্ছু দেখ্‌তে পাবে না।"

ক্ষণিকা বেণুর কান্নার কইফিয়ৎ শুনিয়া অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, "ও এখনো খায়নি যে, ঘুমবে কি?"

বেণু মাথা দোলাইয়া বলিল, "মাসির সঙ্গে খাব, কদমের কাছে যাব না। মাসির ভাত ভাল।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনিও কি না খেয়ে এখন অবধি বসে আছেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "এইগুলো শেষ করেই যাব ভাব্‌ছিলাম।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "না এখুনি যান, ওসব কখন

শেষ হবে তার ঠিকানা নেই। আর ঝি-চাকরগুলো সব পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে নাকি? সব কি আপনি নিজেই করবেন? এরা সব দিন-দিন হচ্ছে কি? এমনি করে আপনি যে মারা পড়বেন?”

“না মাসি মরবে না, আমি তোমার কথা শুনব,” বলিয়া বেণু আর-একপালা কান্না সুরু করিবার উপক্রম করিল।

অনাদিনাথের সাম্‌নে বারবার তাহার মৃত্যুসম্ভাবনায় বেণুর শোকটা ক্ষণিকার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। “চল তোমায় আগে খাইয়ে আনি,” বলিয়া সে বেণুকে টানিয়া লইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

বেণুকে খাওয়াইয়া এবং নিজের খাওয়াটাও তাড়াহুড়া করিয়া কোনো প্রকারে সারিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পঞ্চা ও মুকুন্দ এক-মনে বিছানা মুড়িতেছে, অদূরে অনাদি-নাথ একটা চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাই-তেছেন।

ক্ষণিকার কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। তাহাকে যে-কাজ করিবার জন্য আনা, সে-কাজের সম্পূর্ণ ভার নিজে বহন করিতে না পারার কেমন একটা অগৌরব তাহাকে আঘাত করিল। সে আসিয়াছে ইহাদের অসুবিধা দূর করিতে, কিন্তু অসুবিধা যদি তবু সকলের পিছনে

লাগিয়া থাকে তাহা হইলে মুখে না বলিলেও মনে মনে তাহাকে দোষী করিবে যে সকলেই। হয়ত অনাদিনাথের এটা বিশ্রামের সময়, অথবা কোনো বিশেষ কাজের সময়। ক্ষণিকা যদি যথাসময়ে কাজ চুকাইয়া ফেলিতে পারিত, তাহা হইলে অনাদিনাথকে এ সময় বসিয়া চাকর খাটাইতে হইত না। অথচ কাজ ফেলিয়া রাখিবার সময়ই বা কই? তাহাদের ত আজ বিকালের গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে, অথচ কাজ কত পড়িয়া? চিরকাল কি তাহার এই একই ভাবে কাটিবে, পৃথিবী তাহার কাছে ব্যগ্র হইয়া দাবী জানাইতে থাকিবে আর সে দাবী-পূরণের অক্ষমতায় কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিবে?

ক্ষণিকা এত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়াছিল যে অনাদিনাথ তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। পঞ্চা যখন বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি এটা ত ঠিক হয়েছে?" তখন তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এরি মধ্যে হয়ে গেল আপনাদের খাওয়া? দেখুন দেখি এরা কিছু অকর্ম্ম করে রেখেছে কি না, বসে ছিলাম যদিও তদারক কর্‌বার জন্যে, কিন্তু আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের তদারক করাও শক্ত।"

ক্ষণিকা বাক্স-বিছানার গাদার মধ্যে আসিয়া তাহার

পূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিল। অনাদিনাথের কথার উত্তরে বলিল—"না ঠিকই করেছে।"

অনাদিনাথ কাগজপত্র গুছাইয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জোগাড় করিয়া বলিলেন—"তবে আপনি আর ওখানে বসে থাকবেন না, একটু বিশ্রাম করে নিন, ওরা ততক্ষণ বাকি কাজ সেরে ফেলুক! নিজের কাজ ত আপনি সবই করেন, পরের গুলো করে দিলে যদিও পরদের সুবিধা খুবই হয়, কিন্তু সে সুবিধা ভোগ করার যে স্বার্থ-পরতা তার থেকে তাদের রক্ষা করাই উচিত।"

অনাদিনাথ চলিয়া যাইবার পর ক্ষণিকা যাহা করিতে বসিল তাহাকে আর যাহাই বলা যাক বিশ্রাম করা বলা চলে না। সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা সে এক ঘণ্টায় শেষ করিল, প্রত্যেকটির জন্য নিজের হাতে লেবেল্ লিখিয়া আঠা দিয়া তাহা যথাস্থানে আটকাইয়া, ঘরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষ গুছাইয়া রাখিয়া, চাকরদের বলিয়া সর্ব্বত্র ঝাঁট দেওয়াইয়া সে কেবলি ঘুরিতে লাগিল। যাত্রাকালীন বিরক্তি, যেটা সে চিরকাল এমন প্রবলভাবে অনুভব করে, সেটা এবার গেল কোথায়? বাড়ী হইতে কলিকাতা, কতটুকু বা পথ? কিন্তু সেইটুকুর জন্য তাহাকে যেটুকু অসুবিধা সহ্য করিতে হইত, তাহারই ফলে সে কলিকাতায়

অত্যন্ত শ্রান্ত দেহ ও ক্লিষ্ট বিরক্ত মন লইয়া আসিয়া পৌছিত। এবারে যাইতেও হইতেছে বহুদূরে, কাজের পরিমাণ ও অত্যধিক। তাছাড়া স্বজন স্বদেশ ছাড়া হওয়ার বেদনা ত রহিয়াছেই? কিন্তু দেহে ত তাহার ক্লান্তির লেশ নাই, মনেই বা বিরক্তি কই? তাহার মন যেন আরও কাজের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছে, এত অল্প করিয়া তাহার যেন তৃপ্তি নাই, কে তাহাকে এমন উৎসাহের উৎসে স্নান করাইয়া আনিল?

রোদ পড়িয়া আসিতে না আসিতে আর-একপালা হুড়াহুড়ি সুরু হইল। বেণুকে কাপড় পরানো, চাকর-বাকর যাহারা সঙ্গে যাইবে তাহাদের প্রস্তুত হইতে তাড়া দেওয়া, গৃহিণীর অশেষ রকম আশঙ্কার শান্তি করা, নিজেও প্রস্তুত হওয়া ইত্যাদি সহস্র কাজ একসঙ্গে যেন ক্ষণিকাকে পাইয়া বসিল। বেণুর আবার অনেক হাঙ্গাম, তাহার মোনা সোনা, তাহাদের বাক্স বিছানা, খাট, হাঁড়িকুঁড়ি, সব সে সারক্ষণ পুঁটুলি করিয়া লইয়া বেড়াইতেছে এবং তাহাদের বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। গৃহিণী নিজে কিছু করিতে পারুন বা নাই পারুন, অন্যের কাজের ভুল ধরিতে প্রচুর পরিমাণে পারেন। যাইবার সময় যত অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁহার

বকুনিও তত অবিশ্রাম হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কদম পঞ্চা মুকুন্দ-ঠাকুর সকলে তাঁহার সহায়তা করিয়া এমন একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিল যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাড়ীর বাহিরে লোক জমা হইয়া যাইতে পারে।

অবশেষে জিনিষপত্র কোনো প্রকারে গাড়ীর মাথায় তোলা হইল। গৃহিণীও বকিতে বকিতে গাড়ীতে আসিয়া পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লির মধ্যে জায়গা করিয়া বসিলেন। মোটরে উঠিলে নাকি তাঁর গা মাথা ঘুরিয়া ওঠে, সেইজন্য তিনি সে ধার মাড়ান না। বেণু, ক্ষণিকা ও অনাদিনাথ মোটরে চড়িয়া বাহির হইলেন। বিরলপথিক পথ-কয়েকটি দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া, গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই জন-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনের ভীড় আর গোলমালের ভিতর আসিয়া পৌঁছিতেও তাহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। নির্দ্দিষ্ট প্লাটফর্ম্মে গিয়া অনাদিনাথ বলিলেন—"বেণুকে নিয়ে আপনি বরং ওয়েটিংরুমে বসুন, ওরা তা না হলে এসে খুঁজেই পাবে না, যে, কোথায় ঢুকতে হবে!

ক্ষণিকা বলিল—"এইখানেই বসি, আবার অতখানি হেঁটে গিয়ে কি হবে?"

"আচ্ছা তাই বসুন"—বলিয়া অনাদিনাথ আবার বাহির হইয়া গেলেন।

বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া বসিয়া ক্ষণিকা লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল। লোকেরা অবশ্য তদপেক্ষা যথেষ্ট অধিক মনোযোগ সহকারে তাহাকে দেখিতে লাগিল। এক-একটা লোকের অভদ্র কলুষিত দৃষ্টি যেন সত্যকারের আঘাতের মত ক্ষণিকার গায়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সে ভাবিল, এই দেশের লোকই আবার ভণ্ডামী করিয়া নারীকে দেবী আখ্যা দেয়। চিত্তের পাশবিকতা ইহাদের যে পরিমাণে প্রবল, মুখের কথায় তাহা চাপা দিবার চেষ্টাও ঠিক সেই পরিমাণেই প্রবল।

ইতিমধ্যে বাড়ীর আর-সব লোকজন এবং তাহাদের ট্রেন, দুইই আসিয়া উপস্থিত হইল। রিজার্ভ্ গাড়ী বাছিয়া বাহির করা, জিনিষপত্র গুনিয়া গাঁথিয়া তোলা, কুলিদের আগ্রহ শান্তি করা প্রভৃতি কাজ চুকিয়া যাইবার পর ক্ষণিকা জান্‌লা দিয়া মুখ বাহির করিয়া আবার প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিল। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, চিন্ময় আর হিরণ্ময়। দুই ভাই তখন প্রত্যেক গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

ক্ষণিকা আজ সারাদিন চিন্ময়ের আগমন প্রত্যাশা করিয়া ছিল। কাজকর্ম্মের ভীড়ে, চাকর-বাকরের সঙ্গে বকাবকি করিতে করিতে এবং গৃহিণীর বকুনি খাইতে খাইতে

তাহার কেবলি থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল চিন্ময়দা কেন একবারও আসিল না। মানুষ কি মানুষকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যায়? চোখের আড়াল হইবামাত্রই কি মানুষ মনেও আড়াল হইয়া যায়?

খানিক দূর হইতেই চিন্ময় ক্ষণিকাকে দেখিতে পাইল। হিরণ্ময় যদিও ক্ষণিকাকে দেখিতেই আসিয়াছিল, তবু তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র সে দাদার পাশ হইতে সরিয়া গিয়া এক চীনাবাদামওয়ালার সহিত মহাতর্ক জুড়িয়া দিল। চিন্ময় কাছে আসিয়া অনাদিনাথকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনারা এরি মধ্যে উঠে বসেছেন!"

অনাদিনাথ বলিলেন—যে বয়সে গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ না ছাড়ালে ওঠা নিষেধ, সে বয়স আর আমার নেই বোধ হয়। আপনি উঠে আসুন না, এখনও ত গাড়ী ছাড়তে দেরি আছে।"

চিন্ময় উঠিয়া পড়িল, হিরণ্ময়ের বোধ হয় চীনাবাদাম-সমস্যার কোনই সমাধান হয় নাই, সে যেখানে ছিল সেই-খানেই থাকিয়া গেল।

ক্ষণিকার পাশে আসিয়া বসিয়া চিন্ময় বলিল—"এতক্ষণে ছাড়া পেলাম, ভেবেছিলাম বালিগঞ্জেই যাব, কিন্তু দেখ্‌লাম তার আর সময় নেই।"

ক্ষণিকা বলিল—"তবু ভাল যে এলে, আমি ত ভেবেছিলাম যে আস্‌বেই না।"

চিন্ময় বলিল—"ভেবেছিলে নাকি? আমি ভেবেছিলাম কিছু ভাব্‌বার সময়ই পাবে না।"

ক্ষণিকা বলিল—"আচ্ছা ঢের রসিকতা হয়েছে, থাম। মিনু কেমন আছে? একদিনও তার কাছে গিয়েছিলে?"

চিন্ময় বলিল—"গত শনিবারে গিয়েছিলাম, বেশ আছে। তোমাদের জাত কেমন, আস্‌বার সময় যত কান্না এসে পৌঁছেই তত হাসি। পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু সত্যই তোমাদের।"

ক্ষণিকা বলিল—"তবে কি চাও যে আমরা অশ্রুকে লোহার পাত্রে করে ধরে রাখি, কোনও দিনই আর না যাতে পালাতে পারে?"

চিন্ময় তাহার চোখের ভিতর তাকাইয়া বলিল—"এক এক সময় তাইই ইচ্ছা হয় জান?"

ক্ষণিকা হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ থামিয়া যাইতেই অনাদিনাথ আসিয়া সাম্‌নের বেঞ্চে বসিয়া চিন্ময়ের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। ক্ষণিকা গৃহিণীর কি একটা ফর্‌মাশ জোগাইতে তাঁহার কাছে উঠিয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই চিন্ময় নামিয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময় এতক্ষণ পরে আসিয়া একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া বলিল—"ষ্টেশনের লোকগুলো এমন ঠকাতে চেষ্টা করে।"

ক্ষণিকা বলিল—"তোমাকে ঠকালো নাকি কেউ?"

হিরণ্ময় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ইঃ, আমাকে গাঁওয়ার পেয়েছে কিনা? আমার অমন ঢের দেখা আছে।"

গাড়ী দুলিয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। চিন্ময় গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল—"জানি কোনো বিশেষ প্রয়োজন হবে না, তবু বল্‌ছি, যদি কোনো কারণে একটুও অসুবিধা বোধ কর, আমায় জানিও, আমি গিয়ে তোমায় নিয়ে আস্‌ব।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা!"

গাড়ীর বেগ বাড়িয়া উঠিল, চিন্ময় জান্‌লা ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময় রুমাল বাহির করিয়া যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল পূর্ণ উৎসাহে উড়াইতে লাগিল, চিন্ময়ের এ বিষয়ে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

বেণুকে জান্‌লার কাছ হইতে দূরে রাখিবার ইচ্ছা তাহার দিদিমার যত বেশী, তাহার নিজের সে ইচ্ছা তত কম। বাহিরের জিনিষ শুধু দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত নয়, প্রত্যেকটির সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য তাহার লাভ

করা চাই। তাহার দিদিমার উত্তর দিবার ক্ষমতা বড়ই সীমাবদ্ধ, অতএব উত্তরের বদলে যখন বকুনি প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা গেল, তখন ক্ষণিকা তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজের কাছে টানিয়া নিল। ঘণ্টা খানিক তাহার অবিশ্রাম প্রশ্নের উত্তরে অবিরাম বকিয়া অবশেষে ক্ষণিকা ছুটি পাইল। তাহার কোলের মধ্যে গুটিসুটি মারিয়া, মোনা ও সোনাকে বুকে চাপিয়া বেণু ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্ষণিকা এতক্ষণ পরে বাহিরের দিকে একটু ভাল করিয়া তাকাইবার অবসর পাইল। মাঠের পর মাঠ, জলের স্রোতের মত হুহু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা দু-একটা গাছ, কোথাও বা দু-তিনটা খড়ের ঘর। দিক-চক্রবালের রেখার কাছে যে ঘন নীলিমা, উহা কি মেঘ, না গাছের সার? পশ্চিমাকাশে স্বচ্ছ কুয়াশার আড়াল হইতে রক্তিমাভ আলোর ঝর্ণা ঝরিয়া পড়িতেছে, আবার আকাশের গায়েই মিলাইয়া যাইতেছে। এক কোণে রক্তহীন শুভ্রমুখে চন্দ্রকলা উঁকি মারিতেছে, রবির দীপ্তিতে তাহার মুখ যেন হিংসায় নিষ্প্রভ।

বাহির হইতে চোখ ফিরাইয়া সে ভিতরে চাহিল। গৃহিণী ইতিমধ্যেই শাল কম্বল মুড়ি দিয়া, হাওয়া লাগিবার ভয়ে মাঝের বেঞ্চিতে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। অনাদিনাথও পাশের বেঞ্চে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া

আছেন, খোলা জান্‌লার পথে একটুখানি আলোর টুক্‌রা তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

ক্ষণিকার মনে হইল এত কাছের মানুষকে এত দূরে সে আর কখনও দেখে নাই। ঐ যে ধ্যানমগ্ন মুখ, উহার দিকে তাকাইলে আর কি মনে হয় যে তাঁহার মনোজগতে কোথাও ক্ষণিকার স্থান আছে? কিন্তু নাই থাকিল, তাহাতেই বা কি? কিছুই কি না? বিস্মিত হইয়া সে আবিষ্কার করিল যে 'কিছু-না'র বদলে তাহা তাহার কাছে অনেকখানি।

সন্ধ্যার ধুসরতা দেখিতে দেখিতে রাত্রির কালিমায় মিলাইয়া গেল। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিতে লাগিল। তাহার অবিশ্রাম গর্জ্জন যেন লক্ষ্যহীন যাত্রার কাতরতার গান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গাড়ীর ভিতরের মানুষ কয়টি দেখিতে দেখিতে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

ভোর রাত্রের দিকে হঠাৎ ক্ষণিকার ঘুম ছুটিয়া গেল। ট্রেন কোনো এক ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া। দূরে মাঠে আলো হাতে মানুষ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাননের বৈতালিকদল কল-কাকলিতে আগতপ্রায় প্রভাতের বন্দনা করিতেছে। ক্ষণিকার জাগ্রত চক্ষু প্রথম পড়িল অনাদিনাথের মুখের উপরে, গাড়ীর আলোয় তাহা যেন বড় ম্লান দেখাইতেছে। সত্য, না কল্পনা?

( ১১ )

অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আলোর অঞ্জলি তখন খোলা জান্‌লার পথে ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। বাহিরে মাঠের মধ্যে হাওয়ার সুর ক্রমেই ক্লান্ত বিষণ্ণ হইয়া আসিতেছে। ক্ষণিকা ঘরের মধ্যে বসিয়া বেণুকে গল্প বলিয়া ছবি দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। এখানে আসিয়াই খোলা জায়গায় মনের আনন্দে সময়ে সময়ে খেলিয়া বেড়াইয়া এবং সাম্‌নের ক্ষীণস্রোতা নদীটির জলে উদ্দাম নৃত্য করিয়া সে একটু সামান্য সর্দ্দিজ্বরে পড়িয়াছে। তাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকাও এখন ঘরে বন্ধ। মাসীর হাতে না হইলে তার ঔষধ পথ্য কিছুই খাওয়া হয় না, এবং ক্ষণিকা ঘরের বাহির হইলেই বেণুর কান্নাকাটির জ্বালায় ব্যস্ত হইয়া ঝি চাকর যে যেখানে থাকে তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করে।

বাঘমামা ও তাহার মানবী ভাগ্নীর গল্প যখন মাঝামাঝি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন কাহার পদশব্দে চকিত হইয়া ক্ষণিকা যেন দ্বারের দিকে তাকাইল। মানুষটি চোখে পড়িবার আগেই যে ক্ষণিকা তাহাকে চিনিতে পারে নাই এমন কথা বলা চলে না। পায়ের শব্দ জীবন-ভোর শুনিয়াও অনেক সময় চেনা যায় না, আবার দুদিনের শোনাতেই কেন

যে তাহা জন্মজন্মান্তরের অতিপরিচিত রাগিণীর মত কানে বাজিতে থাকে, ক্ষণিকা হয়ত মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল। অনাদিনাথ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আপনি যে আজ একেবারে ঘর ছেড়ে বেরলেন না।"

ক্ষণিকা শঙ্কিতদৃষ্টিতে একবার বেণুর বিছানার দিকে তাকাইল। ক্ষণিকার এক-পা দূরে যাইবার কল্পনামাত্রেই আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠা তাহার একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে সুর আর এবার তাহাকে শুনিতে হইল না। বাঘমামার গল্পের মোহিনী মায়ায় বেণুর চোখে ইহারই মধ্যে আজ ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্ষণিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, "না, আজ আর বেরতে পার্‌লাম না। বেণু বড় ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল, তাই তাকে নিয়েই বসে ছিলাম।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "এখন ত বেণু ঘুমিয়েছে, একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে আস্‌তে পার্‌বেন, এখনও একেবারে অন্ধকার হয়নি।"

ক্ষণিকার বাহিরে একটু ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছাটা যে না ছিল তাহা নয়, তবে গৃহিণী ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে প্রায় দুপুর বেলাই নিজের বৈকালিক ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া ঘরে আসিয়া বসেন। কদম তাঁহার খাস্ দাসী, সেও তাঁহারই সঙ্গে ঘোরে। অতএব এখন বেড়াইতে হইলে একলা বাহির হইতে

হয়, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকার খুব বেশী উৎসাহ দেখা গেল না।

অনাদিনাথ বলিলেন, "আর দেরি করবেন না, এই বেলা চলুন, এর পর আপনার দুর্দ্দান্ত প্রভুটিও উঠে পড়বেন হয়ত।"

চলুন? তবে কি অনাদিনাথের সঙ্গেই যাইতে হইবে নাকি? ক্ষণিকা নিজেই যেন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু এই সন্ধ্যাবেলা দুজনে বেড়াইতে বাহির হওয়াটা লোকের চোখে ঠেকিবে কেমন? কিন্তু সে-কথা অনাদিনাথকে বলাই বা কি করিয়া চলে? তাঁহার নিজেরই এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা যখন হইলই না তখন ভ্রম সংশোধন করিবার ভার যে কে গ্রহণ করিবে, তাহা ত ক্ষণিকা ভাবিয়াও পাইল না।

অনাদিনাথ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি এগোচ্ছি, আসুন আপনি।"

তরুণী নারীর ঘরের বাহির হইতে হইলে তৎপূর্ব্বে যে একটু নিভৃত অবকাশের প্রয়োজন হয়, এ জ্ঞানটা অন্ততঃ অনাদিনাথের ছিল। তিনি সরিয়া যাইতেই ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি চিরুনী লইয়া চুলের শ্রী ফিরাইতে বসিল। বিনুনী করিবার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি কোন-রকমে চুলগুলা জড়াইয়া, পোষাক-পরিচ্ছদের একটু-আধটু পরিবর্ত্তন

করিয়া, সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অনাদিনাথ বাড়ীর সামনের খোলা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ক্ষণিকা আসিয়া জুটিতেই, তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথে নামিয়া পড়িলেন।

এখানে আসিয়া অবধি এই পথটিও ক্ষণিকার মনকে সব চেয়ে বেশী করিয়া টানিত। ইহার আদি কোথায় অন্ত কোথায়, কিছুই সে জানে না। কেবল তাহার চোখে পড়ে অনেকদূর বিস্তৃত লাল ধূলির আস্তরণ, তাহার দুইধারে সারি সারি অশ্বত্থ গাছের প্রাচীর, তাহাকে যেন দুই ধারের মাঠের বুক হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। লোকজন তেমন বেশী চলে না, খানিক দূর যাইবার পর লোকালয়ের চিহ্নও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসে। শোনা যায় আরও খানিক দূর যাইলে আবার গ্রাম, মানুষের বাসস্থান ইত্যাদির সন্ধান মেলে। কিন্তু দিন ও রাত্রির মধ্যবর্ত্তিনী ছায়াবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যার মত এই মাঝের জনহীন, নীরব অংশটিই বেশী করিয়া মনোহরণ করে।

দুইজনে পাশাপাশি হাঁটিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই। ক্ষণিকা দু-একবার এই নীরবতা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পথের সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল।

এই নীরবতাটুকু যে তাঁহার কাছে উপভোগের জিনিষ, তাঁহার পাশে যে মানুষটি হাঁটিয়া চলিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণে এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যাই যে তাঁহাকে সঙ্গদানে তুষ্ট করিতেছে, তাহা ত ঐ মুখের দিকে একবার চাহিলেই বুঝা যায়। তবে কথার প্রয়োজনই বা কি? কিন্তু কিছুই কি নাই? দুইজন মানুষ কাছাকাছি আসিলে কথা বলে কেন? কিন্তু ক্ষণিকা যে মানুষ সে কথা কি অনাদিনাথের মনে আছে?

হঠাৎ নিজের দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দে নিজেই সচকিত হইয়া ক্ষণিকা যেন স্বপ্নের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহারা অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে তাহাদের অজ্ঞাতসারে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারা চাহিয়া দেখে নাই। পথের দুই ধারের গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো লাল ধূলির উপর পড়িয়া আলোছায়ার বিচিত্র আল্পনায় পথটিকে উৎসবসজ্জায় সাজাইয়া তুলিয়াছে। অনাদিনাথ তখনও নীরব। এই মানুষটির মনের মধ্যে কি আছে? কে তাহার অন্তরে বসিয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া তাহাকে তৃপ্তির সাগরে ডুবাইয়া রাখে যে বাহিরের পৃথিবীর মুখের দিকে তাহার একবার চাহিয়া দেখিতেও ইচ্ছা করে না? পৃথিবীর যে মানুষ ক'টাকে

বাধ্য হইয়া তাহার কাছে কাছে ঘুরিতে হয় তাহারা কি কেবল অনাদিনাথের কাছে প্রয়োজনসিদ্ধির যন্ত্র মাত্র ? মানুষ কি মানুষের শুধু উপকার করে বলিয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে হয় ? প্রয়োজনের বাহিরে কি কিছুই নাই ?

দূর গ্রাম হইতে একটা নিশাচর কুকুরের চীৎকার আসিয়া তাহাদের কানে পৌঁছিল। অনাদিনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এবার ফেরা যাক্, অনেকদূর এসে পড়েছি। আপনার ক্লান্তি লাগ্‌ছে না ত ? এতদূর যে এসেছি তা বুঝ্‌তে পারিনি।"

ক্ষণিকার চোখে ইহাতে জল আসিবার কি প্রয়োজন ছিল ? সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না। অথবা পারিলেও নিজের কাছে তাহা স্বীকার করিল না। নারীজন্ম গ্রহণ করিলে অবগুণ্ঠন যে তার চিরদিনের সাথী। সমাজ তাহার মুখের উপর যে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়, তাহার চেয়ে ঘনতর আবরণে সে আপনার হৃদয়কে আপনার কাছে আবৃত করিয়া রাখে। যে অন্তরলোকবাসিনীর সহিত পরিচয় তাহার নিজেরই নাই, তাহার কথা অন্যকে সে কেমন করিয়া ডাকিয়া বলিবে ? যাহা হউক, কিছু না বলিয়া ত নিষ্কৃতি নাই। জীবনে সবার চেয়ে অধিক ব্যাকুলতা লইয়া মানুষ যাহা বলিতে

চায়, মানুষ যাহা শুনিতে চায়, তাহা ত বলা হয় না, শোনা হয় না; কিন্তু তুচ্ছ কথার স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলে। সে তুচ্ছ বলিয়াই সংসারে নির্ভয়ে লজ্জাহীন মুখে চলিয়া বেড়ায়। তাই ক্ষণিকাকেও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে হইল, "না, কিছু ক্লান্ত হইনি।"

আবার সেই অটুট নীরবতা। জ্যোৎস্নার দীপ্তি ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নীলসাগরের বুকে সূর্য্যের আলো যেমন উচ্ছল আনন্দে নৃত্য করে, তেমনি এই পথপার্শ্বে ঘন শ্যামলতার সাগরে শুক্লা রজনীর কিরণধারা নাচিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু অন্তরের আনন্দপ্রদীপখানি তুলিয়া ধরিয়া কোনো মানুষ এই জ্যোতিরুৎসবে যোগ দিতে আসিল না। ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধার যেন জ্যোৎস্নার কাছে হার মানিয়া এই পথচারী মানুষ দুটির বুকের মধ্যে আসিয়াই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ক্ষণিকা দেখিল, বেণুর তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। গৃহিণীর ঘরের দরজা এরই মধ্যে বন্ধ। ভিতর হইতে কদমের সুগভীর নাসিকাগর্জ্জন সকলকে জানাইয়া দিতেছে যে এটা বিশ্রামেরই সময়, চলিবার নয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বেণুর মশারি ফেলিয়া তাহার

মাথার কাছের জান্‌লা বন্ধ করিয়া ক্ষণিকা নিজের খাটের উপর শুইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের উপর এমন ভার কোথা হইতে, কখন আসিয়া চাপিয়া বসিল ? চোখের জলই বা এমন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায় কেন ? কি তাহার হইয়াছে ? এই কটা দিন আগে কল্পনাতে যে ছবি আঁকিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিত, সেই কল্পনাই ত বাস্তব হইয়া এখন দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু স্বস্তিটুকু সুখটুকু গেল কোথায় ? এই অকারণ অশ্রুপাত, অজ্ঞাতপথে হৃদয়ের এই অভিসার যাত্রা, ইহাকে সে কল্পনা করে নাই, কেমন করিয়া কোথা হইতে ইহারা আসিয়া তাহার মনপ্রাণ জুড়িয়া বসিল ? সে কি সেই ক্ষণিকাই আছে, যে ক'দিন আগে চোখের জল দমন করিয়া পিতৃগৃহ ছাড়িয়া অচেনা অজানা লোকের মাঝে পা বাড়াইয়াছিল ? বাহিরে দেখিতে তেমনই ত দেখায়, কিন্তু অন্দরমহলে চেনা-অচেনা জানা-অজানায় এমন উলটপালট্ হইয়া গেল কেমন করিয়া ? আগে যাহাকে যে নামে ডাকা চলিত, এখন তাহা চলে নাই বা কেন ? রুক্ষ ব্যবহার, কঠিন কথা, ইহাদেরই সে ভয় করিত, মনে করিত তাহাকে যদি আপনাকে লইয়া থাকিবার অবকাশ কেহ দেয় তাহা হইলেই যথেষ্ট, আর কিছু তাহার কাম্য নাই। কিন্তু খুসি হইতে পারিল কই ? কেন আজ মনে হয় কঠিন কথাও ভাল, কর্কশ

ব্যবহারও বরণীয়, কিন্তু আপনাকে লইয়া থাকা চলে না, চির নীরবতা তিরস্কার অপেক্ষাও অধিক আঘাত দেয়?

ভোর বেলা বেণুর কান্নার শব্দে জাগিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তার পর কাজের পালা। ভাবিবার আর সময় নাই, নিজেকে লইয়া বিশ্লেষণ করিবার মত নিভৃত অবসর একেবারে নাই। সংসারের শত কোলাহল, সহস্র তুচ্ছ দাবিদাওয়ার ভীড়ে তাহার হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন কখন যে মিলাইয়া গেল সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। দিনের আলোয় তাহার রাত্রির চিন্তা যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া চোখ মুদিয়া ফেলিল। জ্যোৎস্না রজনীতে যাহা জীবনে গভীরতম সত্যের রূপ ধরিয়া আসে, মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তিতে তাহা পাগলের প্রলাপেরই মত অর্থহীন, যুক্তিহীন, অবজ্ঞেয় হইয়া পড়ে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি সুস্থ ও অসুস্থ মানুষের বিভিন্ন রকম খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ঝি চাকর রাঁধুনী সকলের দ্বন্দ্ব-কলহের যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া ক্ষণিকা যখন স্নান করিয়া ঘরে ঢুকিল তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেণু একপালা খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করিয়া, বিছানার উপর একরাশ পুতুল ও খেলনা ঢালিয়া ঘরকন্নার কাজে মাতিয়া

উঠিয়াছে। মোনা অথবা সোনা একজন অবাধ্য হওয়ায় দুইটা বালিশ কোণাকুণিভাবে জোড়া দিয়া তাহাকে তাহারই মধ্যে কোণে দাঁড় করান হইয়াছে, অন্য মহিলাটির বিশেষ কোনো সুকৃতির পুরস্কার স্বরূপ একহাতে একটা বিস্কুটের টুক্‌রা এবং আর-এক হাতে একটা গোলাপফুল দেওয়া হইয়াছে। খাট ও বিছানাময় রাশ-করা ফুল ঢালা। গন্ধে ঘর একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণিকার চিরকাল ফুলের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ছিল। বেণুর নির্ম্মম হস্তে তাহাদের উৎপীড়নের সম্ভাবনাতেই সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওকি বেণু, ফুল ও-রকম করে চট্‌কাচ্ছ কেন? নষ্ট হয়ে যাবে যে?"

বেণু গাল ফুলাইয়া বলিল, "টোমার গুনো ত ওধারে রয়েছে, এগুনো আমার।"

ক্ষণিকা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার যে ওগুনো তোমায় কে বল্‌লে?"

বেণু বলিল, "মামা-বাবু। ঐ শাদা আর হল্‌দেগুনো তোমার, আর লালগুনো আমার। তুমি যে নাইতে গেলে, তাইত আমার খাটে রেখে দিলেন, তুমি কাঁচের বাটিতে রাখনা এখন।"

ক্ষণিকা হাসিয়া ফুলদানী আনিতে ঘর হইতে বাহির

হইয়া গেল। সমস্ত জিনিষপত্র এখনো বাহির করিয়া যথাযোগ্য স্থানে সাজাইবার অবকাশ সে পায় নাই। ভিতরের দিকের বারান্দায় একটা প্রকাণ্ড কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স, অভ্যন্তরে শতপ্রকারের বিচিত্র জিনিষ বহন করিয়া এখনও পড়িয়া আছে। তাহার তালা খুলিয়া ক্ষণিকা সাবধানে এক-একটা করিয়া জিনিষ নামাইয়া মাটিতে রাখিয়া আপনার অভিলষিত পদার্থ খুঁজিতে লাগিল।

পিছন হইতে অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনি ওগুলো টানাটানি কর্ছেন কেন? পঞ্চা কোথায় গেল?"

ক্ষণিকার মনে হঠাৎ যেন একটা অভিমানের ঢেউ আছ্ড়াইয়া পড়িল। তাহার তুচ্ছতম সুখসুবিধা, সেইগুলার দিকেই কি অনাদিনাথ সর্ব্বদা চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকেন? সেদিকে না তাকাইলেও কি ক্ষণিকার কিছু মাত্র আসিয়া যাইত? কিন্তু এইসকলকে অতিক্রম করিয়া কি এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না? আর যদি নাই যায়, তবে এইটুকু আসিবারই বা প্রয়োজন কি? সত্য বটে তাহার সহিত অনাদিনাথের সম্বন্ধই প্রয়োজন ও সুবিধার সম্বন্ধ, তবে কেবল সেইটুকুতে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেই ত হয়? প্রয়োজনের কারাপ্রাচীর ভেদ করিয়া একটুখানি বাহিরের নীলাকাশ দেখিতে দিবার

সুযোগ দেওয়া কেন? ইহার পর কারাগারের বন্ধন যে আরো দুর্ব্বিষহ হইয়া ওঠে!

ক্ষণিকা বলিল, "কি জানি, তাকে ত কাছাকাছি কোথাও দেখ্‌ছি না, ফুলগুলো পাছে শুকিয়ে যায় তাই তাড়াতাড়ি ফুলদানীর সন্ধানে এলাম।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "এখানে এসে আমার এক বাল্যবন্ধুর সন্ধান পেয়েছি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছিলাম, খুবই কাছাকাছি ছিলাম, এখন ঘটনাচক্রে অনেকদূরে গিয়ে পড়েছি। তিনি আজ হঠাৎ মনে করতে পেরেছেন যে আজ আমার জন্মদিন, সেইজন্যই ওগুলো পাঠিয়েছেন। বাড়ীর মধ্যে আপনিই ওদের মর্য্যাদা সব-চেয়ে বেশী বুঝবেন তাই আপনার ঘরেই ওদের আশ্রয় দান করে এসেছি।"

ক্ষণিকা শেষের কথাগুলিতে বিশেষ মন দিল না। আজ অনাদিনাথের জন্মদিন এই কথাটাই তাহার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিমা ত কই কিছু বলেন নি আমায়?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "মায়ের নিজেরই মনে ছিল কি না সন্দেহ। যে বয়সে জন্মদিন মনে করে আনন্দ পাওয়া যায়, লোককে সে আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা করে, সে বয়স

আর আমার নেই। বিনোদ মনে না পড়িয়ে দিলে আমি নিজেই ভুলে থাক্‌তাম। এই পৃথিবীকে এখন দেখে দেখে এমন চিরপরিচিত লাগে যে বিশেষ কোনোদিনে যে এখানে এসেছি, তার আগে যে এখানে ছিলাম না, সে কথা ভুলেই থাকি।"

ক্ষণিকা এতক্ষণে বাক্সের তলা হইতে নিজের দর্‌কারি জিনিষ ক'টা টানিয়া বাহির করিল। অনাদিনাথের কথার উত্তরে কিছু বলা উচিত কি না, সেটা ভাবিতে আরম্ভ করিতেই, তিনি তাহাকে ভাবনামুক্ত করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বৈকালিক আহারের সময় আয়োজনপারিপাট্যে বিস্মিত হইয়া অনাদিনাথ বলিলেন, "একি! আমার জন্মদিনে এত ঘটা ত অনেক কাল হয় নি।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওকি আর আমি করেছি বাছা, আমার ক্ষমতা থাক্‌লে ত? ক্ষণু সারা দুপুর বসে বসে ঐসব কর্‌ল। এত করে বল্‌লাম, রাতে বেণু ঘুমতে দেয় না, একটু গড়িয়ে নে, তা মেয়ে কি কথা শোনে? সেই থেকে উনুনের ধারে বসে আছে, আর এই এখন উঠ্‌ল।"

অনাদিনাথ একটু হাসিলেন, তাহার পর ক্ষণিকাকে

উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "উনি এখানে আস্‌বার সময় একবারও ভাবেন নি বোধ হয় যে ঘরকন্নার সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর সব বুড়ো এবং ছোটোর জন্মদিন, পুতুলের বিয়ে, রোগের সেবা, সকলেরই ভার ওঁকেই নিতে হবে। একরকম প্রবঞ্চনা করেই ওঁকে আমরা নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী অর্দ্ধেক কথা বুঝিয়া এবং অর্দ্ধেক না বুঝিয়া বলিলেন, "তা সাধ করে খাট্‌লে কি আর বল্‌ব বল? আর ভদ্রলোকের মেয়ে, কচিমেয়েটা জ্বরে চেঁচাচ্ছে দেখে কি করে ঝিয়ের হাতে ফেলে সরে থাকে? দেখ্‌ছে ত আমার দশা? মানুষের বার হয়ে গেছি। কি রে কদম, অত ডাকাডাকি কেন?" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

ক্ষণিকা এতক্ষণ আরক্তমুখে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের কথোপকথন শুনিতেছিল। অনাদিনাথের কথা যে বেশীর ভাগই পরিহাস তাহা বুঝিয়াও যেন তাহার ক্ষুব্ধ মন বুঝিতে চাহিতেছিল না। চাহিবার দাবি তাহার নাই, কিন্তু দিবার অধিকার? অনাদিনাথ নিজে যেমন সকল প্রয়োজনের অতীত, তেমনই কি সকলেই? তাঁহার লইবার প্রয়োজন নাই থাকিল, কিন্তু তাঁহাকে দিয়া যদি কেহ ধন্য হইতে চায়, তাহাকেও কি এই পরিহাসের বর্ম্মে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিতে

হইবে? আর প্রবঞ্চনা? তাহা যদি কেহ করিয়া থাকে, ত ক্ষণিকাই করিয়াছে। সে যে ভাবে এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ লজ্জাহীন লোভীর মত তাহাকে অতিক্রম করিয়া সে কোথায় যাইতে চায়? আর তাহার পথে বাধা দেখিলে কেন সে মনে মনে ইহাদের দোষী করে? ইহার অধিক কিছু পাইবার ত তাহার কথা ছিল না, তবে এ ক্ষোভ কেন?

আহারান্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, অনাদিনাথের কাছে আসিয়া ক্ষণিকা তাঁহাকে প্রণাম করিল। এতক্ষণ দাঁড়াইয়া সে বিবেচনা করিতেছিল, যে, এইটুকুও করা যায় কি না। অনাদিনাথ সহাস্যে তাহার মাথায় একটুখানি করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "জীবের জন্মটা চিরকাল আপনারা উৎসবের জিনিষ করে তোলেন। তাই অনেকদিন পরে আজ আবার আমার জন্মোৎসব হল। আমার মা অক্ষম হয়ে পড়েছেন, আর যে ক'টা মানুষের সঙ্গে আমার এতদিন সম্পর্ক ছিল, তারা আমারই স্বজাতি, তাদের স্বভাবে আনন্দ উপভোগ কর্‌বার আকাজ্ক্ষা যেমন বেশী, দেবার ক্ষমতা তেমনি কম। আনন্দ পাওয়ার যে মানুষের একটা স্বাভাবিক অধিকার আছে, তা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পেয়ে জান্‌লাম সে আকাজ্ক্ষা কেবল ঘুমিয়ে ছিল, মরে যায়নি।"

অনাদিনাথ চলিয়া যাইবার পরেও কতক্ষণ যে ক্ষণিকা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল তাহার ঠিকানা নাই। কে বলিল পুরুষের আনন্দ দান করিবার ক্ষমতা নাই? নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ইহাদের কি চেতনা একেবারেই নাই? এই যে শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত উচ্ছল হইয়া নাচিয়া ফিরিতেছে, ইহাকে ক্ষণিকার দেবতা কাহার হাতের স্পর্শে তাহার কাছে পাঠাইলেন? এই যে আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া আনন্দরাগিণী ধ্বনিত, ইহা কাহার কণ্ঠস্বরে প্রথম বাজিয়া উঠিল? চন্দ্রালোকপ্লাবিতা প্রকৃতিদেবী কাহার অবহেলায় অমাবস্যারজনী হইয়া ক্ষণিকার চোখে দেখা দিয়াছিলেন; আর এই সামান্য ইঁটকাঠের কোটর, চারিদিকে সাংসারিক আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন, ইহা যে পলকে নন্দনের সৌন্দর্য্যকে হার মানাইতে বসিল, এ কাহার চোখের দৃষ্টিতে?

( ১২ )

দুপুরবেলা বেণুর ক্ষণিকার কাছে পড়িবার কথা। তবে সব সময় যে কথামত কাজ হয় তাহা নহে। ছবি গল্প, হাসিখুসি, ইত্যাদি সে কোনোপ্রকারে মাসির খাতিরে সহ্য করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যখন এক দুই গুণিতে বলা হয়, অথবা তাহার মোনা ও সোনার পাঁচখানা শাড়ীর দুখানা অন্য কাহাকেও দান করিলে ক'টা

থাকে ইত্যাদি মর্মভেদী প্রশ্ন আসিয়া হাজির হয়, তখন বেণুর ধৈর্য্য আর থাকিতে চায় না। তাহার ক্ষিদে পায়, ঘুম পায়। তাহার সোনা কাঁদে, সোনা পড়িয়া যায়, যে কোনোপ্রকারেই হউক গণিতের কোঠায় পা দিবামাত্র বেণুর পড়ার অবসান হয়। তাহার দিদিমাও অজ্ঞাতসারে এক-এক দিন এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। আহারান্তে এক ঘুম ঘুমাইয়া উঠিয়া তাঁহার একটু সুখ-দুঃখের কথা কহিতে ইচ্ছা করে। কদম হাজার হইলেও ঝি, তাহাকে ত আর সব কথা বলা চলে না? বাড়ীতে আর-একটা স্ত্রীলোক নাই, অগত্যা থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাকে ক্ষণিকারই শরণ লইতে হয়। ক্ষণিকা যদিও তাঁহার গল্পে কেবলমাত্র শ্রোতারূপেই বেশীর ভাগ সময় কাটায়, তবুও একেবারে চুপ করিয়া থাকার চেয়ে ত ভাল? আর উত্তরের প্রত্যাশাও যে গৃহিণী বিশেষ করিতেন, এমন নহে। বলিয়াই সন্তুষ্ট হয় এমন একদল মানুষ ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, অনাদি-নাথের মা তাহাদেরই একজন।

বেণু মেঝের উপর মাদুর পাড়িয়া চীৎকার করিয়া 'হাসি-খুসি' পড়ায় ব্যস্ত। পাশে বসিয়া ক্ষণিকা তাহার উচ্চারণ সংশোধন মানে বলা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে একটা শেলাই হাতে করিয়া তাহাতেও দুএক ফোঁড় তুলিতেছে। হঠাৎ

বেণুর পড়া থামিয়া গেল। ক্ষণিকা বলিল, "ও কি বেণু, থাম্‌লে কেন? পড়।"

বেণু বলিল, "পড়ব না।"

ক্ষণিকা মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন, পড়্‌বে না কেন? গল্পটা শেষ করবে না?"

বেণু বলিল, "টুমি কেবল বিচ্ছিরি শেলাই করবে কেন? আমার দিকে চাইবে না কেন?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা এইবারে তোমার দিকেই কেবল চেয়ে থাক্‌ব, তুমি পড়।"

বেণু বলিল, "গল্প ভাল না, বিচ্ছিরি।"

ক্ষণিকা বুঝিল আজ মৌখিক যোগ-বিয়োগের আবির্ভাবের আগেই বেণুর মনোযোগ অন্য পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করার ইচ্ছায় বলিল, "তবে শ্লেটে লেখনা, সেই শেয়ালের কথা লেখ।"

বেণুর মুখ ক্রমেই ভার হইয়া আসিতেছিল, সে ঠোঁট ফুলাইবার উপক্রমণিকা করিতে করিতে বলিল, "শেলেটে মোনা লিখে দিয়েছে, আর জায়গা নেই।"

ক্ষণিকা বলিল, "সে লেখা মুছে ফেলে তুমি লেখনা?"

বেণু এইবার স্বরে ক্রন্দনের আভাস দিয়া বলিল, "কেন

আমি মুছ্ব? তুমি ওকে দিয়ে মুছিয়ে দাও, ও কেন লিখ্ল আমার শেলেটে?”

ক্ষণিকা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “যাও বেণু, তুমি আজ ভারি দুষ্টু হয়েছ। অমন কর্‌লে আমি তোমার মামাবাবুকে বলে দেব, তিনি আর তোমায় ভাল বাস্‌বেন না।”

বেণু মুখখানা ফুলাইয়া রাগ করিয়া মাদুর ছাড়িয়া খাটের উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। এমন সময় তাহার দিদিমা ঘরে ঢুকিয়া, মস্ত একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, “কি কর্‌ছ বাছা, পড়ানো হয়ে গেল বুঝি? আমার আবার আজ কি যে হয়েছে, ঘুম কি কিছুতে আস্‌ছে! কতক্ষণ শুয়ে এপাশ ওপাশ কর্‌লাম, তা কিছু হল না। এই এতক্ষণে উঠে আস্‌ছি। ভাব্‌লাম দেখি মেয়েটা কি কর্‌ছে।”

ক্ষণিকা ইহার উত্তরে একটু হাসিল মাত্র। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় তাহার এই জ্ঞানটুকু হইয়াছিল যে সব সময়েই কথার উত্তরে কথা বলিতে হয় না। গৃহিণী মাদুরের উপর ভাল হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিলেন, “তবু তুমি আছ তাই দুদণ্ড নিশ্চিন্দি হয়ে শুতে পার্‌ছি। এতদিন কি সে জো ছিল? এই মেয়ে কাঁদ্‌লে, এই মেয়ে পড়্‌ল, এই ছেলে আফিস থেকে এল। চব্বিশঘণ্টা পায়ের ওপর কাটিয়েছি। ভুবন যখন ঐ কচিটুকু রেখে চলে গেল

তখন যে ডাক ছেড়ে একবার কাঁদবে তার সুদ্ধ জো ছিল না। পাঁচমাসের মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত সারাক্ষণ।"

এ কথাগুলি আজ যে ক্ষণিকা নূতন শুনিল তাহা একেবারেই নয়। গৃহিণীর বিগতজীবনের ইতিহাস শুনিয়া শুনিয়া তাহার একরকম মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বলিলে তাহার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

গৃহিণী আবার আরম্ভ করিলেন, "ভুবন যা দেখ্‌তে ছিল মা, সে আর কি বল্‌ব। বেণুকে বল সুন্দর, ভুবনের কাছে ও ত কুচ্ছিত। তোমার হয়ত বিশ্বাস হবে না, ভাব্‌বে বুড়া মাগীর কথা শোন, ওর আবার সুন্দরী মেয়ে ছিল, ছেলে কেমন তা ত দেখ্‌ছি। তা বাছা, চিরকাল এমন ছিলাম না। এখন বাতেও ধরেছে, বুড়ীও হয়েছি। আর অনাদির কথা যদি বল, ও ছেলেবেলায় বেশ খাসা দেখ্‌তে ছিল, এখন সারাদিন যেমন বই নিয়ে বসে থাকে, তেমনি চেহারাও হয়েছে। শরীরের যত্ন না কর্‌লে কি আর কোনো ছিরি থাকে ? পুরুষমানুষ নিজের যত্ন আর নিজে কি কর্‌বে, তা বলি এত করে, একটা বিয়ে কর বাপু, তা ছেলের কোনোদিকে কি খেয়াল আছে ? বই আর বই, পড়া আর পড়া। হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছে তাই দিনের দিন।"

ক্ষণিকার হাসি চাপিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অনাদিনাথকে কুরূপের উদাহরণ স্বরূপ তাহার কাছে তুলিয়া ধরাটা যে কতখানি অদ্ভুত, তাহা সে নিজে ছাড়া কেহ বুঝিতে পারিল না, ইহাতে তাহার হাসি বাড়িল বই কমিল না। ইহার উপর যখন অনাদিনাথ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ডাক্‌ছিলেন নাকি?" তখন যে সে কি করিবে এবং কোথায় যাইবে তাহা ভাবিয়াও পাইল না।

কিন্তু অনাদিনাথের মায়ের কথার উত্তর না দিলেও চলে বলিয়া তাঁহার কথার উত্তর না দিলে কখনও চলিবে না। তা ছাড়া ক্ষণিকা অকস্মাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে এমন সম্ভাবনাই বা তাঁহার মনে উদিত হইল কেমন করিয়া? সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "না ডাকিনি ত? কে বল্‌ল আপনাকে?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "তা হবে, বেণুর অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় আমিই হয়ত ভুল বুঝেছিলাম।"

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছে বেণু আপনাকে?"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছু নয়, কেবল আমায় এসে বলে যেতে হবে আপনাকে যে বেণু দুষ্টু নয় এবং আমি তাকে যথেষ্ট ভালবাসি। এত টানাটানি কর্‌তে

মোহ কাটিতেই বা বেশী দেরি হয় কৈ ? সেই জগৎ দেখিতে দেখিতে প্রেতপুরীর মত ভীষণই বা কেমন করিয়া হইয়া ওঠে ?

আজ থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণিকার মনে ঐ কথাই জাগিয়া উঠিতেছিল। অনাদিনাথকে প্রথম যে দিন সে দেখিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাঁহাকে অতি সুপুরুষ মনে করে নাই। মেনকা তাঁহার সম্বন্ধে যেপ্রকার স্বাধীন আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহাতে যোগ না দিলেও, বিশেষ আপত্তিও যে ক্ষণিকা অনুভব করিয়াছিল এমন বোধ হয় না। কিন্তু অনাদিনাথের রূপের এই দুই তিন মাসের মধ্যে এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে আজ তাঁহার মায়ের কথা আজ ক্ষণিকার কাছে এতখানি হাস্যকর লাগিল কেমন করিয়া ? মনে মনে কেবলই সে বলিতে লাগিল, "ওঁর সম্বন্ধেও এ কথা লোকের মনে হয় এ বড় আশ্চার্য্য, তাও আবার ওঁর নিজের মায়ের।" তাহার মনোলোকে যে মূর্ত্তিকে সে বসন্তের সৌন্দর্য্যসম্ভার উজাড় করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল, বাহিরের লোক যে তাহাকে দেখে না এ কথা তাহার মনেই ছিল না।

তাহাদের প্রবাসের দিনগুলি একটি একটি করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। এখানে আসিয়া সকলেই ছিল ভাল, কাজেই যাইবার নাম বড় একটা কেউ করিত না। গৃহিণীর শরীর

অপেক্ষাকৃত ভাল থাকায় তিনি স্থানটার উপর বড়ই প্রসন্ন ছিলেন। অনাদিনাথের মনোভাব কথায় কিছুই প্রকাশ পাইত না, তবে মুখের প্রসন্নতা মাঝে মাঝে তাঁহার হইয়া জানাইয়া দিত যে কর্ম্মচক্রের একটানা একঘেয়ে পেষণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তিনি অন্ততঃ অ-খুসি নন। আর বেণুর ত কথাই নাই। সে বিচ্ছিরি কলকাতায় ফিরিতে সম্পূর্ণ আপত্তি প্রকাশ করিত। এখানে কেমন উছ্রী আছে, পাহাড় আছে, মাঠ আছে; সেখানে কেবল বাড়ী, রাস্তা আর গাড়ী। তাহা ভিন্ন নিজের সমবয়স্ক দু-চারটি মানুষের সন্ধানও এখানে মিলিয়াছে, মহানগরীর এক কোণে সে যেখানে থাকিতে বাধ্য হয়, তাহার কাছাকাছি অমন লোভনীয় জিনিষ একেবারেই সুলভ নয়।

ক্ষণিকার বাড়ীর চিঠি এবং বন্ধু-বান্ধবের চিঠি আসিয়া প্রায়ই তাহাকে তাহার বিগত জীবনের স্মৃতির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিত। কিন্তু বর্ত্তমানের দাবি এখন তাহার মনের উপর এমনভাবে চাপিয়া বসিয়াছিল যে স্মৃতি তাহাকে বেশীক্ষণ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিত না। মেনকা এখন বেশ ভাল আছে, স্কুলের মেয়ে শিক্ষয়িত্রী সকলকেই মোটের উপর তাহার ভালই লাগিয়াছে। ক্ষণিকার পিতার অবস্থাও ক্রমে ভালর দিকেই অগ্রসর হইতেছে, লালু পড়া-

শুনায় ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, ইত্যাদি সুখবর সে তাহার মায়ের চিঠিতে থাকিয়া থাকিয়া পাইত। মেনকা লালুও সময়-মত তাহাকে দুই-একখানা চিঠি লিখিয়া পরিতৃপ্ত করিত।

মনোজার একখানা চিঠি বহুদিন পরে তাহার বাড়ী ঘুরিয়া তাহার মায়ের চিঠির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। চিঠিতে তাহার নিজের কথা বা ক্ষণিকার কথা খুব যে বেশী আছে তাহা নহে, সে যে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারই বর্ণনায় চিঠি ভরপূর। বর্ণনা করিবার অতিরিক্ত উৎসাহে কোন্ ঠিকানায় চিঠি লিখিলে যে চিঠিখানা তাহার কাছে সোজাপথে পৌছিবে তাহা জানাইতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। ক্ষণিকা অগত্যা তাহাকে তাহার বাড়ীর পুরানো ঠিকানাতেই চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, কিন্তু ভ্রমণকারিণীর অনুসরণে দেশবিদেশ ছুটিয়া কবে যে সেখানা মনোজার কর-কমলে গিয়া আশ্রয় পাইবে, তাহা জানিবার আর কোনো উপায় রহিল না।

কতদিন হইল ক্ষণিকা ঘরছাড়া হইয়াছে, কিন্তু চিন্ময় একেবারে নীরব। প্রথম প্রথম ক্ষণিকার রাগ হইত। কি অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ! যতক্ষণ চোখের সাম্‌নে সে ছিল, ততক্ষণ ত চিন্ময়ের ব্যবহার ইহাই সর্ব্বদা প্রমাণ করিয়াছে

যে ক্ষণিকার জন্য না করিতে পারে এমন কাজ নাই, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেও কখনও চিন্ময়ের ক্লান্তি দেখা যায় নাই। কিন্তু চোখের আড়াল হইবা মাত্র মানুষ কি এমনই মনের আড়াল হয় যে তাহার একটু খোঁজ খবর লইবার ইচ্ছাটাও মন হইতে চলিয়া যায়? কিন্তু যখন দিনের পর দিন কেবলই কাটিতে লাগিল তখন ক্ষণিকার অভিমান ক্রমে বিস্ময়ে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল। এই বিস্ময়ের মেঘের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া যেন একটুখানি আলো খেলিয়া যাইত। ক্ষণিকার মনে হইত কি একটা জিনিষ যেন এই অবহেলার ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহাকে ক্ষণিকা সবলে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিত। যাহাকে দিবার কিছু নাই, অথচ আঘাত করিতে গেলে সে আঘাত ফিরিয়া নিজের বুকেই আসিয়া বাজে, এমন মানুষ যদি ভিখারী হইয়া আসে তাহা হইলে তাহাকে কাছে আসিতে না দেওয়া ছাড়া আর কিই বা উপায় থাকে?

মাঝে একবার মাধবী ও মেনকাকে ক্ষণিকা লিখিয়াছিল, "চিন্ময়-দার খবর কি? তিনি কি আমার অস্তিত্বই ভুলে গেলেন নাকি?" মাধবী ইহার কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। মেনকা লিখিল, "চিন্ময়দাকে তোমার

কথা বলেছিলাম, তিনি বল্‌লেন, সত্যযুগে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করে একজনকে অনঙ্গ হতে হয়েছিল, যা হোক তবু তিনি বেঁচে ছিলেন, কলিযুগে অঙ্গ ছাড়া বেঁচে থাকা যায় এ-কথা মাত্র কোনান্‌ ডয়েল, অলিভার লজ, প্রভৃতি দুচারটি মানুষ বল্‌ছে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে কি অত বড় দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে পারি? গৌরী ত মহাদেবের চেয়ে কোনো অংশে কম নন্‌।"

মেনকা অবশ্য যে চিন্ময়ের রসিকতাটা খুব তলাইয়া বুঝিয়াছে এমন কোনো লক্ষণ তাহার চিঠিতে দেখায় নাই। আজই চিঠিখানা আসিয়াছে এবং সেখানা হাতে করিয়া ক্ষণিকা আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিয়াছে। চিন্ময়দার রসিকতার প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখা যাইতেছে। হাজার হউক, মেনকা তাহার ছোট বোন এবং রীতিমতই ছোট, তাহার কাছে ক্ষণিকাকে লইয়া অতখানি রসিকতা না করিলেই চলিত? তাহার তপস্যা যে চলিতেছে সে কথা মিথ্যা নাও হইতে পারে, তর্কের খাতিরে না হয় ধরিয়া লওয়া গেল যে সত্যই, তা বলিয়া সকলের সে বিষয়ে এত মাথাব্যথা কেন? ইহারই মধ্যে ক্ষণিকা ভুলিয়া গেল যে মাথাব্যথার অভাবটাকেই সে এতক্ষণ অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করিতেছিল। তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা-

হীনতাও তাহার সহ্য হইবে না অথচ পরিপূর্ণ সচেতনতাকেও সে অনধিকারচর্চ্চা মনে করিবে, এতখানি আব্দার তাহার সংসার মানিয়া চলিবেই বা কেন? আর একটা কথাও রাগের মাথায় তাহার মনে আসিল না যে, ঠিক এইভাবেই উদ্যত কৌতূহল লইয়া সে নিজে তাহার বন্ধুবান্ধব অনেককে খোঁচা মারিয়া বেড়াইয়াছে।

চিঠিতে বাড়ীর সকলে বেশ ভাল আছেন, এ খবরটাও ছিল এবং প্রবোধ যে সত্য সত্যই কাজে ঢুকিয়াছে তাহাও ক্ষণিকাকে মেনকা জানাইয়াছিল। এককাল ছিল যখন এই খবরগুলি ক্ষণিকার কাছে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সংবাদ ছিল। এখন এগুলি না পাইলে সে উদ্বিগ্ন হয় বটে, কিন্তু পাওয়াতে আগের মত আনন্দ আর অনুভব করে না। তাহার অনুভূতি এখন সর্ব্বদা অন্য বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকে, ইহাদের সে চোখের দ্বার দিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে দেয় মাত্র, তাহার পর হৃদয়মন্দিরে তাহারা কে কেমন অভ্যর্থনা পাইতেছে সে খবর লইবার আর তাহার অবসর থাকে না।

( ১৩ )

ক্ষণিকাদের প্রবাস হইতে ফিরিবার দিন অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। দিনগুলার মত মানুষ ক'জনের মন কিন্তু

ততখানি অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। একমাত্র বেণু থাকিয়া থাকিয়া খুব খানিকটা উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ফেলিত। তাহার মোনা ও সোনার নাকি স্কুল খুলিয়া গিয়াছে, আর বসিয়া থাকা চলে না।

যাহা হউক যাওয়ার দিনটা আসিয়াই পড়িল। মানুষে অনেকসময়েই মুখে বলে, এবং কোনো কোনো সময়ে মনেও ভাবে, যে, আপনার ইচ্ছামত কাজ করিবার শক্তি বুঝি যথার্থই তাহাদের আছে। কিন্তু যে অজ্ঞানা অনামা শক্তি আমাদের এই সংসারে একস্থান হইতে আর-এক স্থানে, এক মনোভাব হইতে আর এক মনোভাবে, বন্ধন-হীনতা হইতে বন্ধনের দিকে, পাওয়ার আগ্রহ হইতে দেওয়ার ব্যাকুলতার দিকে কেবলি ঘুরাইয়া মারে, সে কি আমাদেরই ইচ্ছা? না সেই অপরিচিতা কৌতুক-ময়ীর সহিত আমাদের মনোলোকবাসিনী ইচ্ছার সখী-সম্পর্ক পাতাইয়া আমরা মানুষের আত্মাভিমান তৃপ্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করি মাত্র?

আবার সেই যাত্রার কোলাহল ক্ষণিকাকে চারিদিক হইতে উত্যক্ত অধীর করিয়া তুলিল। তবে প্রবাসে যাত্রা করিবার আয়োজন এবং প্রবাসান্তে গৃহে ফিরিবার আয়োজনের মধ্যে অনেকখানি যে পার্থক্য আছে তাহা

নারী মাত্রেই স্বীকার না করিয়া পারে না। যে ঘর দুদিনের জন্য মাত্র ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহাকে কত শত ব্যবস্থার বন্ধনে যে বাঁধিয়া যাইতে হয়, তাহার ত আর আদি-অন্ত নাই। কিন্তু যে ঘরে আর জীবনে কোনদিন পদার্পণ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, তাহাকে ত পথের ধূলার মত অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারা যায়, সে গৃহের ভবিষ্যতের ভাবনা মনকে কোনখানেও ভারাক্রান্ত করে না। তাহা ছাড়া আসিবার বেলা কোন্ জিনিষটি যে অতি প্রয়োজনীয়, এবং কাহাকে যে না হইলেও দুদিন চলে এই নির্ব্বাচনের পালাতেই মেজাজ ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে এবং দেহের বল ক্রমেই জমার দিক ছাড়িয়া খরচের কোঠায় যাত্রা করে। কিন্তু ফিরিবার বেলা ভাবিবার ত কিছু নাই। যাহা আনা হইয়াছে, তাহা সবই যে লইয়া যাইতে হইবে এবিষয়ে কোথাও কাহারও কোনো সন্দেহ দেখা যায় না। জিনিষ-গুলিকে কোনোপ্রকারের বন্ধনের বেষ্টনে আবদ্ধ করিতে পারিলেই হইল।

পরদিন গাড়ী রিজার্ভ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, এইরূপ সহস্র ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষ-পত্র একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দেখা গেল

ব্যাপারখানি যতখানি সোজাসুজি মনে করিয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল, ঠিক ততখানি সোজা ঠেকিল না। কলিকাতা হইতে যে জিনিষগুলি এখানে বহন করিয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলি ও তাহাদের বাহন বাক্স-প্যাটরাগুলি ত আছেই, কিন্তু এই দুই তিন মাসের প্রবাসের ফলে বেনু যে দুই তিন মণ পাথরের টুক্‌রা জোগাড় করিয়াছে এবং গৃহিণীও যে অকুণ্ঠিত মনে সহস্র প্রকারের গৃহস্থালী ও গৃহসজ্জার উপকরণ আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের কথা সে বেশ ভুলিয়া বসিয়া ছিল। গৃহিণীকে বলিয়া কহিয়া যদি বা সে দুই-চারিখানা হাঁড়ী-কুড়ী কমাইতে পারিল, কিন্তু বেণুর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস তাহার হইল না। দুই টুক্‌রা পাথর সরানো কিছু শক্ত নয়, কিন্তু তাহার ফলে বেণুর মনের উপর যে পাষাণভার চাপিয়া বসিল তাহা দূর করা প্রায় সাধ্যের অতীত। অতএব ইট, পাথর, স্লেটের টুক্‌রা, সব নির্ব্বিচারে বাক্সে স্থান দিয়া ক্ষণিকাও বাঁচিল, বেণুও নিশ্চিন্ত হইল। তবুও কথায় বলে "স্বভাব যায় না ম'লে।" তর্কে হারমানা নিশ্চিন্ত জানিয়াও ক্ষণিকা বলিল, "বেণু, অত পাথর নাই নিয়ে গেলে? দু চার খানা রেখে যাও না?"

বেণুর ঠোঁট ফুলিতে আরম্ভ করিল, সে বলিল, "না খাণ্ডলি হবে।"

ক্ষণিকা বলিল, "খাণ্ডুলি কি কল্‌কাতায় আছে যে হবে? সে ত এখানে। বেশ ত এইখানে রেখে যাও না?"

বেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, কল্‌কাতায় না, সোনা সোনা ট্রেনে করে আস্‌বে।"

খাণ্ডুলি পাহাড় সরানোর প্রস্তাব সেখানেই চাপা পড়িল, ক্ষণিকাকে অন্য কাজে উঠিয়া যাইতে হইল।

বিকাল বেলায় শেষবার একটু চারিদিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার আশায় ক্ষণিকা সকাল সকাল বাহির হইয়া পড়িল। ক'দিনের মধ্যেই এখানকার মাঠ বন পাহাড় সকলের সঙ্গে তার যেন কেমন একটা প্রাণের বন্ধন জন্মিয়া গিয়াছিল। সে যে কেবল তাহাদের সৌন্দর্য্যের খাতিরে, এ কথা ক্ষণিকা নিজের মনের কাছে স্বীকার করিত না। এই যে গাছের ছায়ায় ঢাকা রাঙা মাটীর পথখানি, ইহার তুল্য সুন্দর কি ইহা অপেক্ষাও সুন্দর পথ কি সে দেখে নাই? কিন্তু তাহারা তাহার চোখের দেখার জিনিষ মাত্র, হৃদয়ের মধ্যে তাহারা কোনদিন আসিয়া প্রবেশ করে নাই। এই পথটির উপর দিয়া সে যাহার সঙ্গে হাঁটিয়াছে চলিয়াছে, তাহার প্রতি ক্ষণিকার যে মনোভাব তাহারি একটুখানি আভাস যেন এই পথটির মূর্ত্তিও পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। এই

যে সম্মুখে শীর্ণ স্বচ্ছতোয়া নদীটি, ইহা কেন এমন করিয়া তাহার হৃদয়কে শতপাকে জড়াইয়া ধরিতেছে? এই মাঠ, এই বন, কেন তাহাকে এমন করিয়া টানিতেছে? যে অপরূপ আলোর উৎসে স্নান করিয়া বিশ্ব এখন তাহার তরুণ দৃষ্টির দ্বারে অতিথির মত আসিয়া দাঁড়ায়, সে উৎস ত তাহার সঙ্গেই থাকিবে, তবে এ বিচ্ছেদকাতরতা কেন? কিন্তু মায়ের মুখে শিশুকালে যে গান প্রথমে শুনিয়া আমরা সঙ্গীত-লোকের প্রথম পরিচয় পাই তাহা চিরদিন কেন বিশেষ একটি মাধুর্য্য লইয়া আমাদের মনোজগতে বিরাজ করে? শৈশবে প্রথম যে খেলনাটি উপহার পাইয়া খেলার সাথীর প্রণয়কে বুঝিতে শিখিয়াছিলাম, কেনই বা সেটি পরবর্ত্তী বহুমূল্য উপহার হইতে প্রিয়তর হইয়া মনে জাগিয়া থাকে?

সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু সেদিন যেন আকাশের বুক ছাড়িয়া যাইতে কেবলই ইতস্ততঃ করিতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরবর্ত্তী পাহাড়বন ক্রমে কাজলে আঁকা ছবির মত গাঢ়বর্ণ ধারণ করিতেছে, তবুও একটুখানি বাসন্তী আলো কাছের গাছপালার গায়ে তখন ছিটাইয়া পড়িতেছে। ক্ষণিকা বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইল। বাড়ী ফিরিবার বিশেষ কোন ব্যস্ততা নাই, অন্ধকার হইয়া গেলে ফিরিলেই চলিবে।

পিছনে পায়ের শব্দে সে ফিরিয়া চাহিল। বেণু তাহার মামার হাত ধরিয়া ক্ষণিকার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কাছাকাছি আসিয়াই সে অনাদিনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্ষণিকার গায়ের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। "তুমি একলা কোথায় গিয়েছিলে মাসি, খাণ্ডুলিতে ?"

বেণুর মতে মাটির ঢিপিই হোক বা গৌরীশঙ্করের অভ্রভেদী শৃঙ্গই হোক সবই খাণ্ডুলি। তবে একান্ত তর-তমের বিচার করিতে হইলে "মস্তবড় খাণ্ডুলি" বলা চলে। ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "না, অন্ধকারে খাণ্ডুলিতে উঠ্‌লে যে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যাবে ? তা হলে কল্‌কাতা যাব কি করে ?"

বেণু তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিল, "কেন কদমের কোলে চড়্‌বে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা না হয় চড়্‌লাম, কিন্তু তুমি মোজা খুলে কি সব পুর্‌ছ ওর ভিতর ?"

মোজাসুদ্ধ হাতখানা পিছনে চালান করিয়া বেণু বলিল, "সোনা 'ঘুঁতি' খেল্‌বে, সে যে কাঁদ্‌ছে।" ক্ষণিকাকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই সে সেখান হইতে দৌড় মারিল।

অনাদিনাথ বলিলেন, "পরের দোহাই দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করাটা বেণু খুব সকাল-সকাল আরম্ভ করেছে। এটাও একটা বুদ্ধির ক্রমোন্নতির লক্ষণ নাকি? আমরা ওটা একটু পরে সুরু করেছিলাম।"

ক্ষণিকা বলিল. "অথবা অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু ধরিয়ে নেবার চেষ্টা। মানুষের আয়ু ক্রমেই কম্‌ছে, কাজেই ধীরেসুস্থে কিছু কর্‌বার আর সময় পায় না বোধহয়। তা না হলে বুদ্ধি যে আজকালকার লোকের, আগের কালকার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী তা ত দেখি না।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনারাও তাই বল্‌বেন? ছেলেদের অবস্থা ত অনেককাল থেকে একরকমই চল্‌ছে, কাজেই বুদ্ধির তারতম্য কিছু চোখে পড়ে না, কেউ অত করে চেয়ে দেখে না। কিন্তু আপনাদের এখন ভাঙাগড়ার সময়, অনেকরকম পরীক্ষা আপনাদের উপর দিয়ে হচ্ছে, ফলাফল জান্‌তেও প্রাচীনপন্থী নবীনপন্থী সকলেই উৎসুক, কাজেই ধরা পড়্‌বার কিছু থাক্‌লে ধরা পড়া উচিত।"

ক্ষণিকা বলিল, "বুদ্ধি বেড়েছে কি না জানি না, তবে সে সম্বন্ধে সচেতনতা খুব বেড়েছে। আগে মেয়েরা কাজে যেমন বাঁধা নিয়ম মান্‌ত, মনেও তেমনি মান্‌ত; এখন কাজে অবাধ্য হবার সাহস যদিও কম জায়গায়ই পায়, কিন্তু মনে

মনে যে মন্ত্র আওড়ায় তা একেবারেই মনুর সংহিতায় নেই।”

অনাদিনাথ বলিলেন, “হ্যাঁ, এটা আমিও বেশ বুঝতে পারি, যদিও নানাকারণে সংসারের ঠিক মাঝখান থেকে আমার একটু সরে যেতে হয়েছে। আজকালকার মেয়েদের ক্রিয়া-কলাপ বারব্রত করা সবই যেন কেমন প্রাণহীন হয়ে পড়্ছে, ওগুলো অনেকেই নিয়ম মানার খাতিরে বাইরে করে, কিন্তু হৃদয়ের যোগ না থাক্‌লে কোনো জিনিসের ভিতর শ্রী আসে না। এরকম করে করার চেয়ে না-করাটা ঢের ভাল। সেটা যারা করে তারাও যে না বোঝে তা নয়, কিন্তু অর্থহীন আচারকে ঝেড়ে ফেল্‌বার মত উৎসাহ বা সাহস সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমার বোন তখন বেঁচে ছিল, একদিন শ্বশুর-বাড়ীর এক বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে স্ত্রী-আচারের সময় যা দৃশ্য দেখ্‌লাম তাতে হাসিও পেল রাগও হল। বর জুতো স্থদ্ধ পিঁড়ির উপর উঠে দাঁড়াল, দুচারজন এয়োর পায়েও জুতো ছিল, তাঁরা সেগুলো তাড়াতাড়ি করে খুলে ফেলে দলে এসে ঢুক্‌লেন, কনে বরের পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ গল্প কর্‌ছিলেন, ইতিমধ্যে শুভদৃষ্টির তাড়া পড়াতে চট্‌ করে চাদরের তলায় ঢুকে একবার বরের দিকে কাজ সারা গোছ একটু চেয়ে

নিলেন। আমি মোটেই বলছি না যে আমাদের দেশের যত-গুলো আচার আছে সব ভাল বা সব ক'টা মেনে চলা উচিত, যদিও দুচারটা জিনিষ যে দেখতে আমার খুবই সুন্দর লাগে তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আগেকার দিনের লোকেরা এগুলোকে কাজে যেমন মানত মনেও তেমন মানত, তারা বড়জোর বোকা ছিল, কিন্তু আজকালের লোকগুলি যে একসঙ্গে বোকা, কাপুরুষ এবং ভণ্ড। তা ছাড়া সৌন্দর্য্য-বোধহীন বললেও বেশী বলা হয় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "অতখানি তাই বলে বলবেন না। কাজে অনেকে অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়, সাহসের অভাবে, তাই বলে মনেও যে অন্ততঃ মানে না, এটা কি ভাল নয়। মনেও ভাববার সাহস যে এতকাল ছিল না? এটা কি একটু লাভ নয়?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "হতে পারে, কিন্তু এই মাঝের সময়টা চোখ-কানকে বড় পীড়া দেয়। তা ছাড়া সামান্য দু-চারটা ফিরিঙ্গিয়ানায় মনের সাহস আছে তা কি করে বুঝব? বরং মনে হয় আগে যেমন ফ্যাশান বলে জুতো পরত না, এখন তেমনি ফ্যাশান বলেই পরছে, মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এরি সূত্রে আর-একটি দৃশ্য মনে পড়ে। এখানে বছর চার পাঁচ আগে সেটা দেখেছিলাম। পূজোর ছুটীর

সময় বেড়াতে এসেছিলাম। ঐ যে নদীর ধারে বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে ওতেই ছিলাম। সকাল বেলা একদিন বাজ্-নার শব্দে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ্লাম ঢাক ঢোল বাজিয়ে দলে দলে লোক নদীর ঘাটের দিকে এগোচ্ছে। দুটি মানুষ যে এই ব্যাপারটার কেন্দ্র তা দেখ্বামাত্র বুঝ্লাম—একটি স্ত্রীলোক, একটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটির পরিধানে শাদা কাপড় পথের ধূলায় গেরুয়া হয়ে উঠেছে, চুল খুলে মুখের চারিদিকে উড়্ছে, সে একবার করে সাষ্টাঙ্গে পথের উপর শুয়ে পড়ে প্রণাম কর্ছে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে সূর্য্যকে নমস্কার কর্ছে, আবার তখুনি ধূলোয় লুটিয়ে প্রণাম কর্ছে। বাড়ীর থেকে নদীর ঘাট অবধি সারা পথ সে এমনিভাবেই আস্ছে। পুরুষটি খুব সম্ভব তার স্বামী, পরনে বেশ ভাল নূতন কাপড় জামা, সে খানিকটা করে হেঁটে নিচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে দুচারটে গল্প গুজব করে নিচ্ছে, আবার থেকে থেকে এক একটা প্রণামও কর্ছে, তাও পাছে কাপড় জামায় ধূলো লেগে যায় এই ভয়ে সঙ্গীরা সাম্নে চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জান্লাম যে, স্বামীর অসুখের জন্যই স্ত্রী মানত করেছিল যে অসুখ সার্লে সে সারাপথ বুকে হেঁটে নদীর ঘাটে পূজো দেবে। সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্লাম, মনে হল আমাদের সমাজের বর্ত্তমান আর অতীত যেন মূর্ত্তি ধরে এই

স্ত্রী-পুরুষরূপে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। সে পুরুষটার চেহারা আমার একেবারেই মনে নেই, শাদা-কাপড়-মোড়া একটা অস্থিমাংসের স্তূপ এই মনে পড়ে, কিন্তু মেয়েটির মুখ এখনও যেন চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। সে মুখ সুন্দর যে খুব তা নয়, কিন্তু বিশ্বাস আর নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব সুন্দর লেগেছিল।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মনে মনে রাগ তাহার ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছিল। এত কথার কি দর্‌কার? ইহা কি শুধুই গল্প করার খাতিরে কথা বলা, না তলায় আর কিছু আছে? নানারকম ছবি আঁকিয়া অনাদিনাথ তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছেন কি? প্রাচীন রীতিনীতি সামাজিক অবস্থা এ-সকলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে ইহাই কি জানাইতে চান? সে ত অনেকেরই আছে, অবশ্য অল্প-বিস্তর পরিমাণে। ফিরিঙ্গিয়ানা পছন্দও সকলে করে না, ক্ষণিকা নিজেও করে না, কিন্তু অনাদিনাথের মুখে হিন্দু কুলবধূর জুতা খুলিয়া স্ত্রী-আচারে যোগ দিতে যাওয়ার গল্পে তাহার রাগ হইল কেন? কোথায় কি যে তাহাকে আহত করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিল না, কিন্তু আঘাতটা এমনই বাস্তব যে তাহাকে উপেক্ষাও করিতে পারিল না।

চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, "আপনার মতে অন্ধবিশ্বাসই তা হলে মেয়েদের সবচেয়ে মানায় ?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "একেবারেই না। বিশ্বাস, নিষ্ঠা, এগুলি তাদের খুব মানায়, অন্ধতা মূঢ়তা ভেদ করেও তার সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। কিন্তু এর উপরে যদি পূর্ণবিকশিত বুদ্ধির আলো পড়ে তাহলে সে যে আরো কত সুন্দর হয়।"

ক্ষণিকার রাগ তখনও যায় নাই। সে বলিল, "অনেকে ত বলেন বুদ্ধির চর্চ্চা করতে গিয়ে মেয়েদের নিষ্ঠা বিশ্বাস সবই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ও দুটো জিনিষ নাকি একসঙ্গে থাকেই না।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "যাঁরা বলেন তাঁদের নিজেদের বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ করা যেতে পারে। তা ছাড়া স্বার্থরক্ষার খাতিরে বাজে কথা মানুষ চিরকালই বলে।"

আলোর রেখা আকাশ হইতে ইতিমধ্যে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল। এই বিজন অন্ধকার নদীতটে দুটি মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। চারিদিক ক্রমেই কালিমার স্রোতে মিশিয়া আসিতেছে, উশ্রীর নির্ম্মল জল থাকিয়া থাকিয়া তাহারি মধ্যে ভূতলশায়িনী সৌদামিনীর মত ঝক্‌ঝক করিয়া উঠিতেছে। হঠাৎ অনাদিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "আপনি হয়ত আমাকে ভুল বুঝলেন।

কিন্তু জান্‌বেন এটা আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনিও ঐ সূর্য্য-উপাসিকার মত কিম্বা তার চেয়েও বেশী নিষ্ঠা দেখাতে পার্‌বেন। হিন্দুর মেয়ে স্বামীকে ভালবাস্‌তে বাধ্য, স্বামী ছাড়া তার আলাদা অস্তিত্ব নেই, সে তার স্বামীর জন্য যতটা করে, যে মেয়ে স্বেচ্ছায় নিজের স্বামীকে বরণ করেছে, যার আলাদা অস্তিত্ব আছে বলেই যার স্বামীর সঙ্গে মিলন বেশী নিবিড়, সে কেন তার চেয়ে বেশী পার্‌বে না? পশুর ভালবাসার চেয়ে মানুষের ভালবাসা ঢের বড় জিনিষ; যার মনুষ্যত্বের বিকাশ যতখানি হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি তার প্রেম তত বেশী গভীর হয়, তত বেশী আত্মত্যাগে সক্ষম হয়।"

ক্ষণিকার বুকের ভিতরটা ছুলিয়া উঠিল। সে পারিবে, একথা সে নিজে নিশ্চিতরূপে জানে। কিন্তু অনাদিনাথের কাছে তাহা ধরা পড়িল কি করিয়া? তিনি কি করিয়া বুঝিলেন যে এই স্বল্পভাষিণী নারী, যে নিজেকে সযত্নে গোপন করিয়া রাখিতে চায়, তাহার মনের কোণে কোথায় কি শক্তির ভাণ্ডার আছে? কি করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে যাহাকে অন্তঃসলিলা ফল্গু বলিয়াই সকলে জানে, বর্ষার দিনে তাহাই বিপুল বেগশালিনী মহানদীর আকার ধরিতে পারে?

অন্ধকারে ক্ষণিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মুখে কিছু বলিবার সে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া অনাদিনাথের কথার উত্তর বাজিয়া উঠিল, "ভগবান যদি দিন দেন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব যে আপনার বিশ্বাস বৃথা নয়।"

বাড়ী ফিরিবার পথে কেহ আর একটিও কথা বলিলেন না। অনাদিনাথ কথা বলিলেও ক্ষণিকা তাহার উত্তর দিতে পারিত কি না সন্দেহ। তাহার হৃদয়ে যেন জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছিল। জীবনের যত রিক্ততা, যত দীনতা, এই কয়টি কথার তলায় কোথায় হারাইয়া গেল? ক্ষণিকার চোখের সম্মুখে সহসা যেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার কোন্ যাদুকরের স্পর্শে মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল। তাহার আর চাহিবার যেন কিছু রহিল না, পাইবার কিছু রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া সহসা সে সচেতন হইয়া অনুভব করিল তখনও তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে।

পরদিন আর কিছু বলিবার বা ভাবিবার অবকাশ সে পাইল না। যাত্রার আয়োজন করিতে এবং সকলকে সে সম্বন্ধে ক্রমাগত সচেতন করিয়া, যথাকালে নাওয়া খাওয়াটা তাহাদের দ্বারা শেষ করাইয়া লইতেই তাহার দিন কাটিয়া গেল।

গৃহিণীর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়, পাছে যাইবার তাড়ায় কেহ জলের কুঁজাটা ফেলিয়া যায়। তিনি সর্ব্বক্ষণ ক্ষণিকাকে সাবধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "দেখ বাছা, যেন তাড়াতাড়ি করে কুঁজোটা ফেলে যেও না, শেষে এগুবাচ্চা সব গলা শুকিয়ে মরবে।" যেন চিরকাল ক্ষণিকা ঐ অপরাধটা করিয়া আসিতেছে, কেবল গৃহিণীর অসাধারণ দক্ষতা ও তৎপরতায় এ পর্য্যন্ত কেহ পিপাসায় বুক ফাটিয়া মারা যায় নাই।

গাড়ীতে উঠিবার সময় দুইটা কুঁজা দেখিয়া তিনি খুসি হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, একটা বরং বেশী থাকা ভাল, পথে ঘাটে ভেঙেও ত যেতে পারে। দুটোতেই জল ভরিয়ে নিয়েছ ত?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, একটাতে ফোটানো জল আছে আর-একটাতে এমনি। আপনি যে আবার জল ফুটনো হলে খেতে চান না।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "এতও বাছা তোমার মনে থাকে। জন্মাবধি অনাদি এই জল ফোটানো নিয়ে ঝগড়া করছে, তা দেশেই বল আর এখানেই বল। কিছুতে যদি আমার মনে থাকে। পঞ্চা মুকুন্দ ওদেরও কত বলি, তা হতভাগারা কোনো কথা কি মন দিয়ে শোনে? তুমি সে-

দিনের মেয়ে, খুব কিন্তু পাকা গিন্নি হয়েছ ; আমরা যে এসে অবধি সংসার করছি, অতটা পারি না।"

ক্ষণিকার কানে গৃহিণীর কথাগুলি প্রবেশ করিল বটে কিন্তু মনে বেশী আমল পাইল না। কিছুদিন আগে অলিভ শ্রীনারের একখানি উপন্যাসের কয়েকটি কথা তাহার বড় মনে লাগিয়াছিল, সেই কথা কয়টিই তাহার মনে কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল—

"Experience teaches us in a millennium what passion teaches us in an hour. A Kaffir studies all his life the discerning of distant sounds, but he will never hear my step, when my love hears it, coming to her window in the dark, over the short grass."

( ১৪ )

সকালবেলাটা প্রায় সকল মানুষেরই কাজের হুড়াহুড়ির মধ্যে কাটে। অন্ততঃ কলিকাতার সহরে প্রাপ্তবয়স্ক এমন পুরুষ বা নারী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়, চোখ চাহিয়াই যাহার মন উদয়োন্মুখ তপনের সহিত মিলনের আশায় পুলকিত হইয়া ওঠে। উষার রক্তিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী মনোযোগ পায় সেই হতভাগা ছেলেটা, মুখ

ধুইয়াই যাহাকে জিওমেট্রি পড়াইতে যাইতে হয়, অথবা ভিজা কয়লা বা ঘুঁটে, যাহার সাহায্যে দৈনিক সংসারের বাষ্পীয় শকটের রসদ জোগাড় করিতে হয়। যে দুচারজন লক্ষ্মীমন্ত মানুষের এ-সকলের বালাই নাই, তাহাদের ভোরে উঠিবার উৎপাতও নাই। সাধারণ মানুষগুলির সাধারণ নিয়ম এই— তাহারা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াই একপালা কাজের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাইয়া তাহার পর আটটা সাড়ে-আটটার সময় একটু একটু হাঁফ ছাড়িবার অবসর খুঁজিয়া পায়। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে আবার কাজের হাটে তাহাদের ডাক পড়ে, কিন্তু এই সময়টুকু প্রায়ই ইচ্ছা-মত ব্যয় করা চলে।

সকালের চায়ের পালা সাঙ্গ করিয়া, বাজারের পয়সা দিয়া গৃহিণীর আহ্নিকের এক রকম ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষণিকা এত-ক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। মালী তখন সবে গাছে জল দেওয়া সুরু করিয়াছে। সেও বাত রোগে ভোগে, এই কারণে অনাদিনাথের মাতার তাহার প্রতি একটা বিশেষ করুণা আছে। সকালে উঠিতে না পারিলে তাহাকে শাসন করিবার সাহস ঐ কারণে এ বাড়ীতে কাহারও নাই।

নবরোপিত কতগুলি চারাগাছের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নীচে যাইবার ক্ষণিকার একটু প্রয়োজন ছিল। আবার

অর্দ্ধপঠিত একখানা উপন্যাস তাহাকে নিজের শয়নকক্ষের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছিল। কোন্ দিক রক্ষা করিবে ভাবিয়া ক্ষণিকা যখন ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় পঞ্চা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, তেওয়ারী বুড়ো নীচে এসে তখন থেকে বসে আছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "তা আমি কি কর্‌ব, বাবুর কাছে খবর দাও।"

পঞ্চা বলিল, "বাবু এই মাত্তর যে লিখ্‌তে বস্‌লেন।"

অনাদিনাথের এই সময়টা ছিল তাঁহার নিজস্ব কাজের সময়। পরের বেগার খাটিতে বা তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিতে তাঁহাকে দিনের মধ্যে বেশ খানিকটা সময় খরচ করিতে হইত, কিন্তু এই সকাল-বেলাটার উপর হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। চাকর-বাকরেও অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে ইহা জানিতে পারিয়াছিল যে গৃহস্বামীর অন্য-অনেক কথা অবহেলা করিয়া স্বচ্ছন্দে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় বটে কিন্তু এ সময়ে তাঁহার কাছে গিয়া গোলমাল করাটা একান্তই চলে না। ক্ষণিকা তাহা জানিত, কাজেই বলিল, "তাকে ও বেলা আস্‌তে বলে দে না, অসময়ে আসে কেন?"

পঞ্চা বলিল, "দশবার কম হলেও বলেছি, শুন্‌বে না

কোন-মতে। আজ পাঁচটাকা না পেলে তার একেবারে নাকি সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।"

এই তেওয়ারীটি অনাদিনাথের পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্য। পেন্সন হিসাবে এখনও সে মাসে পাঁচ সাত টাকা পায়, এবং তাহা আদায়ের আগ্রহে মাসের মধ্যে পনেরো দিন কলিকাতাতেই কাটাইয়া দেয়।

ক্ষণিকা কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। পঞ্চার দেরী দেখিয়া তেওয়ারী লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিয়া সশব্দে কাঁদিয়া উঠিল, "এ মা, হামার সর্ব্বোনাশ হয়ে গেল।"

ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "চুপ কর, অমন করে চেঁচিও না, আমি বাবুকে বল্‌ছি।" পঞ্চা ও তেওয়ারীকে সেইখানে দাঁড় করাইয়া সে দ্রুতপদে অনাদিনাথের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

একরাশ লম্বা, চওড়া, লাল, নীল বইয়ের মধ্যে বসিয়া অনাদিনাথ তখন গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা কাজে ব্যস্ত। খোলা দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ক্ষণিকা কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না কি উপায়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। অনাদিনাথকে ডাকিবার কোনো প্রয়োজন এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ হয় নাই, হইলেও অন্যের সাহায্যে সে-

সব ক্ষেত্রে কাজ উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু সুবিধামত একটি লোকও যে কাছে নাই, বেণু উপরের ঘরে সোনা-মোনার তদারক করিতে ব্যস্ত। অগত্যা কণ্ঠস্বর যেখানে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিল না সেখানে সে চরণশব্দেরই শরণ লইল।

ঘরে মানুষ ঢুকিবার শব্দে অনাদিনাথ অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ফিরিয়া তাকাইলেন। কিন্তু ক্ষণিকার উপর চোখ পড়িতেই তাঁহার মুখ হইতে বিরক্তির চিহ্ন মাত্র লুপ্ত হইয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দর্‌কার আছে?"

ক্ষণিকা মনে মনে বলিল, "বিনা দর্‌কারে আস্‌বার সাহসও নেই অধিকারও নেই।" মুখে বলিল, "তেওয়ারী এসে টাকার জন্যে ভয়ানক কান্নাকাটি কর্‌ছে, না হলেই তার চল্‌বে না।"

অনাদিনাথ সাম্‌নের দেরাজ হইতে টাকা বাহির করিতে করিতে বলিলেন, "যতদিন কাজ করে তাকে টাকা উপার্জ্জন কর্‌তে হয়েছিল তখন এত তাগিদ দেবার সাহস ছিল না, এখন বিনা শ্রমে পায়, কিন্তু চাইবার সাহস ঢের বেড়েছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "যেখানে চাইলে পাওয়া নিশ্চিত সেখানে সাহসের অভাব কেনই বা হবে?" কথাটা বলিয়াই কিন্তু

তাহার আপ্‌শোষ হইল, খুব নির্লজ্জের মত শুনাইল নাকি ?

অনাদিনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা ঠিক। আমিও কিছু চাইবার উপক্রম কর্‌ছি, কিন্তু পাব কি না ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

ক্ষণিকার বুকের ভিতর হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন আছাড় খাইয়া পড়িল। সম্ভব, অসম্ভব, আশার অতীত, কত কি যে তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। অন্তরের শিহরণটা যেন দেখিতে দেখিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

উপর হইতে বুড়া তেওয়ারীর কাতরকণ্ঠ তাহাকে খানিকটা তবু আপনাতে ফিরাইয়া আনিল। অনাদিনাথের হাত হইতে টাকা কয়টা লইয়া বলিল, "ওকে দিয়ে আসি ?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিলাম দেখ্‌ছি। আমার এত বয়স হল, কিন্তু এখনও কেমন করে যে মানুষের সঙ্গে কথা বল্‌তে হয় তা শিখ্‌লাম না। ইংরেজীতে কথা বলায় একটা সুবিধা আছে, তাদের কথাগুলোর খুব কাটা ছাঁটা মানে, এক বল্‌লে আর-এক বোঝায় না। আমাদের ভাষাটা এমন যে অর্দ্ধেক কথারই যা মানে তা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করে নিতে বেশ পারা

যায়। 'ফেভর' বল্‌তে ওরা যা বোঝে, বাংলায় কি বল্‌লে যে তা বোঝা যায় তা কিছুতেই ঠিক কর্‌তে পারি না। অনুগ্রহ বলা যেতে পারে, কিন্তু তাতেও যে বিশেষ ঠিক বোঝায় তাও নয়। কিন্তু ওদিকে তেওয়ারীর কণ্ঠ যে সপ্তমে উঠ্‌ছে।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তেওয়ারী তখন সিঁড়ির মাঝামাঝি নামিয়া আসিয়াছে, তাহার হাতে টাকা কয়টা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "যাও এখন তোমার বক্‌বকানি আমি শুন্‌তে পার্‌ব. না, নীচে যাও।"

তেওয়ারী চলিয়া যাইতে সে সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়া দুইহাতে রেলিংগুলা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার জগৎ যেন কেমন ওলট্‌পালট্‌ হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ভুল বুঝিয়াছিল, সেই অবসরে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণিমা-উদ্বেল সাগরের ঢেউয়ের মত কোন্‌দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিতে ত নিজের তাহার বাকি নাই। কিন্তু হায় নির্ব্বোধ, প্রাণ দিয়া চাহিতে পারাই কি পাইবার অধিকার দেয়? পৃথিবীতে নিত্য কি এই কেবল দেখা যায় না যে একান্ত সাধারণ সুলভ জিনিষ যা, তাহাও তৃষ্ণার্ত্তের চোখের সম্মুখে মরুমরীচিকার মত মিলাইয়া যায়? চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার মিলন এজগতে কোথায়?

কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার অবসর ত সংসার অধিক দেয় না। ক্ষণিকা কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠিয়া পড়িয়া আবার নীচে নামিয়া গেল। এবার আর তাহাকে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উপায় ভাবিতে হইল না। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনার অবসর বলে জিনিষ খুবই কম বোধ হয়, তার মধ্যেও যদি একটু ভাগ বসাতে চাই তাহলে কি রাগ করবেন? অবশ্য এটা জিজ্ঞাসা করাই আমার অন্যায়, রাগ করলেও ভদ্রতার খাতিরে সত্যকথা সব সময় বলা যায় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তা পারব, আমি সত্যিই বলছি, আমি একটুও রাগ করব না। এ সময়টা আমি কি করে কাটাব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না।"

কাজটা শক্ত না হইলেও অন্য সময় ক্ষণিকা নিশ্চয়ই সেটাকে প্রীতিকর ভাবিত না। সকাল বেলা বসিয়া বসিয়া রাজ্যের Census report ঘাঁটিয়া statisticsএর অঙ্ক কষা বা সাত জন্ম আগে কে কবে কোন্ দেশের মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রতীকার সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, ছেঁড়া বই হইতে তাহা নকল করা, কোনো তরুণীর পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক হইবার কথা নয়। কিন্তু সময়-বিশেষে মত যে

বদ্‌লায় তাহা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিয়া গিয়াছেন, সে গান তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে মনে মনে গাহে নাই এমন মানুষই বা ক'টা আছে?

অনাদিনাথ ক্ষণিকাকে কাজ আগাইয়া দিয়া আবার আপনমনে নিজের কাজে ডুবিয়া গেলেন। ক্ষণিকার কাজ কিন্তু অত নির্ব্বিবাদে মোটেই হইতে চাহিল না। একে ত মন কেবলি তাহার অবাধ্যতা করিতে লাগিল, বুকের কম্পন তখনও থাকিয়া থাকিয়া কেবলই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু না পাওয়াটা স্ত্রীলোকের জন্মাবধি এমন অভ্যস্ত জিনিষ যে অতি বড় নিরাশার আঘাতকে গোপন করিয়া ফেলিতেও তাহার খুব বেশী সময় লাগে না। কাজেই ক্ষণিকা মনে মনে যাহাই ভাবুক না কেন, তাহার হাতের কাজে বেশী কিছু ভুল হইল না।

খানিকক্ষণ পরে অনাদিনাথ হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হয়ে গেল এরি মধ্যে আপনার? দেখি?"

ক্ষণিকা কাগজের তাড়া তাঁহার হাতে দিয়া একটু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে অনাদিনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অনাদিনাথ যখন বলিলেন, "সব কাজই দেখ্‌ছি আপনি সমান ভাল করে কর্‌তে পারেন," তখন সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু এ ঘরে অনাদিনাথের সাম্‌নে

বসিয়া থাকিতে তাহার আর একটুও ইচ্ছা করিতেছিল না। কাজ চুকাইয়া দিয়াই সে নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। স্নানাহারে সেদিন আর তাহার একটুও রুচি রহিল না। অনাদিনাথ দশটার সময়ই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া যান। কাজেই তাহার ইচ্ছামত কাজ করার পথে বাধা দিবার কোনও লোক বাড়ীতে না থাকাতে সে নিরুপদ্রবে ঘরের কোণে সারা দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দিল।

ভাগ্যের প্রতি এবং নিজের প্রতি একটা তীব্র রোষ থাকিয়া থাকিয়া যেন তাহার বুকের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অভিমানে, ক্ষোভে, লজ্জায় মিলিয়া তাহার হৃদয়টাকে ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। বেশ ত সে এক রকম ছিল। নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোল ছাড়াইয়া কোন্ কুগ্রহ তাহাকে এই প্রখর দিবালোকদীপ্ত জাগরণের হাটে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল? পৃথিবীকে যে আড়াল হইতে আব্ছায়ার মত দেখিয়া চোখে বড় ভাল লাগিয়াছিল, আড়াল চূর্ণ করিয়া দিল কে? নিজের অন্তর তাহার কাছে যে অবগুণ্ঠিতা বধূর মত এতদিন অজানা ছিল, আজ সেই লাজ-আববণ কাড়িয়া লইল কে? নিজের ভিতর এতখানি অকাঙ্ক্ষা, এত প্রবল বাসনা যে ছিল, তাহা ত সে

স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবে নাই, কিন্তু ইহারা যে তাহারই হৃদয়ে জন্মলাভ করিয়া, তাহারই হৃদয়রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ইহা ত সত্য।

ক্ষণিকা আপনার তরুণ জীবনে প্রেমের দূতকে যে বেশে কল্পনা করিয়াছিল, আজ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া দেখিল কল্পনার সহিত বাস্তবের সাদৃশ্য কোথাও নাই। এ ত পুষ্প-বিভূষিত কোমল কিশোরমূর্ত্তি নয়, ইহার নয়নে ত প্রেমের আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টি নাই? এ যেন মহাকালের রুদ্রমূর্ত্তি, চক্ষে প্রলয়ের অগ্নিশিখা, হস্তে বিনাশেরই অস্ত্র। কিন্তু এই ত মনকে আরো বেশী করিয়া হরণ করিয়া লইল; ইহাকে যে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্ব্বহারা হইতেই অন্তর আকুল হইয়া উঠে? পাইবার আকাঙ্ক্ষা ইহার সম্মুখে লজ্জায় যে মরিয়া যাইতে চায়; কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও যে মনে জাগিয়া ওঠে যে ইহার হাত হইতে পাওয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। কিন্তু কে সে সৌভাগ্যবতী যে সেই অমূল্য দানের অধিকারিণী হইবে? সে ক্ষণিকা নয়। নিজেকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলাইতে আর কি ইচ্ছা করে? কিন্তু দিন কাটিবে কেমন করিয়া? এই নবজাগ্রত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার রাশি লইয়া কেমন করিয়া সে লোকের কাছে আপনাকে গোপন করিয়া বেড়াইবে? সমস্ত প্রাণ যাহার হাহাকার করিয়া

লাগ্‌ল যে আমি ভাব্‌লাম হয়ত আপনার কোনো কাজের কথার জন্য ওকে পাঠিয়েছেন, ও সেই অবকাশে নিজের কাজের ব্যবস্থাটা আগে করে নিচ্ছে।"

ক্ষণিকাকে ইহার উত্তরে কিছু বলিবার সুযোগ মাত্র না দিয়া অনাদিনাথের মাতা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, অনাদি, বেণুর চেয়ে আমার ভুবনের রং অনেক ফর্‌সা ছিল, নয়? বিয়ের সময় ওঁর এক বড়সাহেব এসেছিল, সে বলেছিল না যে এমন মেয়ে আমাদের ঘরেও নেই? অথচ তোর বাপ ছিলেন তোরই মত শ্যামবর্ণ, কোথা থেকে যে মেয়ে আমার অমন হল তাও জানি না।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "তা ছিল বটে, সাহেবের কথা আমার মনে নেই। শুনেছি আমার ঠাকুরমা খুব সুন্দরী ছিলেন, তাঁরই মত হয়েছিল হয়ত ভুবন।" আর বোধ হয় তাঁহার গল্প করার প্রয়োজন ছিল না, তিনি আপনার কাজে প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণিকা এতক্ষণে চাহিয়া দেখিল যে তাহাদের গল্পের ফাঁকে বেণু যে কখন উঠিয়া পালাইয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। মামার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কাটা বোধহয় তাহাকে বড় বেশীরকম পীড়িত করিয়া

তুলিয়াছিল তাই সে আগে থাকিতে বিপদের প্রতীকার করার চেষ্টায় প্রস্থান করিয়াছিল।

গৃহিণী আর কিছুক্ষণ তাঁহার পরিবারের জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদিগের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া উঠিয়া গেলেন। বেণুর সন্ধান মিলিবার তখন বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না, আর সন্ধান পাইলেও যে সে আবার লেখাপড়া করিতে রাজী হইবে এমন কোনো আশা ছিল না। অতএব বই শ্লেট সব তুলিয়া ফেলিয়া শেলাই বাক্সে বন্ধ করিয়া সে বৈকালিক কাজের আয়োজন আরম্ভ করিল।

পৃথিবী বাস্তবিক অদ্ভুত জায়গা। এখানে ক্ষণে ক্ষণে সব কিছুরই চেহারার এমন বদল হইয়া যায় কেমন করিয়া? অথচ যুক্তিতর্ক করিয়া বুঝিতে গেলে বোঝা যায় যে কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনই আছে। কিন্তু সারা দিনরাত্রের মধ্যে যুক্তিতর্ককে মানুষ কতটুকু সময়ই বা দিতে পারে? মানুষের দেখা শোনা সবই যে পথে সচরাচর চলে, যুক্তি সে পথে চলে না। কোন্ অচেনা লোকের বর্ণভাণ্ডার হইতে কখন কি রং আসিয়া আমাদের চোখে লাগে, তাহার ভিতর দিয়া যাহা কিছু দেখি কিছুই আর বর্ণহীন কুরূপ থাকে না। মনে হয় সৌন্দর্য্যের অক্ষয় উৎসে এখনি যেন দৃশ্যমান জগৎ স্নান করিয়া উঠিল। কিন্তু

মরিতেছে, সে কেমন করিয়া সংসারের প্রকৃতিস্থ পাঁচটা মানুষেরই মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে ?

কিন্তু যে ভাগ্যকে সে এতক্ষণ আপনার পীড়িত হৃদয়ের আক্রোশে অভিশাপ দিতেছিল, সেই ভাগ্যই অলক্ষ্যে তাহার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিল। বিকাল হইতেই একতাড়া চিঠির মধ্যে লালুর একখানা চিঠি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের পিতার অসুখ আবার বাড়িয়াছে, মাতার জ্বর হইয়াছে। ক্ষণিকার অবিলম্বে আসা প্রয়োজন।

তাহার ব্যথাকাতর মন আবার যেন একটা নাড়া পাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। সংসারে কেবল একপ্রকার দুঃখই ত ভগবান তাহার কপালে লেখেন নাই। যাহা কেবল একান্ত আপনার দুঃখ, তাহাকে ত বহন করিতেই হয়, বিশ্বসংসারে সে ভারের ভাগ বহন করিতে আর কেহই নাই। মানুষের সকলের চেয়ে দুঃখের দিনেই সে সবার চেয়ে একলা, সান্ত্বনার স্পর্শ এরাজ্যে আসিতে পথ পায় না। সেটা একদিকে নিষ্কৃতিও বটে, অবুঝ মানুষের অযথা কোলাহলে পীড়িত মনের পীড়া যে আরও শতগুণ বাড়িয়া উঠে। একান্ত একলার ধন বলিয়া অন্তরে যে দুঃখ অগ্নিশিখার মত জ্যোতির্ময়, তাহাই সংসারের ব্যগ্র কৌতূ-

হলের হাটে যখন টানিয়া আনা হয়, তখন তাহাকেই অঙ্গার-খণ্ডের মত কালিমাময় বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু কেবল একলা হইয়াই ত মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই? পরিবারের, সংসারের, সমাজেরও যে সে অংশ। তাহাকে সংসারের দুঃখের একটুখানি অংশ অন্ততঃ বহন করিয়াই চলিতে হয়। ক্ষণিকাকে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে হইল। যে ঘর সেদিন অবধি তাহার সকল স্নেহ ও প্রেমের নীড় ছিল, আজ সেখানে যাইবার কথায় তাহার মন যে বিচ্ছেদের ব্যথায় আকুল হইয়া উঠিবে এ কথা কে কবে ভাবিয়াছিল?

গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "তা যেতে হবে বই কি। মা-বাপের অসুখ, এ ত আর যে-সে নয়? তা বাছা, দেখ্‌ছ ত কিরকম অথর্ব হয়ে পড়েছি, মা-বাপকে ভালয় ভালয় রেখে ফিরে এসো যত শিগ্‌গির পারো। কখন যাবে, কার সঙ্গে যাবে?"

ক্ষণিকা বলিল, "কিছুই ঠিক করিনি, এই মাত্র ত খবর পেলাম। একবার চিন্ময়দার কাছে খবর দিতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই চিঠি লিখে দাও। এ-সব কাজ একজন পুরুষমানুষ না হলে কখনো হয় না। অনাদি যে

আজ কখন আস্‌বে, তার ঠিক নেই, যা ক'দিন থেকে দেরি কর্‌তে আরম্ভ করেছে।"

ক্ষণিকা ফিরিয়া গিয়া চিন্ময়কে চিঠি লিখিতে বসিল। অদ্ভুত এই সংসার। যাহাকে দিবার বেলা হাত গুটাইতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না, চাহিবার বেলা তাহারি কাছে হাত পাতিতে হয় সবার আগে। আর যাহাকে সব দিতে মন ব্যস্ত, তাহারই কাছে চাহিবার নামে সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেই বা ইচ্ছা হয় কেন ?

কলিকাতায় ফিরিবার পর চিন্ময়ের সঙ্গে মাত্র দুইবার দেখা হইয়াছে। তাহারা আসিয়াছে শুনিয়াই সে একদিন মাধবী ও মেনকাকে লইয়া আসিয়াছিল। সেদিন ত ভ্রমণকাহিনী আর বাজে কথা বলিতেই সময় কাটিয়া গেল। আর একদিন সে একলাই আসিয়াছিল। কিন্তু আগেকার মত গল্প করা এখন যেন আর সহজ ছিল না। যে বাধাকে তারা মুখে অস্বীকার করিত, অন্তরে তাহাই পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া উঠিয়া দুজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত। একবার চিন্ময় বলিল, "তোমাকে যতটা ভাল দেখ্‌ব ভেবেছিলাম তা ত কৈ দেখ্‌ছি না।"

ক্ষণিকা বলিয়াছিল, "গিরিধি আর এমন কি অপূর্ব্ব ভাল জায়গা যে খুব ভাল হয়ে উঠ্‌ব ?"

চিন্ময় উত্তরে বলিল, "জায়গার কথা বল্‌ছিলাম না।"

চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া ক্ষণিকা নীচে নামিয়া বাগানের মধ্যে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কাজকর্ম্ম করিবার মত অবস্থা আর তাহার দেহ-মনের ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যতই ঘন হইতেছিল, তাহার হৃদয়ের ভারও ততই বাড়িয়া চলিতেছিল। এই তাহার সম্মুখে অসীমবিস্তৃত দুঃখের সাগর, ইহার কূল সে কবে পাইবে? আনন্দ কি তাহাকে আলেয়ার মত কেবল চকিতে দেখা দিয়া, কেবল পথ ভুলাইয়াই অদৃশ্য হইল? অনাদিনাথের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি নামিয়া উপরে চলিয়া গেলেন, সবই সে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার আর শক্তি নাই। সংসারের স্রোতে তাহাকে যেদিকে খুসি টানিয়া লইয়া যাক, সে বাধা দিবে না। নদীর দুই তীরই যখন কণ্টকাচ্ছন্ন, তখন যেদিকে হোক তাহাকে আছ্‌ড়াইয়া ফেলুক, তাহার তাহাতে কিছু আসে যায় না। অনাদিনাথকে তাহার যাইবার বিষয় সব কথা বলা উচিত, কিন্তু পা তাহার চলিতে চাহিল না।

অনাদিনাথ স্বয়ংই তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অগত্যা তখন ক্ষণিকাকে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই হইল। তাহার ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া অনাদিনাথের মনও যেন পীড়িত হইয়া উঠিল। দুঃখের বোঝা

বহিবার জন্যই কি ইহার সৃষ্টি ? যাহার নিজেরই পরের সস্নেহ আশ্রয়ে দিন কাটাইবার বয়স, তাহারই উপরে সমস্ত সংসারের ভার আসিয়া চাপিল ?

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডাক্‌ছিলেন ?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "মায়ের কাছে সব শুন্‌লাম। আপনি যতদিন দর্‌কার, বাড়ীতে থাক্‌বেন, আমাদের অসুবিধার কথা ভাব্‌বার কিচ্ছু দর্‌কার নেই। আমাকে দিয়ে কোনও রকম কিছু উপকার হয় যদি তবে নিশ্চয় সঙ্কোচ না করে বল্‌বেন।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল। অনাদিনাথের কথার উদ্দেশ্য সে ইচ্ছা করিয়া ভুল বুঝিল। সত্যই ত, সে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। কে বা এখানে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে ? এখানে সে উচ্চদরের দাসী বই আর কিছু নয় ত ? টাকা দিলেই আর-একটা দাসী মিলিবে এখন।

বালক যেমন যে খেলনার জন্য আব্দার করে তাহার বদলে অপর কোনো খেলনা দিতে গেলে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া ওঠে, ক্ষণিকারও ঠিক তেমনি দশা হইল। অনাদিনাথের স্নেহকে সে জোর করিয়া অবহেলা মনে করিয়া, কাঁদিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। তাহার ক্ষুব্ধ মন কেবলি বলিতে লাগিল, "আমার দর্‌কার নেই, কিছু আমি চাই না।"

চিন্ময় খানিক পরে আসিয়া পৌঁছিল। ক্ষণিকার মুখ দেখিয়া বলিল, "এরি মধ্যে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে বসে আছ? এইরকম শক্ত মন নিয়ে তুমি সংসারে টিঁকবে কি করে?"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি কি টিঁকতে চাইছি? আমায় জোর করে যিনি টিঁকিয়ে রাখ্‌ছেন তিনিই সে ভাবনা ভাব্‌বেন, আমি আর পারব না।"

চিন্ময় বলিল, "এখন তত্ত্বকথা বা কবিত্ব কিছু শোন্‌বার সময় নেই। টাইম্‌-টেব্‌লটা একমাত্র আলোচনার বিষয়। কাল আট্‌টায় যেতে হবে এই মনে করে সব ঠিক করে রেখো, আমি মিনুকে নিয়ে একেবারে ষ্টেসনে যাব।"

ক্ষণিকা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "চিন্ময়দা, যখনি দর্‌কার হয়, বিপদে পড়ি, তোমাকে জ্বালাতন কর্‌তে আমার একটুও বাধে না, তুমি যে আমাকে কি মনে কর জানি না।"

চিন্ময় হাসিল। হাসিয়া বলিল, "তোমাকে কি মনে করি সব যদি বল্‌তে বসি, শুনে তুমি খুসি হবে না। তবে বিপদের দিনে ডাকো বলে দুঃখিত যে হই না এটা জেনে রাখো। এত-কাল পৃথিবীতে থেকে এইটুকু শিখেছি যে সুখটা খুব সম্ভব

কল্পনা, দুঃখটাই খাঁটি বাস্তব। কল্পনার রাজ্যের বদলে বাস্তবের মধ্যেই যে জায়গা পেয়েছি তাতে রাগ করিনি। আচ্ছা, আমি এখন আবার মিনুকে একটুখানি প্রস্তুত করে আসি।"

ক্ষণিকা পরদিন সকালে বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। অনাদিনাথ বলিলেন, "আমি আপনাকে দিয়ে আসব ষ্টেশন অবধি, আমার কোন অসুবিধা হবে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "না, না, থাক, আপনাকে যেতে হবে না।"

অনাদিনাথ তাহার ব্যগ্রতায় বিস্মিত হইয়া আর কিছু বলিলেন না। যাইবার বেলায় সে যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখনও হস্তের স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করা ভিন্ন তিনি আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইলেন না। ক্ষণিকার মনের অসাধারণ ব্যথিত অবস্থাটা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কারণটা সব বোঝেন নাই। কথায় মানুষের ব্যথা যে কমে না, তাহা জানিতেন বলিয়াই কথা বলাটা দরকার মনে করিলেন না।

গৃহিণী বলিলেন, "এসো বাছা, মা বাপ শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠুন, চট্ করে ফিরে এসো।"

ক্ষণিকা মুখের চেষ্টাকৃত হাসিতে বলিতে চাহিল যে সে আবার শীঘ্রই ফিরিবে। কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তর যেন তাহার বাহিরের মিথ্যা হাসিকে তুচ্ছ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর আস্‌ব না, এই শেষ।"

( ১২ )

লালু আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ছিল। ক্ষণিকা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পদার্পণ করিয়াই বলিল, "মা বাবা কেমন আছেন রে ?"

লালু বলিল, "বাবা ভালই, মায়ের এখনও জ্বর ছাড়েনি, তবে ডাক্তার-বাবু বলেছেন ভয় পাবার আর কোনো কারণ নেই।"

মেনকা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঁচা গেল বাপু, যা ভয় পেয়েছিলাম! বাড়ী আস্‌ব, কোথায় আনন্দ হবে, তা না, যত একটা করে ষ্টেশন পার হচ্ছি তত বুকটা বেশী করে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌ছে।"

লালু বলিল, "সত্যি ছোড়্‌দি, এক-এক সময় বাড়ী ঢুক্‌তে এমন ভয় কর্‌ত, ইস্কুল থেকে এসে আগে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে বাবার ঘরের ভিতরটা দেখে নিতাম, তবে ঢুক্‌তাম। আর যদি শুন্‌তাম যে মা ঘর থেকে কুড়ুনীর মাকে বক্‌ছেন তাহলে আর একেবারেই ভয় কর্‌ত

না। সত্যি ভাই, মা চুপ করে থাক্‌লে আমার এমন ভয় লাগ্‌ত।"

বালক বালিকা দুজন যতক্ষণ নিজের নিজের মনোভাব কথায় ব্যক্ত করিতে বসিয়াছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ দুজন ততক্ষণ জিনিষপত্র ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়ীর মাথায় বোঝাই করাইতেই ব্যস্ত ছিল। তাহারি ফাঁকে চিন্ময় একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, "বাপ মা ভাল আছেন শুনেও আকাশের মেঘ ত একটুও কাট্‌ল না দেখ্‌ছি। না মনের ভাব মুখে প্রকাশ করাটা এখন বড় বেশী ছেলেমানুষি বলে মনে হয়?"

ক্ষণিকা বলিল, "মা বাবা ভাল আছেন শুনে খুসি যে হয়েছি এটা চীৎকার করে না বল্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না তা ত ভাবিনি।"

চিন্ময় হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "ঠিকই ভেবেছিলে, আমি তোমার মনের কথা একটু আধটু বুঝ্‌তে পারি। তুমি যা জান্‌তে চাওনি, এমন অনেক কথাও আমি বুঝ্‌তে পারি।"

লালু এবং মেনকার আলোচনা এই সময় থামিয়া যাওয়াতে চিন্ময়ের শেষের কথা কয়েকটা তাহাদের কানে গিয়া পৌছিল। লালু মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ চিন্ময়-দা,

আপনি 'থট্‌রীডিং' শিখেছেন নাকি? আচ্ছা বলুন ত আমি এখন কি ভাব্‌ছি? ম্যাট্রিক্‌ ক্লাশের শ্যামাপদ একটু আধটু পারে, আর তাই নিয়ে যা চাল দেয়! বাপ!"

ক্ষণিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখন গাড়ীতে উঠ্‌বে, না এই দুপুর রোদে পুড়্‌তে পুড়্‌তে থট্‌রীডিং করবে? তোমাদের সবই কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!"

মেনকা বলিল, "দিদির কখন যে কিসে রাগ হয়, তার ঠিকানা নেই। উঠ্‌ছি ত বাপু গাড়ীতে, এখানে ত আর ঘর বেঁধে বস্‌ব না?"

গাড়ীতে উঠিয়াই লালু বলিল, "আচ্ছা, এইবার বলুন দেখি কি আমি ভাব্‌ছি? আচ্ছা আমি সহজ করে দিচ্ছি, একজন মানুষের কথা ভাব্‌ছি, বলুন ত সে কে?

চিন্ময় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "চিনেবাদাম-ওয়ালা।"

"কিচ্ছু পার্‌লেন না, আপনি একটুও শেখেন নি, আপনি চেষ্টাও কর্‌লেন না।"

চিন্ময় বলিল, "তোমার মনের সাম্‌নে এখনো জমাট অন্ধকার, তা ফুড়ে কি সাদা চোখে দেখা যায়? বরং তোমার দিদি কার কথা ভাব্‌ছে বল্‌তে বল যদি এক সেকেণ্ডে বলে দেব।"

মেনকা বলিল, "ছাই পার্‌বেন, ছেলেদের মনের সাম্‌নেই শুধু অন্ধকার আর আমাদের মনের সাম্‌নে বুঝি আমরা ইলেকট্রিক্‌-লাইট্‌ জ্বেলে বসে থাকি ?"

"সবাই না, কেউ কেউ থাকে। তাদের চোখের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়।"

ক্ষণিকা সশব্দে নিজের পাশের ঝিল্‌মিলিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এত পর্দানশীন আবার আমরা কবে থেকে হ'!! গরমে মর্‌ছি যে," বলিয়া মুখখানা জানালা দিয়া বাহিরে বাড়াইয়া দিল।

লালু বলিল, "দিদি যে কি অদ্ভুত, এই না রোদে দেড় সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে ছিলাম বলে বক্‌ছিলে ? এখন নিজের মাথাটা রোদে বার করে দিলে কেন ?"

চিন্ময় বলিল, "ঠিক বলেছ, এই দেখ না, যেই তোমার চিঠি পাওয়া, অমনই কেঁদে কেটে পাঁচ মিনিট পরেই ট্রেনে উঠ্‌লেন ; আবার দেখো, কাল আরো বেশী উৎসাহে কল্‌-কাতায় ফিরে চলেছেন।"

মেনকা বলিল, "আমি যাচ্ছি না বাপু, একটি মাস থেকে তার পর যদি ওমুখো হই। বোর্ডিংএর ঘণ্টা শুনে শুনে ত আমার অরুচি ধরে গেছে।"

ক্ষণিকা মাথাটা ভিতরে ঢুকাইয়া লইল। রৌদ্রের

তাপেই বোধ হয় তাহার মুখখানা অমন সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "আমি আর ফিরছিই না,— এক মাসেও না, দুমাসেও না।"

চিন্ময় বলিল, "দেখা যাবে।"

তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

বাড়ীর অবস্থা ক্ষণিকা যেমন দেখিবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিল, ততটা সাঙ্ঘাতিক নয় দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। তাহার পিতার অসুখটা নিতান্ত সাময়িক একটা অসুস্থতা, তাঁহার আসল রোগের সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। গৃহিণী দিন কয়েক জ্বরে পড়িয়াছেন, ইহাতেই ভয় পাইয়া লালু দিদিদের আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছে।

মেয়েদের স্নানাদি হইলে পর তাহারা মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। চিন্ময় বলিল, "স্নানটা করে আসি। তার পর কমিটি ডেকে যথা কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে এখন।"

সে চলিয়া গেল। গৃহিণী ক্ষণিকার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি চেহারাই করেছিস্ বাছা! পরের বাড়ীর চাকরি, খুব বুঝি খাটতে হয়? লোকজন অনেক নাকি?"

মেনকাই দিদির হইয়া জবাব দিল, "কিসের অনেক লোক, বুড়ী গিন্নি, তাঁর ছেলে, আর একটা পুঁটকে মেয়ে। তেমনি ঝি চাকর কতগুলো যে তার গোনাগুন্তি নেই। দিদি যদি

ইচ্ছে করে চর্‌কি-বাজির মত ঘুর্‌পাক খেয়ে বেড়ায় ত লোকে কি কর্‌বে?”

ক্ষণিকার মা বলিলেন, “অনেক চাকর থাকার ত যা সুখ, বকে বকে প্রাণ শেষ হয়। খাস-দাস্ ত ভাল করে?”

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, “খাই না আবার? খাবার জন্যেই ত ওদের ওখানে গিয়েছি, সে কথা ওরাও জানে, আমিও জানি।”

দিদির কথা বলার রকম সম্বন্ধে মেনকা কি একটা মন্তব্য করিতে যাইতেছিল, এমন সময় লালু বলিয়া উঠিল, “দিদি, ছোড়দি, কুড়ুনীর মা ভাত বেড়েছে, তোমাদের কি বলে ডাক্‌তে হবে তা ঠিক কর্‌তে না পেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।”

ক্ষণিকা বলিল, “ও পদার্থটিকে কোথা থেকে জুটোলে?”

লালু বলিল, “ও স্কুলের বেয়ারার বউ, যা grand রাঁধে, একবার মুখে দিলে আর জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বে না।”

একগ্রাস মুখে তুলিয়াই মেনকা বলিল, “ঠিকই বলেছে লালু, এমন রান্না সাত জন্মে খাইনি।”

ক্ষণিকা বলিল, “আচ্ছা, অত সমালোচনায় কাজ নেই, এর পর নিজে খুব ভাল করে রেঁধে খাস্ এখন।”

মেনকা গাল ফুলাইয়া বলিল, “কোথাও যদি নিষ্কৃতি

আছে। বোর্ডিংএ সারাদিন পড়; যদিবা দুদিনের জন্যে বাড়ী এলাম ত অমনি হাঁড়ি ঠেল। আমায় ত বক্‌লে, নিজে ত এক হাতাও ভাত খেলে না, সবই ত ফেলে দিলে। অম্‌নি করে বুঝি অনাদি-বাবুর বাড়ী খাও?"

তাহার দিদি কথা না বলিয়া পিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রবোধ অফিস হইতে চারটা-পাঁচটার আগে ফেরে না, মা-বাবার অসুখেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ক্ষণিকা খাওয়া সারিয়া বলিল, "কাজ নেই আর মায়ের কাছে গিয়ে, আমরা যতক্ষণ কাছে থাক্‌ব ততক্ষণই ত কথা বল্‌বেন কেবল। ঘুমতে পারেন ত একটু ঘুমিয়ে নিন্। জ্বর বাড়্‌বে তা না হলে। আয় না বারাণ্ডায় মাদুর পেতে বসে গল্প করি।"

মেনকা উৎসাহিত হইয়া অতি সঙ্গোপনে পা টিপিয়া টিপিয়া মাদুরখানা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিল, পাছে তাহার মায়ের ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি তখন চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন, ঘুমাইতেছেন কি না বুঝিবার উপায় ছিল না। লালু এককোণে বসিয়া গোটাকয়েক ভোঁতা পেন্সিলের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত ছিল।

মাদুর পাতিয়া বসার পর কিন্তু মেনকার দিদির গল্প

করিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শূন্যের দিকে পলক-হীন নেত্রে যে মানুষ কি করিয়া অতক্ষণ চাহিয়া থাকে মেনকা তাহা ভাবিয়াই পাইল না। অবশ্য এ জিনিষটা তাহার কাছে কিছুমাত্র নূতন নয়। বোর্ডিংএ আরও অনেক তরুণী ও কিশোরীকেই সে এই রোগে আক্রান্ত দেখিয়াছে।

চুপ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া যখন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে বলিল, "দিদি, এরি নাম বুঝি গল্প করা ?"

ক্ষণিকা সচেতন হইয়া উঠিয়া বলিল, "তুই বল্‌না তোর বোর্ডিংএর গল্প, আমি শুনি।"

"আহা আমার বোর্ডিং বড় নূতন কিনা তোমার কাছে, তাই তুমি তার গল্প শুন্‌বে। তার চেয়ে তুমি অনাদি-বাবুর বাড়ীর গল্প করনা বাপু ? গিন্নিকে তুমি বুঝি মাসিমা বলে ডাক্‌তে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ।"

মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, "অনাদি-বাবুকে দাদা বল্‌তে নাকি ?"

"যাঃ, দাদা বল্‌তে যাব কেন ?"

"তবে কি বলে ডাক্‌তে ? যদি দর্‌কার হত ?"

ক্ষণিকা বলিল, "দর্‌কার হয়ইনি।"

এমন সময় সদর দরজায় মানুষের পদধ্বনি শুনিয়া

চায়, মানুষ যাহা শুনিতে চায়, তাহা ত বলা হয় না, শোনা হয় না; কিন্তু তুচ্ছ কথার স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলে। সে তুচ্ছ বলিয়াই সংসারে নির্ভয়ে লজ্জাহীন মুখে চলিয়া বেড়ায়। তাই ক্ষণিকাকেও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে হইল, "না, কিছু ক্লান্ত হইনি।"

আবার সেই অটুট নীরবতা। জ্যোৎস্নার দীপ্তি ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নীলসাগরের বুকে সূর্য্যের আলো যেমন উচ্ছল আনন্দে নৃত্য করে, তেমনি এই পথপার্শ্বে ঘন শ্যামলতার সাগরে শুক্লা রজনীর কিরণধারা নাচিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু অন্তরের আনন্দপ্রদীপখানি তুলিয়া ধরিয়া কোনো মানুষ এই জ্যোতিরুৎসবে যোগ দিতে আসিল না। ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধার যেন জ্যোৎস্নার কাছে হার মানিয়া এই পথচারী মানুষ দুটির বুকের মধ্যে আসিয়াই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ক্ষণিকা দেখিল, বেণুর তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। গৃহিণীর ঘরের দরজা এরই মধ্যে বন্ধ। ভিতর হইতে কদমের সুগভীর নাসিকাগর্জ্জন সকলকে জানাইয়া দিতেছে যে এটা বিশ্রামেরই সময়, চলিবার নয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বেণুর মশারি ফেলিয়া তাহার

ব্যস্ত হয়ে ওঠে, বলে—না মা দিদি আসুক। আমারও সেদিন জ্বরটা বাড়্‌ল, কাজেই বারণ করতে সাহস হল না। প্রবোধটা যদি মানুষের মত হত, তা হলে না হয় চল্‌ত, ও ছেলেমানুষ আর কদিন সাম্‌লাবে? তারা কিছু মনে করবে না ত?"

ক্ষণিকা মুখটা ফিরাইয়া বলিল, "আমার কিছু যাবার তাড়া নেই। ওঁরা বলেছেন যত দিন খুসি থাকতে পারি।"

চিন্ময় বলিল, "তার জন্য আপনি কিছু ভাব্‌বেন না কাকীমা, তাঁরা লোক খুব ভদ্র। এই দুএক দিনের মধ্যেই অনাদি-বাবুর লাহোর যাবার কথা, সেখানের সায়েন্স কংগ্রেসে ওঁর বক্তৃতা আছে; এমন সময়েও যখন ছুটী দিয়েছেন, তখন দুদিনের জায়গায় চারদিন হলে যে চটে যাবেন তা মনে হয় না।"

ক্ষণিকা বলিয়া উঠিল, "কই লাহোর যাবার কথা ত বলেননি আমায়?"

চিন্ময় বলিল, "বল্‌লে ত তুমি আরও ব্যস্ত হতে লাভের মধ্যে? থাক্‌বে কি আস্‌বে তাই ঠিক করতে পারতে না। তাই বলেননি বোধ হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা থাক্‌লে যদি চলে যদিন পারিস্‌ থেকে যা, যা ছিরি হয়েছে। আমার জ্বর যে ছাড়্‌লে বাঁচি,

১৫

ছেলেমেয়েগুলোকে একটু দেখ্‌ব তারও জো নেই। মিনুটা তবু দেখ্‌ছি বোর্ডিংএর ভাত খেয়েও বেশ আছে।"

চিন্ময় বলিল, "ওরা কি আর আমাদের জাত কাকীমা যে কেবল ভাতের উপর ওদের ভাল মন্দ নির্ভর কর্‌বে। ওদের অনেক কিছু হাঙ্গাম।"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "তা ঠিক বাছা। দেখ ত ক্ষণু ক'টা বাজ্‌ল, সাড়ে তিনটেয় আবার ওষুধ গিল্‌তে হবে।"

ক্ষণিকা উঠিয়া পড়িল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, "সময় ত হয়েছে, গেলাসটা যে বড় অপরিষ্কার, দাঁড়াও ধুয়ে আনি।" গেলাস হাতে করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চিন্ময় ডাকিয়া বলিল, "জল ত এই ঘরেই ছিল, আবার চল্‌লে কোথায় ?"

তাহার কথায় কান না দিয়া ক্ষণিকা হনহন করিয়া টিনে-ঘেরা কলতলায় আসিয়া হাজির হইল। সাবান-জল দিয়া কাঁচের গেলাস ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিল, "মিনু, এখন কুড়ুনীর মায়ের সাতগুষ্টির খবর তোমার নিতে হবে না, উঠে এই গেলাসটা নিয়ে যাও, গিয়ে মাকে ওষুধ দাও গে।"

দিদির কথার ঝাঁঝে বিরক্ত ও চকিত হইয়া মেনকা উঠিয়া পড়িল। ক্ষণিকার কাছে আসিয়া বলিল, "ওকি!

আবার দরজা বন্ধ করছ কেন? আর-একবার স্নান করবে নাকি? অনাদি-বাবুর মায়ের কাছে বুঝি এইসব শুদ্ধাচার শিখে এসেছ?"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা, জ্যাঠামি রেখে এখন নিজের কাজে যাও।"

দরজা বন্ধ করিতেই তাহার কান্না শতধারে ভাঙিয়া পড়িল। এত অবহেলা কেন? বিশ্বের লোক যাহা জানিয়া রাখিল, তাহা হইতে বাদ পড়িল শুধু সে? এ জগতে কাহার কি এমন ক্ষতি হইত যদি ক্ষণিকা অনাদির লাহোর গমনের কথা জানিতে পারিত? ইচ্ছা করিয়াই কি জানান নাই? কিন্তু এমন ইচ্ছাই বা তাঁহার হইবার কি প্রয়োজন ছিল? হঠাৎ ক্ষণিকার মনের মধ্যে একটা ভয়ের শিহরণ খেলিয়া গেল। তাহার মনোভাব কি সে অজ্ঞাতসারে অনাদিনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে? তাই কি এত অবজ্ঞা? ইহা কি তাহার স্পর্দ্ধাকে শাস্তি দিবারই ব্যবস্থা?

কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে কান্না বাড়িল বই কমিল না। এত দুঃখের উপর এত গভীর লজ্জার ভার তাহা হইলে সে কেমন করিয়া বহন করিবে? সে যে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অযাচিতভাবে ভালবাসিবার অধিকার তাহার নাই, সেই ভালবাসাকে কোনও প্রকারে প্রকাশ করিয়া ফেলা

যে তাহার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সংসার তাহাকে শাস্তি দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিবে, আর যাহার চরণে নিজের হৃদয়ের সুখ-দুঃখের অর্ঘ্য সাজাইয়া সে নিবেদন করিল সেও কি অবজ্ঞাভরে উপেক্ষার হাসিই হাসিবে না?

কিন্তু ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিয়া ত আর সারাদিনটা কাটান চলে না? খানিক পরে ক্ষণিকাকে বাহির হইতেই হইল। চোখে মুখে জল দিয়া অশ্রুর চিহ্ন যথাসাধ্য অবলুপ্ত করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল না। মেনকা বলিল, "দিদির কাণ্ডখানা দেখ্‌লে একবার, অবেলায় স্নান করে সর্দ্দি বাধিয়ে আন্‌ল।"

চিন্ময়ের মুখখানা প্রলয়গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কল্‌কাতার লোকের মফঃস্বলে বেরলেই অম্‌নি সর্দ্দি হয়, কল্‌কাতায় না ফির্‌লে সারে না। আচ্ছা, আমি একটু কাজ সেরে আসি।" বলিয়া আর পিছন পানে না তাকাইয়াই সে সোজা বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণিকার মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সাবধানে থেকো মা, দেখ্‌ছ ত আমাদের দশা। আজ আর রান্নাবান্নার দিকে যেয়ো না, কুড়ুনীর মা যা পারে করুক এবেলার মত।"

ক্ষণিকার মন তখন যে রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,

তাহার মধ্যে রান্নাবান্না বা কুড়ুনীর মা কাহারও স্থান নাই। সুতরাং একান্ত বাধ্য ছাত্রীর মত সে মায়ের কথামত চুপ করিয়া সাবধান হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া রহিল। প্রবোধ অফিস হইতে ফিরিলে পর তাহার সঙ্গে একবার ঝগড়া পর্য্যন্ত করিল না, সংসারটা যেন তখনকার মত তাহার জীবনের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার কোন ব্যস্ততা কোন চিন্তাই তাহার মনকে স্পর্শ করিল না। মেনকা কুড়ুনীর মায়ের কাজের ভুল ধরার আনন্দ উপভোগ করিয়াই সারা সন্ধ্যা কাটাইয়া দিল।

রাত্রে ছোট ঘরে তিনটি ভাই-বোনে মেঝের উপর ঢালা বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণিকা বলিল, "মাথার কাছের জান্‌লাটা খোলা রাখ, তা না হলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

মেনকা আর লালু গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণিকা অনেক রাত অবধি জাগিয়া তারকা-খচিত নিশীথাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা চেনা গানের দুটি লাইন কেবল যেন অশ্রুত সুরে তাহার বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল—

"তখন আমায় নাই বা মনে রাখ্‌লে,
ঐ তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাক্‌লে।"

মরণের পরপারে কি আর এই তীব্রজ্বালাময়ী স্মৃতিকে

বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে? বাস্তবিকই তখন মনে না রাখিলে ক্ষতি কি? কিন্তু এজীবন থাকিতে কি সে কোনো দিনও বলিতে পারিবে "আমায় নাই বা মনে রাখ্‌লে?" তাহার সমস্ত হৃদয় যে মনে রাখাইবার জন্য আকুল ক্রন্দন করিতেছে। কোন্ প্রেমের মধ্যে এ নিষ্ঠুরতাটুকু নাই, কে কবে চাহিয়াছে যে আমি যাহার বিচ্ছেদে এমন কাতর, সে আমাকে ভুলিয়া সুখে থাক? যে কাঁদনে আপনার হৃদয় কাঁদিতেছে, অন্যকেও সেই কাঁদনে কাঁদাইতে না চায় এমন নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে কোথায়? জাগরণে শয়নে যাহাকে আমি ডাকিয়া ফিরিতেছি, সে আমাকে একবারও মনেও আহ্বান করিবে না, এ চিন্তা ত সহ্য করা কঠিন।

দিনের আলোয় মনটা তাহার খানিকটা যেন লঘুভার হইয়া গেল, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়-ব্যথা আবার যেন নীড়প্রত্যাগত পাখীরই মত ফিরিয়া আসিল।

কয়েকটা দিন এমনি করিয়াই কাটিয়া গেল। কলিকাতার কোনো সংবাদই সে পায় না। একবার ইচ্ছা করিল সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলে। লেখাই ত উচিত, আসিয়া যে পৌঁছিয়াছে এ খবর ত দেওয়া কর্ত্তব্য? কিন্তু এই অতি সাধারণ কথা কটা কোনমতেই তাহার

কলমের মুখে বাহির হইতে চাহিল না। চার-পাঁচখানা চিঠি সে লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সব ক'টাতেই যেন তাহার মনোভাব বড় বেশী প্রকাশ হইয়া পড়িতে চায়। অবশেষে অনেক কাটাকুটির পর একখানা অতিভব্য রকম খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া সে স্নান করিতে গেল। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া সেখানা নকল করিতে বসিল। এবার চিঠিখানা এত বেশী প্রাণহীন অদ্ভুত বোধ হইল যে রাগ করিয়া সেখানাও ছিঁড়িয়া ফেলিল। অবশেষে আর ভাষার উপর কোনও আটক না রাখিয়া নিজের মনের মত একখানা চিঠি লিখিয়া খামে পুরিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। বাক্সের চাবি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আপন মনে বলিল, "আমি ত লিখ্‌লাম।"

বেণু বা তাহার দিদিমা কাহাকেও চিঠি লিখিয়া কোনো লাভ ছিল না, কারণ এযাবৎ ক্ষণিকাকেই উভয়ের প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহার বদলে কদম যে চিঠি লেখার কাজ চালাইতেছে ইহা মনে করার সঙ্গত কোন হেতু ছিল না।

চিন্ময় ক'দিন থাকিয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহার চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে দুএকটা কথা জানা যাইত।

কিন্তু ক্ষণিকার আসল সান্ত্বনাস্থল ছিল খবরের কাগজ।

দিনের পর দিন সে এমন গভীর মনোযোগের সহিত "ট্রিবিউন" পড়ে দেখিয়া লালু বলিল, "দিদির যে কি বুদ্ধি! কল্‌কাতার খবর যেন লাহোরের কাগজে বেরয়।" কিন্তু সে সান্ত্বনাই বা কতদিনের? কংগ্রেসও চিরকাল চলে না, দেশের মানুষ দেশেই ফেরে এবং সেখানে সে ঘরে বসিয়া কি করে তাহার খবর কোনো সংবাদপত্রই দেয় না।

বাড়ীর রোগীর দল ক্রমে সারিয়া উঠিল। মেনকাও বাড়ী থাকার অখণ্ড সুখে উত্যক্ত হইয়া এক-একবার ফিরিবার কথা পাড়িতে লাগিল। ক্ষণিকার মন কবে যে অভিসারে বাহির হইয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু তবু সে যাইবে কি না বুঝিতে পারিল না। একবার কি ডাকিতেও নাই? এতদিন যে কাছে ছিল কোনো উপকারেই কি সে লাগে নাই? সে কিছু এমন কি রাখিয়া আসে নাই যাহার খাতিরে তাকে আবার ফিরিয়া লইবার ইচ্ছা হয়?

সেদিন সকালে স্নানান্তে রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ক্ষণিকা তরকারি কুটিতেছিল, মেনকা কড়াইসুঁটী ছাড়াইবার উপলক্ষ্য করিয়া বসিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। কুড়নীর মা একতাড়া চিঠি আনিয়া ফেলিয়া দিল। ক্ষণিকার আগেই মেনকা সেগুলা খপ্‌ করিয়া তুলিয়া লইয়া বলিল, "দুটো লাল চিঠি রয়েছে। ওমা কার আবার বিয়ে?"

ক্ষণিকা উৎসুক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বিবাহযোগ্যা বন্ধু-বান্ধবের ত তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই।

মেনকা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা কি অদ্ভুত কাণ্ড ভাই! সাত জন্মেও যা ভাবিনি। তোমার মনোজাদির সঙ্গে অনাদি-বাবুর বিয়ে! একেবারে ছুদিক থেকে নেমন্তন্ন।"

ক্ষণিকার মনে হইল তাহার আজন্মের পরিচিত জগৎ যেন প্রলয়-অট্টরোল করিয়া তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সূর্য্যের আলো মৃতের চক্ষুতারার মত ঘোলাটে হইয়া উঠিল। অথচ সে অবাক হইয়া দেখিল নিজে যেমন এক মনে কাজ করিতেছিল তাহাই করিতেছে। এই প্রচণ্ড আঘাতে যেন বাহিরের ক্ষণিকার সহিত তাহার অন্তরলোকবাসিনীর একেবারে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। একজন যেমন কাজ করিতেছিল তাহাই তেমনি করিতে লাগিল, আর একজন যেন যন্ত্রণার বিষে জর্জ্জরিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার মধ্যে আর প্রাণের চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না।

( ১৬ )

"আচ্ছা দিদি, তোমার কি আজ আর উঠ্তে হবে না? আমার শুদ্ধু চা খাওয়া হয়ে গেল যে? তোমার হয়েছে কি বাপু?"

রোদ তখন উঠানের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবোধ স্নান করিবার আয়োজন করিতেছে, লালু মেনকাকে জ্বালাইবার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত আছে। কুড়ুনীর মা গৃহিণীর সঙ্গে বাজারের পয়সা লইয়া তর্কস্রোতে হাবুডুবু খাইতেছে, এত কম পয়সায় এত বেশী জিনিষ যে পাওয়া যায় না, তাহা কি গিন্নিমার একবারও বুঝিতে নাই? ভদ্দর লোকদের কাণ্ডকারখানা বোঝা ভার।

লালুর সহিত ঝগড়াঝাঁটি করিতে করিতে ক্রমেই মেনকা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। দিদি মাঝে থাকিলে তবু ঝগড়ার রসটা অধিকতর উপভোগ্য হয়, কিন্তু তাহারও যে আজ আর উঠিবার নাম নাই? মেনকা তাড়াতাড়ি দিদিকে তাহার আলস্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে ছুটিল।

তাহার গলা কানে যাইতেই ক্ষণিকা চোখ চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন?"

"চেঁচাব আবার কেন? কটা বেজেছে তার ঠিকানা রাখ কিছু? বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বেই না নাকি?"

তাহার মা এতক্ষণে কুড়ুনীর মায়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া বলিলেন, "অত চেঁচামেচি কর্‌ছিস্ কেন? হয়ত শরীর ভাল নেই, তাই উঠ্‌ছে না। শুধু-শুধু তোমার মত কুঁড়েমি করে ওকে কোনোদিন বেলা কর্‌তে দেখেছ?"

মেনকা বলিল, "আহা, ও কি আর কখনো কিছু করে? সব করি আমি। এ ক'দিন থেকে দিদি যা করছে তাকে যদি কুঁড়েমি না বলে তা হলে আমায় আবার দ্বিতীয় ভাগ পড়তে হবে দেখছি। উঠ্‌বে ত রোজ আটটায়, খেয়ে উঠে তিন ঘণ্টা হাঁ করে সেইখানেই বসে থাকবে। সারা দুপুর শুয়ে থাকবে, না এক লাইন পড়বে, না এক ফোঁড় শেলাই করবে। এই যদি আমি হতাম, তা হলে কুঁড়েমি ছাড়া আরো কত কথা যে শুনতাম তার আর আদি অন্ত নেই।"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "নে থাম, তোকে আর বকবক করতে হবে না। দিদির মত কাজ একদিন করতে হতো ত বুঝ্‌তিস্। ওঁর অসুখের সময় মেয়ে যা খাটুনি খেটেছে তা ত চোখে দেখেছি? সারা বছরই ত খাটছে। পরের বাড়ী কি আর বসে খায়? না হয় ক'দিন কাজ নাই করল।"

মায়ের সহিত মেনকার কথা কাটাকাটি করিতে একরকম ভালই লাগিতেছিল। সে আবার আরম্ভ করিল, "দিদির এক-এক সময় একএকটা ফ্যাশান আসে। কারু অসুখ হল কি টাকা কম পড়ল, তখন এমন করে খাটতে আরম্ভ করবে যে দেখে অন্য লোকের দম আট্‌কে আসে। যতটা দরকার তার দশগুণ খাটবে; যারা নিজের কাজ করে নিতে পারে, তাদের কাজগুলো শুদ্ধ করে দেবে। মাঝখানে থেকে

নিজের শরীরটি যায়। আবার সবাই যদি ভাল রইল, তাহলে কাপড়ের পুঁটুলির মত সারাক্ষণ পড়েই রইল ঘরের কোণে, উঠ্‌বেও না হাঁট্‌বেও না। নিজের ভাল লাগা, মন্দ লাগা বলে জিনিষ নেই যেন, কেবল সবই দরকার-মত কর্‌তে হবে।"

ক্ষণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া বোনের বক্তৃতা শুনিতেছিল। তাহার মা ভাত চড়াইয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কাজেই মেনকার বক্তব্য শেষ অবধি না শুনিয়াই তিনি আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। মেনকা থামিতেই ক্ষণিকা বলিল, "তোর আজ আর কাজ নেই কিছু নাকি রে? ভোর থেকে উঠে আমার বর্ণনা আরম্ভ কর্‌লি কেন?"

মেনকা বলিল, "কাজ ত কত? বাড়ীর কাজ ত মা কর্‌ছেন, আর পড়াশুনো ত তোমার কল্যাণে উঠেই গিয়েছে।"

"কেন আমার কল্যাণে উঠে গেল কেন? আমি কি তোর চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়েছি না বইয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি? বাড়ী বসে পড়্‌লেই পারিস্? জানুয়ারিতে স্কুলে পড়া ত যা চমৎকার হয় তা আমার জানা আছে। মাসের শেষেই ত তোকে পাঠিয়ে দেব। ইয়ার্লি পরীক্ষাটা দেওয়া হল না এই যা।"

লালু কাছে আসিয়া বলিল, "তার জন্যে ত ছোড়দির

তোমাকে বথ্‌শিস্‌ দেওয়া উচিত। পরীক্ষা দিলে উনি যা পাশ হতেন তা আমার জানা আছে। সেদিন ওর একখানা খাতা খুলে দেখি ছোড়দি কি গ্র্যাণ্ড ইংরিজি লিখেছেন।"

"হতভাগা, বাঁদর, ছুঁচো, ফের আমার বই খাতা চুরি করে ঘাঁটতে গিয়েছিস্‌।" বলিয়া মেনকা লালুর পিঠে ঠাশ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল।

ভাই-বোনের ঝগ্‌ড়া মারামারি থামানোটা উচিত জানিয়াও ক্ষণিকা তাহাদের কিছু না বলিয়াই সেথান হইতে সরিয়া আসিল। করুক না হয় ঝগড়া, ক্লান্ত হইলে আপনি থামিবে এখন। না হয়, নাই থামিবে।

ঘরখানার মেজে জুড়িয়া বিছানা পাতা। জিনিষপত্র বই খাতাতে ঘর বোঝাই হইয়া আছে। বিছানা ক'টা তুলিয়া ফেলিয়া সে বাক্সের উপর চাপাইয়া রাখিয়া দিল। ধুলার অভাব নাই, বাক্স ডেস্ক সবের উপরে এক দিনেই বেশ একটি আধ আঙ্গুল পুরু আবরণ পড়িয়া যায়। একটা ময়লা ঝাড়ন ঘরের দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলিতেছিল। ক্ষণিকা একবার সেটা হাতে করিয়া লইল, আবার কি ভাবিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

লালু আর মিনু বোধ হয় তখনও ঝগড়া করিতেছিল, পাশের ঘর হইতে তাহাদের অস্তিত্বের বেশ প্রবল রকম

পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। ক্ষণিকা দরজার চৌকাঠে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে উঠানের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার চোখের সম্মুখে যাহা ভাসিতেছিল, তাহা কিন্তু এই দরিদ্রগৃহের প্রাঙ্গণটি নয়। সে যেন আর-এক কোন্ দেশ; সেখানে যাহারা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা ত এ বাড়ীর কেহ নয়? বিধাতার বিধানে সে যে-গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, সে-গৃহের অধিবাসীরাই অনেককাল পর্য্যন্ত তাহার একমাত্র আত্মীয় ছিল। কিন্তু সেই নিয়ন্তার নিয়মেই আবার এখন সে কাহাকে অন্তরের মধ্যে অন্তরতম আত্মীয় বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, আজ সেই তাহার জাগ্রত নয়নের দৃষ্টিকে, রাত্রির নিদ্রার স্বপ্নরাজ্যকে একান্ত আপনার করিয়া রাজদর্পে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, পুরাতন অধিবাসীগুলি কোথায় যে সরিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানাই নাই।

রৌদ্রের ধারা ক্রমেই উঠানের উপর দিয়া গড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। ক্ষণিকার কিন্তু নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কলিকাতার সেই বাড়ীতে এতক্ষণে চাকরবাকরের কলরব পূর্ণ বিক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছে। বেণু নাওয়া খাওয়া লইয়া কদমের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে, তাহাকে মারিয়া

নিজেই কান্না জুড়িয়া দিতেছে। গৃহিণী ঘর হইতে এক-পাও না নড়িয়া কেবল মাত্র গলার জোরে বিশ্বের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন।

আর সেই ঘরখানিতে এতক্ষণে কি হইতেছে? সকালের চা খাওয়া সারিয়া গৃহস্বামী একমনে পড়ায় ব্যস্ত। জানালা দিয়া রোদ আসিয়া চুলের উপর পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, বিড়ালছানাটা পায়ের কাছে ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রীর ভিতরে কেবলি লাফালাফি করিতেছে। কলেজের বেলা হইয়া আসিল, নিজের সে কথা মনে নাই, মনে করাইয়া দিবার লোকই বা কোথায়? অবশেষে হয়ত গৃহিণীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে চাকরবাকরের চমক ভাঙ্গিল, সশঙ্কচিত্তে কোনপ্রকারে তাহারা প্রভুর ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি করিয়া নামে মাত্র নাওয়া খাওয়া করিয়া বাহির হইয়া যাওয়া। তখনও কি তাঁহার একবারও তাহাকে মনে পড়িল না, যে সদা-জাগ্রত মনোযোগের সহিত তাঁহার সকল সেবার আয়োজন করিয়া রাখিত? একবারও কি মনে হইল না তাহাকে ফিরিয়া পাইলে ভাল হয়?

ক্ষণিকার বক্ষস্থল মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল। হায় নির্ব্বোধ, এ কি দিবাস্বপ্ন? সেই ঘর, সেই মানুষ তেমনিই কি আছে, সে যেমনটি রাখিয়া

আসিয়াছিল ? নূতন রাণীর অভিষেকে রাজ্যের আগাগোড়া চেহারাই কি বদল হইয়া যায় নাই ? যেখানে সে ধ্যাননিরত সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল, এখন সেখানে কে ? যে স্বর্গ হইতে তাহার নির্ব্বাসন হইল, তাহাতে ত ফিরিবার আর কোনো পথ নাই ! তাহার কুগ্রহ যে রাক্ষসের মত সেই স্বর্গকেও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

সেই মনোজ্ঞা। তাহার তরুণজীবনে যাহাকে সে মুকুলিত প্রীতির অর্ঘ্য ঢালিয়া পূজা করিয়াছে, যৌবনের রঙীন স্বপ্নলোকে যে থাকিয়া থাকিয়া চপলা ক্ষণপ্রভার মত লীলা করিয়া বেড়াইয়াছে, যাহার কোমল চম্পক-অঙ্গুলির স্পর্শেই কণিকার সুপ্ত মনোবীণা প্রথম ঝঙ্কার দিয়াছিল, সেই আজ তাহার ভাগ্যগগনে ধূমকেতুর মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিল ? যে মনোমোহন ঐশ্বর্য্য-লোকে এই যাদুকরী প্রথম তাহাকে প্রবেশ করাইয়াছিল, আজ সেই তাহাকে সেই সুখস্বর্গ হইতে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত করিল ? যে নীল গগনের দিকে চাহিয়া সে প্রথম আনন্দের হাসি হাসিয়াছিল, আজ বজ্র আসিয়া যখন তাহার আনন্দের লীলাভূমি ভস্মীভূত করিল, তখন কি এই নীলিমার অন্তরাল হইতেই তাহার করালমূর্ত্তি দেখা দিল ?

মনোজ্ঞা আজ অনাদিনাথের পত্নী। যে দীর্ঘদিন-সঞ্চিত

সম্পদের প্রতি ক্ষণিকার মন লুব্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিত, আজ তাহা মনোজার পায়ে ভাগ্য অঞ্জলি ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে। যে দৃষ্টির এককণার জন্য সে নিজের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতে পারিত, যে হাসি তাহার কাছে জগতের শ্রেষ্ঠতম রত্নের চেয়েও বহুমূল্য ছিল, তাহা আজ মনোজার কাছে বায়ু বা সূর্য্যালোকেরই মত সহজলভ্য। যে হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ পাইবার জন্য ক্ষণিকার অন্তর নিরন্তর হিমালয়কন্যার মত অনন্যমন হইয়া তপস্যা করিয়াছে, কেবলমাত্র মৃদু হাসি হাসিয়া কোমলপদবিক্ষেপে মনোজা আজ সেই রাজ্যের অধীশ্বরীর সিংহাসনে অবহেলাভরেই যেন আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বঙ্কিম ওষ্ঠের হাসিটুকু যেমন ছিল তেমনই রহিল, চোখের জ্যোতি কি একটুও উজ্জ্বলতর হইল!

কিন্তু ইহার কি প্রয়োজন ছিল? মনোজার অভাব ছিল কিসের? তাহার বিশাল নয়ন যেখানে কৃপাদৃষ্টি করিয়াছে, সেখানেই কি প্রীতির অর্ঘ্য তাহার রক্তিম চরণে স্বতঃই আসিয়া ঝরিয়া পড়ে নাই? দিনরাত্রির সকলগুলি প্রহর যেন তাহাকে আনন্দ জোগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত, সেই অবহেলাভরে কত আয়োজন ঠেলিয়া ফেলিত। এমন যে মহিমাময়ী, ইচ্ছা করিলে যে সকলই করিতে পারিত, সে কেন দরিদ্রের জীবনসম্বল অপহরণ করিতে আসিল?

ক্ষণিকার জীবনের প্রথম দুর্দ্দিনে কেন সে তাহাকে স্রোতের মুখ হইতে টানিয়া তুলিল ? ডুবিতে দিলেই যে ছিল ভাল। আজ যে মরণ তাহার কাছে আরো কত ভীষণ, আজ যে তাহার প্রাণ সহস্র শিকড় দিয়া জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, এখন কিনা সেই মনোজ্ঞাই তাহাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে চায় ? মনোজ্ঞার বাঁচিয়া থাকা কোনোকালেই কঠিন নয়, সে যে সংসারে রাণীর অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ক্ষণিকার জন্ম যে ভিখারিণীর দলে। তাহাকে আজন্ম পিপাসা লইয়া কাটাইতে হইয়াছে, ব্যগ্র বাহু মেলিয়া সে কেবলি চাহিয়াছে, কেবলি বঞ্চিত হইয়াছে। এতদিন পরে যখন একটি চাওয়ার মধ্যে তাহার চিরজীবনের সকল চাওয়া আনন্দে মরিতে চাহিল, তখনই কি নিষ্ঠুর নিয়তির কুঠার তাহার সকল আনন্দের মূলে এমন ভাবে আসিয়া পড়িতে হয় ? ইহার পর সে বাঁচিবে কি করিয়া ? কিন্তু বাঁচা ছাড়া তাহার উপায়ই বা কি ?

কিন্তু ক্ষণিকার সকল বাসনা, সকল কামনা, তাহার তরুণ প্রাণের সমগ্র প্রেমের ধারা এখনও যাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিবার অধিকারও নাকি তাহার নাই। নাই বা থাকিল, কিন্তু অধিকারহীনা তাহাকে নিষ্কৃতি দিল কই ? তাহার প্রাণের সহিত তাহার প্রিয়ের চরণে যে

প্রেমের ফাঁশ বাঁধিয়াছিল তাহা এই জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টায় কেবল কঠিনতর হইয়া তাহার মর্ম্মকে পীড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল, শয়নে জাগরণে এই অসহ্য বেদনাকে ভুলিবার আর কোনো উপায় রহিল না। জগৎ-সংসারকে অবহেলা করিয়া সে একমাত্র আপনার প্রিয়কে হৃদয়ের সকল বন্ধন দিয়া বাঁধিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে হারাইয়া জগতের দিকে চাহিয়া দেখিল কেবল আপন মনের অবহেলার প্রতিরূপ মাত্র।

হঠাৎ মায়ের ডাকে সে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। "কি রে এখনও অমন করে বসে আছিস্ কেন, শরীর কি বড় খারাপ লাগ্‌ছে?"

ক্ষণিকা ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "না মা। কিছু দর্‌কার আছে?"

"এই একটু ভাতটা দেখ্‌তিস্, ততক্ষণ তর্‌কারিগুলো কুটে নিতাম। মিনু যে কি চিঠিই পড়্‌ছে, হাজার ডাকেও সাড়া পাওয়া যায় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমিই দিচ্ছি।"

মেনকা তাড়াতাড়ি একখানা খোলা চিঠি হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল, "যাচ্ছি ত আমিই, এই মধুর চিঠিখানা পড়্‌ছিলাম। দিদি পড়্‌বে? মনোজাদির বিয়ের সব গল্প লিখেছে, এত কথা তুমিও জান না।"

ক্ষণিকার কোলের উপর চিঠিখানা ছুঁড়িয়া দিয়া সে তরকারির ঝুড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, "মা, কি কুটতে হবে বল? বাপ রে, কি বঁটি যে তোমার! চোরের নাকও কাটে না এতে।"

মাধবীর চিঠি প্রায় বারো পৃষ্ঠা জোড়া, তাহার দশ পৃষ্ঠাই মনোজা আর অনাদিনাথের ইতিহাস। কোথা হইতে এত তথ্য সে সংগ্রহ করিল, তাহা ক্ষণিকা ভাবিয়াও পাইল না। এতকাল মনোজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিয়াও সে জানে নাই যে মনোজার কুড়ি বৎসর বয়সে অনাদিনাথের সহিত বিবাহের কথা হয়। উভয় পক্ষেরই পিতামাতার ঘোর আপত্তিতে বিবাহ ভাঙিয়া যায়। আপত্তির কারণ মাধবীর জানা নাই, সে একটা পুরাতন পারিবারিক কলহের আভাস দিয়াছে মাত্র। তার পর মনোজার পিতা মাতা যে মারা গিয়াছেন সে কথাও ক্ষণিকারও জানা। এই দীর্ঘ ছয়টি বৎসর এই দুটি মানুষের কেমন করিয়া যে কাটিয়াছে তাহা উভয়ের ভাগ্যবিধাতা ভিন্ন কাহারও জানা নাই। অকস্মাৎ লাহোরে উভয়ের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়, দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মনোজা এই সময়েই কেমন করিয়া সেখানে গিয়া দেখা দিল। যাহাকে তাহারা মৃত মনে করিয়া হৃদয়ের অন্ধকারে সমাধিস্থ করিয়াছিল, তাহা এতদিন পরে

পরস্পরের দৃষ্টির আলোকপাতে জীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর কেবল বিবাহ-সভার বর্ণনা। কে কি বলিল, কে কি পরিল, কাকে কেমন দেখাইল। মাধবী শেষ করিয়াছে—"মনোজাদি সেদিন স্কুলে বেড়াতে এসেছিলেন। আগাগোড়া purple পোষাক, গলায় আর হাতে 'এমিথিষ্টের' গয়না, দুল আর ব্রোচও এমিথিষ্টের। সে যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ভাই, ঠিক যেন ইন্দ্রাণী। অনাদি-বাবুর সুন্দরী স্ত্রী হওয়াতে বড় জাঁক হয়েছে, মনোজাদিকে যখন মোটরে করে নিতে এলেন, তখন এমন মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিলেন, ওঁকে এর আগে সাত জন্মেও হাস্‌তে দেখিনি।"

আরো কয়েক লাইন লেখা ছিল, তাহা না পড়িয়াই ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা মুড়িয়া উঠিয়া পড়িল। আর যেন পড়িবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। তাহার বুকের ভিতরটা তখন রুদ্ধাবেগ ক্রন্দনে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। ঐ হাসি ফুটাইবার সাধ্য ভগবান তাহাকে দেন নাই, কিন্তু ঐ হাসির অনলে তাহাকেই পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে হইবে।

আহারান্তে মাকে একটু নিভৃতে পাইয়া ক্ষণিকা বলিল, "মা, আমার শরীরটা সত্যিই তেমন ভাল ঠেক্‌ছে না। আরো

মাস দুই ছুটি নিয়ে কোথাও ঘুরে এলে হয়। টাকার টানাটানি ত তেমন নেই। লালু এবৎসর স্কুলের স্কলারশিপ্‌টা পাবে, দাদাও বাড়ীতে কিছু কিছু দিচ্ছে। আর তুমি ত বল্‌লে স্কুল-কমিটি বাবাকে অর্দ্ধেক মাইনে দিয়ে সিক্-লিভ্ দেওয়া স্থির করেছেন। তাহলে আমি দিন কয়েক ছুটি নিলে চলে না ?"

তাহার মা বলিলেন, "তুই নে ত ছুটি। চলে না চলে, সে আমি বুঝ্‌ব। সবাইকার জন্যে তাই বলে তোকে বলি দিতে হবে নাকি ? ওরা ছুটি না দেয় কাজ ছেড়ে দে, জগতে কাজ কি ঐ একটাই আছে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "ছুটি হয়ত একেবারেই দেবেন, ওঁর ত এখন ঘরে স্ত্রীই এল, তা আর সংসার দেখ্‌বার অন্য লোকের দর্‌কার কি ? এক বেণুকে পড়ানো, তারি জন্যে যদি রাখে। দেখি লিখে, কি বলেন।"

কেবলমাত্র ছুটির আবেদন করিয়া ক্ষণিকা অনাদিনাথের নামে একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিল। সে প্রথম ছুটি লইয়া আসার পর সংসারের যে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার আভাষ মাত্রও চিঠিতে দেখা গেল না। কিন্তু রোজ যখনই কলিকাতার ডাক আসার সময় হইত, তখনি তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিত। যদি চিঠি

আসে? আসিলই না হয়, কি এমন তাহাতে থাকিতে পারে যাহার জন্য তাহার মন উন্মনা হইয়া ওঠে? যাহা আশা করা অসম্ভব, তাহাই সে কি আশা করে? যাহা ভাবিলে বেদনায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, জোর করিয়া তাহাই ভাবা কেন? কিন্তু ক্ষণিকার মন তাহার বুদ্ধির সঙ্গে বিরোধ করিয়া স্বাধীনচালে চলিতে শিখিয়াছিল, তাহাকে আর সে বশে আনিতে পারিল না।

"দিদি, তোমার একখানা চিঠি আছে।"—লালু চিঠি দিয়া গেল। ক্ষণিকা চাহিয়া দেখিল, উপরের হস্তাক্ষর মনোজার।

চিঠিখানা না পড়িয়াই তাহার আগুনে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহার উল্টা ইচ্ছাটাও কম প্রবল ছিল না। চিঠিখানা খোলাই হইল। মনোজা লিখিয়াছে—

স্নেহের ক্ষণু,

তুই নিশ্চয়ই আমার উপর খুব রাগ করেছিস্। এতবড় খবরটা একেবারে লাল চিঠি পেয়ে জান্‌লি, রাগ হবারই কথা। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, বিশ্বাস করিস্, কুড়িদিন আগে অবধি আমি নিজেই জান্‌তাম না। কেমন যেন এক ঘূর্ণীবায়ু এসে এক নিমিষে আমার জীবনের সব উলোটপালোট করে দিয়ে গেল, আমার মাথার

ভিতরটা শুদ্ধ। এখনও ভাল করে সামলাই নি। ভেবে দেখ্, এক মাসে কি কাণ্ড! আমার দশাটা ভেবে চিঠি না লেখার জন্যে ক্ষমা করিস্। আর অন্য মানুষটিরও ত পরিচয় পেয়েছিস্, তিনি যে কেমন কাজের মানুষ তা নিশ্চয়ই জানিস্? খবর দেওয়া তাঁর কুষ্ঠিতে নেই।

এমন হুড়োহুড়ির মধ্যে আছি যে চিঠির মত চিঠি লিখ্বার অবকাশ নেই। পাছে বেশী রাগিস্ তাই একটু লিখ্লাম। উনি বল্লেন তোকে তাঁর সাদর সম্ভাষণ জানাতে। আর ছুটি চেয়েছিস্ কেন? আমায় দেখ্তে বুঝি আর ইচ্ছে করে না? তবু কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। কর্ত্তা তোর ছুটি বাহাল করেছেন। বেণুকে তুই কষ্ট করে যা শিখিয়েছিস্, আমি এই দুমাসে তা বেশ করে ভুলিয়ে রাখ্ব এখন। তুই এসে ঠেলা সাম্লাস্।

আশা করি তোর মা বাবা ভাল আছেন। বোন কেমন পড়াশুনো কর্ছে?

এখানে সব ভালই, কেবল শাশুড়ী বাতে ভুগ্ছেন। আজ থামা যাক।

মনোজাদি।

ক্ষণিকার চিঠি আসার খবর লালু এমন উচ্চকণ্ঠে দিয়াছিল যে সেটা কাহারও জানিতে বাকি ছিল না। তাহার মা

পাশের ঘর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে কল্‌কাতার চিঠি নাকি ?"

ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁ মা।"

"কি লিখেছে রে ? অনাদি-বাবুই ত ?"

"আমি ছুটি পেয়েছি মা। বাড়ীর নূতন গিন্নি খবর দিয়েছেন। অনাদি-বাবু কিছু লেখেন নি।"

( ১৭ )

গ্রীষ্মকালের সূর্য্য এত সকালেই বা ওঠে কেন, আর তাহার সঙ্গে মানবশিশু পাল্লা দিতে না পারিলেই বা তাহার মা-বোনেরা এমন অনাবশ্যক চটিয়া ওঠে কেন, তাহা লালু অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিতেছিল না। ছোড়্‌দিটার এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া বড়ই আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; কথায় কথায় মারিবার জন্য হাত উঠাইয়া আসে। পিতা-মাতার অবিচারে লালুর উল্টিয়া তাহাকে দু ঘা দিবার পথটাও বন্ধ। ছোড়্‌দি নাকি এখন বড় হইয়া গিয়াছে, তাহার গায়ে হাত তোলা নাকি ভদ্রসন্তানের সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ। মন্দ যুক্তি নয়, মারিবার বেলা বড় হওয়ার কথাটা মনে থাকে না, না ?

"এই লালু, আমার নিব্‌ আর কলম তুই বুঝি কিছুতেই কিনে দিবি না ?"

লালু মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিল, "না দেবোই না ত। নিজের জিনিষ নিজে গিয়ে কিনে আননা।"

"তোর আজকাল বড় বাড় বেড়েছে, কথায় কথায় মুখ ভ্যাঙানি! নেহাৎ বাবা রাগ করেন, তা না হলে উচিত শিক্ষা দিতাম। ভাল চাও ত যাও বল্‌ছি।"

"তুমি ভাল চাও ত চুপ কর, শিক্ষা দিতে এলে তার চেয়েও ঢের বেশী শিক্ষা নিজে পেয়ে যাবে, তা জেনে রেখো। এইয়ো, আমার কলমে হাত দেবে না, বল্‌ছি।"

ভ্রাতা-ভগিনীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা আর মিনিট দুইয়ের মধ্যে বেশ জমিয়া উঠিত, হঠাৎ দরজার কাছে মানুষের পায়ের শব্দে দুজনেই লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেল। যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে চিন্ময়। এতক্ষণে অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি হচ্ছিল শুনি? লালু মিনুকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শেখাচ্ছিলি নাকি, না কুস্তি?"

মেনকা একেবারে সে-দেশ ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া লালু খুসি না হইয়া পারিল না। আচ্ছা জব্দ হইয়াছে ছোড়দিটা। চিন্ময়দার সাম্‌নে সাধু সাজিয়া কেমন থাকা হয়, আজ ত নিজমূর্ত্তি ধরা পড়িয়া গেল। চিন্ময়ের কথার উত্তরে বলিল, "মেয়েরা আবার কুস্তি জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শিখে কি কর্‌বে?"

চিন্ময় বলিল, "মেয়েরা আজকাল সবই শিখ্ছে, ছুদিন পরে তোমাদেরই রান্নাঘরে ঢুক্তে হবে, তারা কেবল ফুট বল গল্ফ্ খেলে আর ভোট দিয়ে দিন কাটাবে। তা তোমার ভাবনা নেই, রান্নাবান্না ত একরকম জানাই আছে, না ?"

তাহাকে এ-রকম কচি খোকার মত ক্ষ্যাপাইবার চেষ্টাতে লালুর রাগও হইল, হাসিও পাইল। চিন্ময়দাও দেখি মা-বাবারই দলের! তাঁহাদের মতে পৃথিবীর সব লোকই বাড়ে, গণ্যমান্য সম্মানের উপযুক্ত হয়,—এমন কি ছোড়্দিও,—কেবল লালুই চিরকাল ছোট থাকিয়া যায়। তাহাকে স্বচ্ছন্দে মারা চলে, ক্ষ্যাপান চলে, যা খুসি তাই করা চলে। যাক গে, তাহাকে ছোট মনে করিলেইত আর সে সত্যসত্যই ছোট থাকিয়া যাইবে না ? চিন্ময়ের ঠাট্টার উত্তরে একান্ত অবজ্ঞাসূচক হাসি হাসিয়া সে ঘরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বই খাতা কলম পেন্সিল সব আবার গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। চিন্ময় সেখান হইতে বাড়ীর গৃহিণীর সন্ধানে চলিল।

তিনি তখন রান্নাঘরের সাম্নের সরু বারাণ্ডায় বসিয়া তর্কারি কুটিবার জোগাড় করিতেছিলেন। মেনকা সেইখানে বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্তৃতাও বেশ চলিতেছিল। চিন্ময়কে আবার এদিকে

আসিতে দেখিয়া, "ঐ মা, তোমার ভাত উথলে পড়ল,"
বলিয়া সে চট্ করিয়া রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহার লজ্জার ঘটা দেখিয়া চিন্ময়ের হাসি পাইলেও সে গম্ভীরমুখেই আসিয়া বারাণ্ডার কোণে ভাঙা মোড়ার উপর বসিয়া বলিল, "কেমন আছেন সব? পরশু যদিও এসেছি কিন্তু এপর্য্যন্ত কাজের উৎপাতে একবার বেরতেও পাইনি।"

গৃহিণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, ভগবানের কৃপায় ভালই সব একরকম। দিদি ভাল আছেন? ও ভাঙা মোড়াটাতে বস্‌লে কেন? ও মিনু, রান্নাঘর থেকে একটা পিঁড়ে-টিড়ে দে ত? কি কর্‌ছিস গরমে আগুন-তাতে বসে?"

চিন্ময় বলিল, "মিনুর দেখ্‌ছি আজকাল বড়ই গৃহকর্ম্মে মন হয়েছে। সেধে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ভাল, ভাল।"

মেনকার মা হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গৃহকর্ম্মে মন ত কত, তার চেয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মারামারিতে মন ঢের বেশী। কি খেয়াল হয়েছে, গিয়ে ঢুকে বসে আছে। ক্ষণু ওর বয়সে দুবেলা সংসারের সব কাজ এক হাতে করেছে।"

মাতার আহ্বানে মেনকা একখানা পিঁড়ি বেশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া

আসিতেছিল। এমন সময় শেষোক্ত কথাগুলি তাহার কানে আসিয়া লাগিল। রাগে ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। পৃথিবীতে কেহ কি কখনও ভাইয়ের সঙ্গে এর আগে মারামারি করে নাই নাকি, যে, যে আসিবে তাহাকেই এমন আশ্চর্য্য খবরখানা দিতে হইবে? মায়ের যদি কোন বুদ্ধি আছে, ঘরের যেখানের যত খবর সবাইকে কেন যে বলা? দিদি না-হয় খুবই গুণবতী, তাহা হইলেও মেনকার বয়সে একবারও সে দাদার সঙ্গে মারামারি করে নাই নাকি?

চিন্ময় চোখ তুলিয়া মেনকার ক্রোধারক্ত মুখ দেখিয়া বলিল, "কি খবর, পড়াশুনো কেমন চল্‌ছে? হাফইয়ার্লির ভাবনা এখন থেকে ভাব্‌ছ নাকি, মুখ যে বেজায় গম্ভীর?"

মেনকা গাম্ভীর্য্যের বিন্দুমাত্রও হানি না করিয়া বলিল, "আমাদের মত বোকা লোকের অত পড়ার ভাবনা নেই। আমরা পড়্‌লেও যা, না পড়্‌লেও তা, তা হলে আর ভেবে মরি কেন? দিদির মত ভাল মেয়ে হলে না-হয় কথা ছিল।"

তাহার কথার ঝাঁঝে চিন্ময় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তাই নাকি? তোমার ত খুব সকাল সকাল দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছে দেখ্‌ছি। তোমার অসাধারণ ভাল মেয়ে দিদিটির খবর কি? কেমন আছেন তিনি?"

মেনকা আবার বসিয়া পড়িয়া শাক বাছা সুরু করিল। বলিল, "কি জানি, সে কি আর চিঠিপত্র লেখে আমাকে যে আমি বল্‌ব? মায়ের কাছে চিঠি আসে, মা-ই জানেন।"

মা বলিলেন, "নে নে থাম, কথা একবার শোনাতে পার্‌লে হয়! মেয়ে আর কিছু চায় না তা হলে। ক্ষণু আছে ভালই ত লিখেছে, দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যেই চলে আস্‌বে বোধ হয়। শরীর বেশ সার্‌ছিল ওখানে, তা যা আমাদের দশা, আরো যে দুমাস রাখ্‌ব তার জো নেই। এর পর এসে আবার কাঁধের জোয়াল কাঁধে নিতে হবে ত? যা চেহারা হয়েছিল মেয়ের, দেখে বুকের ভিতর আমার শুকিয়ে উঠ্‌ত। ভগবানের ইচ্ছায় একটু যে সেরেছে সেই ঢের। অত শীতে আমার পাঠাবার ত ইচ্ছে ছিল না, তা সবাই বল্‌লে—শীত হলে কি হয়, পাহাড়ে শরীর সারে খুব, মেয়েও জেদ ধর্‌ল, তাই পাঠালাম।"

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি অনাদি-বাবুর ওখানের সেই কাজেই যাবে নাকি?"

মেনকা তাহার মাকে উত্তর দিবার কোনো অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আহা, সে যেন ইস্কুলের কাজ আর-কি, তাই ছুটির পরে ঠিক সময় গাড়ী এসে দাঁড়াবে? গিন্নিপনা করার ভার আসল লোকেই নিয়েছে, তার আর

দিদির দর্‌কার কি ? তাকে ত আর বসে বসে মুখ দেখ্‌বার জন্যে কেউ একশো টাকা করে মাইনে দেবে না ?"

তাহার মা বলিলেন, "তা না দেয়, না দেবে। আমরা ত আর সাধ্‌ছি না ? ওরা নিজেরাই লিখেছিল যে ছুটি ফুরলেই আস্‌তে, তাই বল্‌ছি। আর বড়মানুষের বৌঝিরা কত কাজের তা ত জানাই আছে আমার, তারা ঘরে বসে গিন্নিপনা কর্‌লে ত ?"

মেনকা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, "মা যে কি অদ্ভুত কথা বলেন—ঠিক হিন্দু বাড়ীর বুড়ী গিন্নিদের মত ! তুমি বুঝি ভেবেছ মনোজাদি সারাদিন জুতো মোজা আর কুঁচিয়ে শাড়ী পরে চেয়ারে বসে থাকেন ? তাঁকে দেখ্‌লে আর বল্‌তে না। এত কাজ তিনি জানেন !"

তাহার হাসিতে যোগ দিয়া তাহার মা বলিলেন, "তা যেমন মানুষ, তেমনি কথা বলি। বুড়ী গিন্নি ত বটেই, আর জন্মেছিলামও হিন্দু সমাজেই। নেহাৎ তোর বাবা টেনে আন্‌লেন, তাই ত এলাম।"

"ভাগ্যে এসেছিলেন, তা না হলে এতদিন আমাদের কি যে হত ! মাগো !"

চিন্ময় বলিল, "কেন, বেশ ত হত। আমার ত মনে হচ্ছে 'কি'টা হলে তুমি খুসিই হতে।"

"এ রাম, কি যে যা-তা কথা বলেন আপনি! ভারি আহ্লাদ বেড়েছে আপনার না? অমনি কর্‌লে আর আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ব না।"

"নাও বাছা, পাগ্‌লীকে আর ক্ষেপিও না," বলিয়া কোটা তর্‌কারির থালা লইয়া গৃহিণী রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। মেনকা মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া ডালার তর্‌কারি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

চিন্ময় বলিল, "তোমার দিদি গিয়ে অবধি একটাও চিঠি লেখেনি তোমাকে?"

মেনকার রাগের বা রাগের অভিনয়ের পালা তখনও শেষ হয় নাই। সে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "জানি না, আপনার মত আমার ত আর দিদির ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না আর কি!"

চিন্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "না, তা ঘুম মাঝে মাঝে হয় বই কি। আচ্ছা যাই এখন।"

মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, চিন্ময়-দাও চলিয়া গেল, অগত্যা মেনকা উঠিয়া লালুর সন্ধানে চলিল। সে হতভাগাও এরি মধ্যে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কেন যে মানুষে পৃথিবীতে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মায়। পুরুষ-মানুষের মত তাহাদের নিজ কলম, খাতা সবই দর্‌কার অথচ তাহাদের

মত সোজাসুজি কিছুই সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। দিদিটা আসিবে যে কবে। লালু বাঁদরটা তবু দিদি থাকিলে একটু পদে থাকে। নারীজন্মের অশেষ দুঃখে কাতর হইয়া মেনকা দিদিকে চিঠি লিখিতেই বসিয়া গেল। তাহার মনটা দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে সত্যসত্যই বেশ ভার হইয়া আসিল।

এমন সময় প্রবোধ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মিনি, কি কর্‌ছিস্ রে? আমার গেঞ্জিতে দুটো বোতাম লাগিয়ে দেনা। দে এখুনি, আবার আফিসের বেলা হয়ে যাবে।"

"বাপ্‌রে বাপ, তোমাদেরি কাজ আছে, আর আমাদের নেই কিছু নাকি? দিদির চিঠিটাও শেষ কর্‌তে দিলে না, আজ আর তা হলে যাবে না।"

"নে নে ভারি লাট-সাহেবের ডেস্‌প্যাচ লিখ্‌ছেন মেয়ে। চিঠি থাক এখন, দিদিকে হাতে করেই দিস্, কতই বা আর দেরি হবে?"

মেনকা বিনুনী সুদ্ধ মাথাটা সজোরে দোলাইয়া বলিল, "আহা কি সময়ের জ্ঞান গো তোমার! পনেরো দিন আর পনেরো ঘণ্টা ঠিক সমান, না?"

প্রবোধ বলিল, "মেলা বক্‌বক্ করিস্ নে। একটা বোতাম লাগাতে বল্‌লাম তা সুরেন বাঁড়ুয্যের মত লেক্‌চার

দিতে বল্‌ল। পনেরো দিন, না তোর মাথা! ক্ষণি ত কাল সকালেই আস্‌ছে, এই টেলিগ্রাম এল।"

মেনকা একটানে ফড়ফড় করিয়া নিজের অর্দ্ধলিখিত চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "সেটা আগে বল্‌লে কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেত তোমার?" এই বলিয়া প্রবোধের গেঞ্জিটা তুলিয়া লইয়া সশব্দে পা ফেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। সংসারের সব ক'টা মানুষ যেন জোট করিয়া আজ তাহার পিছনে লাগিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

"মা শুন্‌ছ? তুমি ত চিন্ময়দাকে বলে দিলে যে দিদি কুড়ি দিন পরে আস্‌বে। তিনি যে কালই আস্‌ছেন?"

"কে বল্‌লে তোকে?"

"কে আবার বল্‌বে? টেলিগ্রাম এসেছে, তা দাদা সেখানাকে সযত্নে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাছে কেউ দেখে ফেলে। বোতাম লাগানো নিয়ে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে গিয়ে নেহাৎ কথাটা বেরিয়ে পড়্‌ল।"

তাহার মা কড়াটা উনান হইতে নামাইয়া রাখিয়া প্রবোধের কাছে সঠিক খবর জানিতে চলিলেন। মেনকা সেইখানে বসিয়া প্যাট্‌ প্যাট্‌ করিয়া কাপড়ের ভিতর ছুঁচ চালাইয়া মনের রাগটা খরচ করিতে লাগিল। বিশ্বসংসারের উপর আজ কি কারণে জানি না তাহার রাগ ধরিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া তাহার অল্প একটু ভাল লাগিল। পাছে ষ্টেশনে তাহার যাওয়া না-যাওয়া লইয়া কোনো কথা উঠে, সেই সম্ভাবনাতেই সে সবার আগে কাপড়-চোপড় পরিয়া পরম ব্যস্তভাবে প্রবোধের কাছে গিয়া বলিল, "বা রে! দিদিকে কেউ আন্‌তে যাবে না নাকি?"

সে বলিল, "তুই ত যাচ্ছিস্, তা হলেই হল।"

"আঁহা তা হলেই যদি হত, তবে আর তোমায় বল্‌তে আস্‌ত কে? যাবে কি না বলনা?"

তাহার মা ঘরে আসিয়া বলিলেন, "যাবে বাপু যাবে, সবাই যাবে, সকালে উঠেই চেঁচামেচি সুরু করো না।"

প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পৌছিয়া দেখা গেল ট্রেন আসিতে তখনও দেরি আছে। প্রবোধ বলিল, "এখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাবি না, যা ওয়েটিংরুমে বস্‌গে যা, গাড়ী এলে ডাক্‌ব।"

মেনকা বলিল, "দূর ছাই, দাদার সঙ্গে আবার মানুষে আসে! এখন সেই পচাগন্ধওয়ালা ঘরে গিয়ে বসে থাকি। কেন যে এলাম। চিন্ময়দা থাক্‌লে বেশ বেড়াতে দিতেন। লালু, আয়না আমার সঙ্গে।"

লালু বলিল, "থাক্ না, অতয় আর কাজ কি? শেষে জরিমানা দিয়ে মরি, মেয়েদের ওয়েটিংরুমে ঢুকে।"

"যা, যা, ভারি পুরুষ হয়েছেন, পরশু অবধি হাফটিকিটে বিনা-টিকিটে যেতেন, ওর আবার কথা শোন।"

সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনটা এই সময় আসিয়া পড়াতে তাহাকে আর পচা ঘরে ঢুকিতে হইল না, দরজা অবধি গিয়াই সে ফিরিয়া আসিল। লালু বলিয়া উঠিল, "ঐ যে দিদিকে দেখা যাচ্ছে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, কই কিছু এমন ত মোটা হয়নি?"

মেনকা বলিল, "দূর বোকারাম, আগে নামতেই দে! এমনি মোটা হবে যে তুই এত দূর থেকে বুঝতে পারবি? তা হলেই হয়েছে আর কি!"

ক্ষণিকা নামিয়া পড়িতেই লালু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। মেনকার দিদিকে প্রণাম করা বিশেষ অভ্যাস ছিল না, তবু লালুর ভক্তির আতিশয্যে বাধ্য হইয়া তাহাকেও কোনোমতে একটা প্রণাম করিয়া ফেলিতে হইল। মাথা তুলিয়াই বলিল, "কই, কি এমন সারলে? ভারি যে ঘটা করে মাকে লিখে পাঠাতে? কেবল গালের কাছটা একটু লাল হয়েছে।"

লালু সুবিধা পাইয়া বলিল, "তবে কি আগাগোড়া 'সব লাল' হয়ে যাবে নাকি? এ কি ভারতবর্ষের ম্যাপ পেয়েছ?"

ভাইবোনের ঐতিহাসিক আলোচনা সুরু হইতে না

হইতেই প্রবোধ তাহাদের লইয়া গাড়াতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই ক্ষণিকা বলিল, "চিন্ময়দা কি এখানে নেই নাকি?"

মেনকা বলিল, "থাকবেন না কেন? তা তিনি থট্‌রীডিং জানেন বলে ত আর কিছু শুনতেও জানেন না। কালই বেচারা তোমার খবর নিতে এসেছিলেন, তা মা তাঁকে বলে দিলেন তুমি কুড়ি দিন পরে আসবে। তিনি আর জানবেন কি করে তাহলে?"

প্রবোধ মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "এইবার খবরের কাগজে arrival, departureএর নোটিশ ছাপিয়ে তবে পথে বেরিয়ো। তা হলেই অভ্যর্থনা করবার যথাযোগ্য লোক হাজির থাকবে।"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া লালু-মেনকাও আর কিছু বলিল না। বাড়ী আসিয়া পৌছিতেই ক্ষণিকা রোগা হইয়াছে কি মোটা হইয়াছে, আরো ফর্শা হইয়াছে না কালো, তাহা লইয়া বাড়ীর ঝি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি মানুষই সম্পূর্ণ স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বসাতে, ক্ষণিকার এত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহই অবকাশ পাইল না। বাস্তবপক্ষে ক্ষণিকার চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, মুখে একটু রক্তসঞ্চার

হওয়া এবং চোখের দৃষ্টির শূন্যতাটা কাটিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু দুই মাস পরে যে মানুষ কয়েক শ মাইল দূর হইতে ফিরিয়া আসিল, তাহার একটুমাত্র পরিবর্ত্তন মানুষের চোখে উচিত মনে হয় নাই। অগত্যা নিজেকে এবং পরস্পরকে বুঝাইবার জন্য অনেকগুলি কাল্পনিক উন্নতি বা অবনতিকে রঙ্গমঞ্চে টানিয়া আনিতে হয়।

খানিক পরে, মেয়েকে জলটল খাওয়ানো হইয়া যাইবার পর ক্ষণিকার মা বলিলেন, "এত তাড়াহুড়ো করে চলে এলি যে? আর দিন কতক থেকে এলেই পারতিস্, শরীর যখন সারছিল?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা হপ্তাখানেক থাকতে পারতাম হয়ত, কিন্তু যোগেশ-বাবুরা আসছিলেন, আবার দেরি করলে হয়ত সুবিধামত সঙ্গী পাব না, তাই চলে এলাম।"

মেনকা বলিল, "কেন মোটে এক সপ্তাহ কেন? তোমার এত তাড়াতাড়ি কিসের, আমার মত ত আর স্কুল নেই?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "স্কুল নেই বলে কি আমার চিরদিনের ছুটি হয়ে গেছে? কাজ কর্ম্ম করতে হবে না আর?"

তাহার মা বলিলেন, "আহা আগে কাজ ঠিকই হোক, তারপরে এলেই পারতিস্?"

ক্ষণিকা মাদুরের উ[illegible]পর আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "আমার কাজ বেঠিক হল[illegible] কবে, যে, আবার ঠিক হবে?"

ক্ষণিকার মা ব[illegible]লিলেন, "ওরা কি আবার যাবার কথা লিখেছে নাকি কিছু[illegible]?"

ক্ষণিকা পা[illegible] ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"কি[illegible] লিখেছে?"

"[illegible]অনাদি-বাবু লিখেছেন তাঁর স্ত্রীর শরীর ভাল নয়, আমি গেলে ভা[illegible]ল হয়। যত শিগ্‌গির পারি যেতে লিখেছেন।"

"ও [illegible], নিশ্চয় তোমার দুধ পুড়ছে, ভীষণ গন্ধ উঠেছে," বলি[illegible]য়া চীৎকার করিয়া মেনকা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া [illegible] গেল। তাহার মাও ব্যস্ত হইয়া তাহার পিছন পিছন দ্রু[illegible]তপদে চলিয়া গেলেন।

ক্ষণিকা [illegible] উঠিয়া পড়িয়া নিজের ছাড়া জামা জুতা শাড়ী সব [illegible] গুছাইতে আরম্ভ করিল। বিছানার মোটটা একবার খুলিবার উপক্রম করিয়া আবার রাখিয়া দিল। দুদিন পরেই ত আবার মোট বাঁধিতে হইবে তবে আর খোলাখুলি কেন?

প্রবোধ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওরে তোর কাছে ভাঙানো পয়সা আছে? ট্যাঁকে যা ছিল সবই ত গাড়োয়ান ব্যাটাকে বিদায় করতে খরচ হয়ে গেল। আফিসে গিয়ে এক পয়সার পানও ত কিনতে হবে?"

ক্ষণিকা হাতব্যাগ হইতে কম্বে ...তাটা কাটিয়া যাওয়া ছাড়া হাতে দিতে দিতে বলিল, "এরি মাস পরে যে মানুষ কয়েক শ সময় হয়ে গেল ?" ...হার একটুমাত্র পরিবর্ত্তন

"হবে না ? কতখানি হাঁটতে হয়... । অগত্যা নিজেকে ফেলিয়া মাথার টেড়ি ঠিক করিতে করি...গুলি কাল্পনিক উন্নতি হইয়া গেল । ...য়।

প্রবোধ নিজেদের সরু গলিটা পার হইয়া বড় হইয়া যাইবার দিবা মাত্র, পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "হিড়ো করে চলে এত দেরি ?" ... পারতিস্, শরীর

প্রবোধ পিছনে ফিরিয়া দেখিল চিন্ময়, বলি... ক্ষণির তাক্ লেগে গেল এত সকালে পারতাম হয়ত, কিন্তু সে আজ এল, জান না ?" ...দেরি করলে হয়ত

চিন্ময় বলিল, "না, জান্‌ব কি করে ? ..." এল যে ? এখন এখানেই থাক্‌বে ?"

প্রবোধ বলিল, "অতশত জানি না। কল্‌কাতার সেই চাক্‌রিতে আবার ডাক পড়েছে বুঝি। সব খবর জান্‌তেই পারবে, আমাদের ওখানে যাচ্ছ ত ?"

চিন্ময় যে-পথে আসিতেছিল তাহাতে প্রবোধ ঠিকই অনুমান করিল বলা চলে। কিন্তু হঠাৎ উল্টা পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া চিন্ময় বলিল, "না, অন্য কাজে যাচ্ছি।

ক্ষণিকা মাদুরের উ[...]রণ [...] হলে আবার? দেখি, বিকেলে যদি
"আমার কাজ বেঠিক হল[...]
ক্ষণিকার মা ব[...]

( ১৮ )

লিখেছে নাকি কিছু[...]

ক্ষণিকা প[...]ও [...] যাওয়াটা ক্ষণিকা এমন হঠাৎ ঠিক করিয়া
"[...] যে, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া, ধীরে সুস্থে গিয়া
"[...]তে হইবার কোনো অবসর রহিল না। পাহাড় হইতে
গেলে ভা[...] দিন দুই পরেই খাইতে বসিয়া বলিল, "এর পর ত
"ও [...] কগাড় দেখতে হয়।"
উঠেছে," ব[...] সেয়া বলিলেন, "তা ওদের লেখ্‌, কবে যেতে বলে
বাহির হইয়া [...]বরপর যাস্‌ না হয়। সঙ্গে যাবে কে?"
পিছন পিছন দ্র[...]লিল, "যেতে ত বলেইছে, আবার কতবার
ক্ষণিকা [...]ব? আর সঙ্গে যাওয়ার আবার ভাব্‌না! প্রতি
[...] ট্রেনেই কত চেনা মানুষ কল্‌কাতায় যাচ্ছে।"

মেনকা ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "দিদি এক মেয়ে! ঘরের ভাত দুদিন ওর পছন্দ হয় না। হিল্লীদিল্লী ছুটে বেড়াতে পার্‌লে আর ও কিছুই চায় না।"

ক্ষণিকার প্রতি ঠাট্টাচ্ছলেও কোনো দোষারোপ ক্ষণিকার মা একেবারে সহিতে পারিতেন না। মেনকার কথায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের ঘরের ভাত খাবার ব্যবস্থা

কর্‌তেই না দিদির অত ছুটোছুটি ...ছেন, ...টি করতে হয়? না হলে দিদি অমন তোমাদের মত ঝ... র কথ...ড়র আগে কুটি নেচে বেড়াবার মেয়ে নয়।"

সব কথাতেই দিদির গুণ ব্যা... সাহার হইল। আর তাহার নিজের গুণের অভাব সম্বন্ধে মন্তব্য আসিয়া উপ... গুলি ক...ত হয়, ইহাতে মেনকা হাড়ে চটিয়া যাইত। রাগ করিয়া সাধের ... ডাঁটাগুলা অচর্ব্বিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াই সে ভাত খা... হইয়া ... সাঙ্গ করিয়া ফেলিল। উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল, ... বেশ গো বেশ, দিদি না-হয় সবই কেবল পরোপকারের ... পার্‌ ... জন্য করে। তবু আমরা পাঁচটা নিষ্কর্ম্মা ভুত আছি বলেই ... ত পারে অত উপকার কর্‌তে? সবাই যদি উপকার ক... পার্‌তে চাইবে, উপকারগুলো চড়্‌বে কার ঘাড়ে?"

ক্ষণিকা বসিয়া বসিয়া নীরবেই তাহার সম্বন্ধে অ... আলোচনাটা শুনিতেছিল। তাহার মা জন্মাবধি কন্যাকে দেখিতেছেন, ... করিয়া ... তিনিও তাহাকে চিনেন না, বোন যে অপেক্ষাকৃত অল্প-দিন দেখিতেছে, সেও চেনে না। যে যাহাকে যেমনিটি চায়, কল্পনা ও বিশ্বাসের সাহায্যে তেমনিটাই পায়, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে। মানুষকে পরে ত চেনেই না, সেও নিজেকে চিনে না। আমরা কখন যে কোন্ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কোন কাজটা করি, তাহা যথার্থ প্রায় কোন সময়েই

বুঝি না। যে কার্য্যকারণ গুভ সম্বন্ধটাকে যে সময় ভাল মনে হয় সেটাকে গ্রহণ করিয়াই নি য শ্চিন্ত হওয়া যায়।

এই যে ক্ষণিকার তা কলিকাতা যাওয়ার ব্যগ্রতার কারণ লইয়া মেনকা আর তর তাহার মায়ে তর্ক হইয়া গেল, তাহাদের দুজনের একজনও মা তাহার যথার্থ মনোভাবটা বুঝিতে পারে নাই সে কথা না হয় অবিলম্বেই বোঝা গেল। কিন্তু যথার্থ মঁ সুক্ষ্ম নাভাবটা কি? ক্ষণিকা কি নিজেই তাহা জানে? জানিলে পরস ও কি তাহা সত্য বলিয়া সে নিজের কাছে স্বীকার করে? সে কলিকাতায় যাওয়ায়, যে গৃহকে অসীম বেদনার মধ্যে দিয়া গৃহ সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সেইখানেই আবার ফিরিয়া যাই জ্ঞা বার এই যে তাহার মনের ব্যাকুলতা, ইহার মূল কোথায় জিব ইহার জন্ম তাহার কোন্ মনোভাব হইতে?

কা র তাহার করিতেই হইবে, আর এই কাজটা সকল দিক হইতেই সুবিধাজনক, এ কথাটার মধ্যে মিথ্যা কোনোখানে নাই। সংসারের লোকের কাছে এ কথাটা বেশ জলের মত সরল, যে শুনিবে সেই বিশ্বাস করিবে; নাও যদি করে, তাহা মুখে ক্ষণিকার সামনে একজনও প্রকাশ করিবে না।

কিন্তু ক্ষণিকা জানে, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে ইহা একান্ত সত্য বলিয়া জানে, যে, তাহার কলিকাতা

যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ অন্ত...ছে। লোকের কাছে সে যখন যাওয়ার কারণ ভাঙিয়া বলি...বে, তখন সে প্রায় মিথ্যাই বলিবে। সে মিথ্যার যে আঘ... ...ত, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা তাহার মন ...হই সারাক্ষণই করিতেছে। কিন্তু হৃদয়ের কষ্টিপাথরে যে মেকী ধ...ড়া না পড়িয়া যায় না! ঘুষ দিয়া তাহার কাছে লাভ নাই। ...দায়।

এই যাওয়ার ফল তাহার পক্ষে শুভ হইবে, ... হইয়া ...না অশুভ হইবে; যে কঠিন বন্ধনে সে বন্ধ, তাহা হইতে ই...ড়া ক...হোর ফলে সে মুক্তি পাইবে, না বন্ধন কঠিনতর হইয়া তাহাকে ...পার...জন্য দুর্গতির অতলতলে টানিয়া লইয়া যাইবে; তাহা কে বলি... ...তে পারে? ক্ষণিকা কি সে কথা একবার চিন্তা করিয়া ...পারত...রূপে দেখে নাই? মানুষের স্বার্থচিন্তা প্রায় কোনো সময়েই তা... ...দেবি... ...হাকে ছাড়িয়া দেয় না, ক্ষণিকা কি ভাবিয়া দেখে নাই যে এই যা... ...তিশ... এ...বার ফলে তাহার কোনও সার্থসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ...বিয়া যে...

অনাদিনাথের পত্র আসিবার পর হইতেই এইসব চিন্তা তাহাকে এক মুহূর্তও নিষ্কৃতি দেয় নাই। কিন্তু যথাসাধ্য ভাবিয়াও ক্ষণিকা কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিল না। তাহার শুভ কিসে, অশুভই বা কিসে, তাহা বে সে কোনমোতে ভাবিয়া পায় না? সাংসারিক অভিধানে যে কথার যে অর্থ, তাহার হৃদয় যদি সে অর্থ মানিতে

নাই চায়? আর শুভ ও অশুভকে ভাষায় যেমন পরস্পর বিরোধী দেখায়, তাহাদের যথার্থ স্বরূপ কি তাই? মানুষ কবে নিঃসংশয়িতরূপে তাহাদের চিনিতে পারিয়াছে? শুভ যে কতদিন অশুভের ছদ্মবেশে আসিয়া দেখা দেয়, তাহার কি ঠিকানা আছে? আপনার অন্তরের মধ্যে চাহিয়া ক্ষণিকা এই কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যবচ্ছেদ-রেখা কোথাও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত না, গঙ্গা-যমুনার মত তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া যেন এক হইয়া রহিয়াছে, সে কেমন করিয়া একটিকে ত্যাগ করিয়া আর-একটিকে গ্রহণ করিবে? আর এই যে বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহা কি সত্যই তাহার মনে আছে? তাহার সামাজিক সংস্কার, তাহার বিচারবুদ্ধি বলে যে মুক্তিই তাহার কামনা করা উচিত, কিন্তু কামনার জন্ম যে নিভৃত প্রদেশে, তাহা কি মরুভূমিরই মত রিক্ত পড়িয়া নাই?

ক্ষণিকা দেখিল ভাবনার অন্ত নাই, কিন্তু দিন যে বহিয়া যায়! সর্ব্বভাবনা নিঃশেষে সমাপন করিয়া পরে কাজে নামিবার অধিকার ভগবান ক'টা মানুষকেই দিয়াছেন? আহ্বান ত তাহার অন্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাকেই না-হয় মানিয়া লওয়া যাক। ফলে যাহা হয়, তাহার ভাবনা ভাবিবার সময়ের অভাব হইবে না।

যাওয়া যখন স্থির, তখন অগত্যা তাহার আয়োজনও অল্পস্বল্প করিতে হয়। মেনকা বলিল, "দিদি, যদি আর সাত আট দিন দেরি কর্‌তে, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গেই যেতাম। না-হয় বাকি ক'টা দিন মাধবীদের বাড়ী থাক্‌তাম, সে ত আমাকে সারা ছুটিই রাখ্‌তে চাইছিল।"

ক্ষণিকা বলিল, "তোর যাবার তাড়া কিসের? প্রায় তোর স্কুল খোলার সময়েই ত চিন্ময়দারা যাচ্ছেন কল্‌কাতায় জ্যাঠাইমার চোখ দেখাতে, তাঁদের সঙ্গে গেলেই হবে।"

লালু বলিল, "সেই ভাল, চিন্ময়দাদের ঢের লগেজ যাবে, তার মধ্যে ছোড়দিকেও দিলে হবে। দিদি একলা যাচ্ছে, ওর সঙ্গে জিনিষ কম থাকাই ভাল?"

মেনকা বলিল, "তোমাদের জাতটাই আছে কুলিগিরি কর্‌তে, জিনিষ নিয়ে যেতে ভাবনা কি? দিদিকে ত আর আমায় ঘাড়ে করে বইতে হবে না?"

চিন্ময় ঘরে ঢকিয়া বলিল, "ইংরিজিতে যে বলে যে দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর মুখ থেকেই আসল তত্ত্বকথা বেরয়, সে কথা অতি ঠিক। অনেক জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে আলাপ আছে, কিন্তু তারা মিনু আর মাধবীর কাছে এ বিষয়ে দাঁড়াতেই পারে না। কিন্তু কোন্ জিনিষ বহন করাবার জন্যে কুলীর খোঁজ হচ্ছিল? পুঁটলীপোঁটলা ত বেশ গোটা কয়েক দেখ্‌ছি!"

লালু বলিল, "ও অচল পুঁটলিগুলো দিদির, আমরা একজন সচল পুঁটলির ভাবনা ভাব্‌ছিলাম।"

চিন্ময় ক্ষণিকার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আজই যাচ্ছ নাকি? আমি ভেবেছিলাম কয়েকদিন দেরি আছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আজ না, কাল দশটার ট্রেনে যাব।"

চিন্ময় বলিল, "যাক, আজ হলে তোমার একটা নেমন্তন্ন ফস্‌কে যেত। মা আমায় বল্‌তে পাঠালেন, যে, রাত্রে তোমাদের চার ভাই-ভগিনীর আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন।"

লালু বলিল, "ভাগ্যিস্‌ দিদি যাচ্ছে না আজ, তা না হলে ওর জন্যে আমাদের খাওয়াটাও মাঠে মারা যেত।"

মেনকা বলিল, "সত্যি, আমাদের যেন কোনো দামই নেই, সব জায়গায় দিদির লেজুড় হয়েই যেতে হবে।"

চিন্ময় বলিল, "অত রাগ করে কাজ নেই, আর বছর দুই তিন যাক, তখন তোমারই দিন আস্‌বে, দিদিকেই তখন লোকে তোমার খাতিরে নেমন্তন্ন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌বে।"

মেনকা বলিল, "আহা, তার জন্যেই যেন আমার ভাবনা। সবাই বেশ ভেবে বসে আছে যে দিদির হিংসেয় আমার যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। মোটেও তা নয়। একজনকে আর-একজনের খাতিরে আদর করা জিনিষটাই আমি দেখ্‌তে পারি না।"

লালু বলিল, "আঃ, ছোড়দি কি যে লেক্‌চার দিতে ভালবাসে। ওকে আমাদের ডিবেটিং ক্লবের মেম্বর করে নেব, খুব লেক্‌চার দিতে পারবে তা হলে। আমাদের যেদিন ক্লব বসে, সেদিন মহা ভাবনা হয় যে কি করে স্যারের চোখ এড়িয়ে ফাঁকি দেব, কেবলি ঘাড় নীচু করে ব্যাক্‌বেঞ্চে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে ত ঘাড়ে ব্যথা ধরে যায়।"

ক্ষণিকা বলিল, "নে বাপু, একটু বাইরে গিয়ে যার যা বল্‌বার আছে, বল্‌গে যা। আমাকে জিনিষপত্র ক'টা গুছিয়ে নিতে দে।"

চিন্ময় বলিল, "তোমার আর তর সইছে না ?"

ক্ষণিকা মাথা নীচু করিয়া জিনিষ গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "তর সওয়াসয়ি আর কি আছে এর মধ্যে ? যেতে যখন হবে, তখন জিনিষগুলোকে আগে হোক, পরে হোক বাক্সের মধ্যে পূরে ত রাখ্‌তে হবে ?"

চিন্ময় কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার একটু আগে লালু বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতেই তাহার মা বলিলেন, "এই, এখুনি পালাস্‌নে যেন, আমাকে পয়সা দুয়ের মুড়ি কিনে দিয়ে যা।"

লালু বলিল, "এখন আবার মুড়ি নিয়ে কি কর্‌বে ?"

তাহার মা বলিলেন, "মুড়ি নিয়ে আবার মানুষে কি করে? ছেলের কথা শোন।"

লালু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আহা মুড়ি যে খায় তা আমি বেশ ভাল করেই জানি, কিন্তু এমন সময় ত তুমি রোজ মুড়ি খাও না, তাই বল্‌ছি।"

মা বলিলেন, "তোরা সবাই যাবি নেমন্তন্ন খেতে, আর আমি বুঝি একলার জন্যে এখন রাঁধ্‌তে বস্‌ব? যা মিনির কাছে দুটো পয়সা চেয়ে নে, নিয়ে চট্ করে এনে দে।"

লালু ঘরে ঢুকিল। মিনিট-দুই পরে চীৎকার শোনা গেল, "দিদি, শিগ্‌গির এসে পয়সা দিয়ে যাও, ছোড়্‌দি এখন ফ্যাশান কর্‌ছেন, তিনি হাতবাক্স খুল্‌তে পার্‌বেন না।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল, "নাও থাম, বাড়ীর ভিতর কে কি কর্‌ছে তা তোমার চেঁচিয়ে পাড়ার লোককে জানাতে হবে না। এই যে পয়সা।"

মেনকা তখন একমনে এলো খোঁপা বাঁধিতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, "দিদি, খোঁপাটা কেমন হয়েছে? অন্য দিনের চেয়ে বড় হয়েছে, না?"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, হয়েছে ত বেশ।" পাশের চেয়ারের উপর চোখ পড়াতে ক্ষণিকা দেখিল, এবার মেনকার

জন্মদিনে তাহাকে সে নিজে যে রঙীন ঢাকাই শাড়ীখানা দিয়াছিল, সেটা বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে। ক্ষণিকা বলিল, "হ্যাঁরে, এই দুপা দূরে জ্যাঠাইমার ওখানে যাবি, তারি জন্যে এত সাজের ঘটা হচ্ছে?"

মেনকা গাল ফুলাইয়া বলিল, "যত বেশী দূরে যেতে হয়, তত বেশী সাজ্‌তে হয় তা ত আর জানতাম না? তা হ'লে ট্রেনে উঠ্‌বার সময় সবাই বেনারসী পরে ওঠে না কেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা না-হয় হয়, অত সাজ তোর দেখ্‌বে কে?"

মেনকা রীতিমত রাগিয়া বলিল, "কাউকে দেখ্‌তে হবে না, আমি নিজেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব এখন।"

তাহার মা ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "ওরে একটু সকাল করে যা না-হয়, ফির্‌তে যেন রাত করিস্ না বেশী। যে আঁধার, লোক সঙ্গে না নিয়ে দুই বোনে যেন রাস্তায় বেরিয়ে পড়িস্ না।"

দুই ভগিনীর সাজসজ্জা সমাপ্ত হইতে না হইতেই লালু বাহির হইতে চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি এইবার যাচ্ছি কিন্তু, কারু জন্যে দাঁড়াতে-টাঁড়াতে পারব না।"

তাহাকে দাঁড়াইতে হইল না, বোনেরাই তাড়াতাড়ি

করিয়া হাতের কাজ সারিয়া তাহার সঙ্গ লইল। প্রবোধ যে কখন আসিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না, কাজেই তাহার জন্য অপেক্ষা করা কেহই প্রয়োজন মনে করিল না।

চিন্ময়ের সঙ্গে সদর দরজা পার হইয়াই দেখা হইল। মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমাদের নিতে আসছিলেন নাকি?"

চিন্ময় একটু হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

সকলে একসঙ্গেই আসিয়া চিন্ময়দের বাড়ী ঢুকিল।

হিরণ্ময় আজ সকালের গাড়ীতে হঠাৎ বাড়ী আসিয়া হাজির হইয়াছিল। লালু তাহার একজন মহাভক্ত, যদিও বছর দেড়ের ছোট বলিয়া হিরণ্ময় এখন পর্য্যন্ত লালুকে একটু কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। লালুকে দেখিয়া সে ঘর হইতে লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইয়া বলিল, "আর-একটু আগে এলি না কেন? অনেকগুলো ভাল ভাল জিনিষ এনেছি। আমার ষ্ট্যাম্প আর দেশলাইয়ের লেব্‌লের খাতাগুলো যদি দেখিস! এ সহরে এমন আর কারুর থাকৃতে হয় না।"

মেনকা হঠাৎ একলা পড়িয়া গেল। চিন্ময় আর ক্ষণিকা একটু আগে ছিল, হিরণ্ময় লালুদের পথে আসিয়া পড়াতে,

তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। এখন লালু ও হিরণ্ময়ের ঘরে ঢোকাতে মেনকা যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সুখের বিষয় তাহাকে এমন অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে হইল না, মিনিট তিন-চার পরেই হিরণ্ময় মাথাটা বাহির করিয়া বলিল, "এই, তুমি দেখ্‌বে না?" এই আহ্বানেই খুসি হইয়া মেনকা তাহাদের অনুসরণ করিল।

ক্ষণিকা রান্নাঘরের দিকে সোজা চলিয়াছে দেখিয়া চিন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "চলেছ কোথায়? তোমায় ত খেতেই বলা হয়েছে, রাঁধ্‌তে ত আর বলা হয়নি?"

ক্ষণিকা বলিল, "জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা করে আসি একটু। নিজে রাঁধ্‌ব না বলে, যিনি রাঁধ্‌ছেন তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌তে ত দোষ নেই?"

চিন্ময় ইতস্তত করিয়া বলিল, "আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বল্‌ব ভেবেছিলাম। আগেই বলা উচিত ছিল বোধ হয়, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আচ্ছা মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসো।"

ক্ষণিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

সেখানে তখন রীতিমত ধূম্রলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। চিন্ময়ের মা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এখন এ ঘরে

না বাছা, যেমন গরম, তেমনি ধুঁয়ো এখানে। বাইরে যাও, আমি একটু পরেই আস্‌ছি।”

অগত্যা ক্ষণিকাকে আবার বাহির হইয়া আসিতে হইল।

চিন্ময় ঠিক সেই ভাবেই সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া ছিল। ক্ষণিকাকে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া বলিল, “ছাতে চলনা ? নীচে বড় গরম।”

ক্ষণিকা বলিল, “চল।” তাহার সম্মুখে কি যে আসিতেছে তাহা তাহার স্পন্দিত হৃদয় নিশ্চিত করিয়াই বলিয়া দিতেছিল, কিন্তু পলায়নের পথ সে কোনোখানেও দেখিতে পাইল না।

ছাতে আসিয়া দুজনে পাশাপাশি খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যাস্তের পর তাহার শেষ রশ্মি-রেখাগুলি এখনও আকাশকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। বিদায়গ্রহণোন্মুখ প্রিয়ের দৃষ্টির মত সেই ম্লান আলোটুকু বড় করুণ হইয়া মাটির বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। সান্ধ্যবায়ুর মৃদু হিল্লোল ক্ষণিকার মনে যেন কোন্ হতাশা-পীড়িত বিশ্বের দীর্ঘনিশ্বাসের মত আসিয়া বাজিল।

হঠাৎ তাহার একেবারে সাম্‌নে আসিয়া চিন্ময় বলিল, “ক্ষণিকা, একবার আমার মুখের দিকে তাকাও।”

ক্ষণিকা তাহার ব্যথিত দৃষ্টি বাহির হইতে ফিরাইয়া

আনিয়া চিন্ময়ের মুখের উপরেই স্থাপিত করিল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, সে প্রাণপণ শক্তিতে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

চিন্ময় তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বুঝ্‌তে ত পেরেছ। তোমাকে ত আমার মুখের কথায় কিছুই বল্‌তে হল না।"

ক্ষণিকা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই রহিল, হাত ছাড়াইবারও চেষ্টা করিল না। কেবল তাহার চোখের জল সকল বাধা ভাঙিয়া দুই চোখ বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

চিন্ময় বলিল, "উত্তর দাও, কিছু কি বল্‌বার তোমার নেই?"

ক্ষণিকার কণ্ঠস্বর যেন হারাইয়া গিয়াছিল। কি বলিবে সে? আশৈশবের সঙ্গী, তাহার সকল দুঃখ-বেদনার সমভাগী, তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিতেও প্রস্তুত এই যে মানুষটি, ইহাকে কঠিন আঘাত করা ছাড়া উপায় নাই কি? জগতে কি আর মানুষ ছিল না? ক্ষণিকার জন্যই ভগবান এই কাজটা এতদিন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন?

কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশায় যে এখনও চিন্ময় তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে? অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "চিন্ময়দা, আমাকেও কি তুমি অমনি বুঝ্‌বে না? কথা বলে আমি

আর কি জানাব? ভেবেছিলাম তোমাকে আঘাত করার দুঃখটা অন্ততঃ ভগবান আমায় দেবেন না, কিন্তু তার থেকেও আমি নিষ্কৃতি পেলাম না।"

চিন্ময় তাহার হাত ছাড়িয়া সরিয়া গেল। ক্ষণিকা সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এতদিনের সঞ্চিত যত বেদনা, বিফল বাসনা, হতাশা, ক্ষোভ, সব যেন পথ পাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিক পরে চিন্ময়ের কণ্ঠস্বর আবার তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল, "তুমি এমনি করে নিজের জীবনটাকে মাটি করবে? মরীচিকার পিছনে ছোটা কি এতই লোভনীয় তোমার কাছে?"

ক্ষণিকা মাথা তুলিয়া বলিল, "চিন্ময়দা, তুমি কি ভাবছ যে আমার দুঃখ খুব কম? এইসব প্রশ্ন করে আর কি হবে?"

চিন্ময় বলিল, "কিছুই হবে না। কোনো প্রশ্ন করাই আমার বোকামি হয়েছিল, উত্তরটা আমি একরকম ঠিকই জানতাম। কিন্তু তবু আশা ছিল তোমার শুভবুদ্ধি হলেও হতে পারে। কিন্তু দেখছি জগতে দুঃখ পাবার লোভ কেউ সহজে ত্যাগ করতে পারে না। কপালে যখন আছে, তখন

তুমিও মর জলে পুড়ে, আর আমিও বাদ যাব না, কারণ যাতে কষ্ট পাওয়া যায় পারতপক্ষে এমন কোনো সুযোগ এ পর্য্যন্ত আমি ছাড়িনি, এখনও যে ছাড়ব, তার কোনো লক্ষণ দেখ্ছি না।"

এমন সময় সিঁড়িতে উদ্দাম পদধ্বনি তাহাদের দুজনকেই সচকিত করিয়া তুলিল। ক্ষণিকা চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, চিন্ময় অস্থিরভাবে এধার ওধার পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল।

হিরণ্ময়, মেনকা আর লালু হুড়মুড় করিয়া ছাতের উপর আসিয়া পড়িল। একটা বাঁধনহারা ঘুড়ি আকাশের গায়ে অসহায় ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য মহা কোলাহল লাগিয়া গেল।

( ১৯ )

ক্ষণিকাকে ষ্টেশন হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে অনাদিনাথের মনে থাকিবে কি না, সে বিষয়ে ক্ষণিকার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আসিবার সময় একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিবার জন্য তাহার মা তাহাকে অনেকবার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টেশনে পৌঁছিতে তাহার এত দেরি হইল যে তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ক্ষণিকার সঙ্গে কেবল লালু আসিয়াছিল,

টেলিগ্রাম করিবার অভ্যাস তাহার কোনোকালে ছিল না, কাজেই তাহাকে অনুরোধ করিয়া লজ্জিত ও ব্যস্ত করিতে ক্ষণিকার ইচ্ছা হইল না। লালু ট্রেনের সঙ্গে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, অনাদিবাবুরা লোক পাঠাবেন ত ষ্টেশনে ?"

ক্ষণিকা বলিল, "জানেনই ত আমি আজ যাচ্ছি, কোনো ব্যবস্থা কি আর না করবেন ? তুই যা, রোদে আর দৌড়োস্‌নে।"

লালু লম্বা লম্বা পদক্ষেপ করিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "কোথায় আবার দৌড়চ্ছি, এইটুকু ত speed, এর জন্য আবার দৌড়ব। চিন্ময়দারা ত হেঁটে প্ল্যাটফর্ম্ম অবধি পার হয়ে যায়।"

ক্ষণিকা আর কথা বলিল না, প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের শেষ অবধি আসিয়া লালু থামিয়া পড়িল। ক্ষণিকা জান্‌লা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতেছিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, লালু মহা উৎসাহে রুমাল উড়াইতে লাগিল।

দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া যাইতেই ক্ষণিকা ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে বসিল। মেয়েদের কাম্‌রাটা একেবারে শূন্য ছিল না, গুটি পাঁচ-ছয় মহিলা আপনাদের পুত্র-কন্যা পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া তাহার ভিতর বিরাজ করিতেছিলেন। একজন

প্রৌঢ়া একটুখানি সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটি কে তোমার সঙ্গে এসেছিল ?"

ক্ষণিকা বলিল, "ও আমার ছোট ভাই।"

প্রৌঢ়া চোখে মুখে করুণরস সঞ্চার করিবার বিপুল চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আহা, চোখে জল এসে গিয়েছে। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ বুঝি মা ? আমার একটি ভাসুরঝি আছে, অবিকল তোমার মত দেখ্‌তে। ছেলে হতে এসেছিল, এই দিন দশ হল ছেলেটিকে এক মাসের নিয়ে ফিরে গেল। যাবার সময় তার যা কান্না, এত বয়স হয়েছে তবু। শাশুড়ী মাগী তার বড় বজ্জাত, মেয়েকে ভারি যন্ত্রণা দেয়। তা কান্নাকাটি করলে আর কি হবে ? চিরজন্ম ঐ ঘরই ত মেয়েমানুষকে করতে হবে ?"

আর-একজন মহিলা বলিলেন, "যা বলেছ ভাই। এই আমার তের বছরের মেয়েটা, বড় কান্নাকাটি করত, তাই কত সাধ্য-সাধনা বলা-কওয়ার পর এনেছিলুম। তা কি রাখ্‌তে দিলে দুদিন ? অমনি দেওরের বিয়ের ছল করে' মেয়েটাকে টেনে নিয়ে গেল।"

দুজনের মধ্যে নারীজন্মের সুখদুঃখের আলোচনাটা বেশ জমিয়া উঠিল। ক্ষণিকা নিস্তার পাইল। তাহাকে

দ্বার প্রশ্নকারিণীর ভুল ভাঙিয়া নব নব প্রশ্নের তরঙ্গাভিঘাতে হাবুডুবু খাইতে হইল না। সে যে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে এই কথা শুনিয়াই তাহার মুখে একটু তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেটা তখনই আবার মিলাইয়া গেল। তাহার যে চোখে জল আসিয়াছে সে সম্বন্ধে মহিলাটির মন্তব্যে সে সচেতন হইয়া চোখ মুখ মুছিয়া লোকের চোখের সম্মুখ হইতে আপনার মনকে একেবারে আড়াল করিয়া ফেলিল।

বাস্তবিক তাহার কাঁদিবার কারণটা কি? তাহাকে ত সকলে রাখিবার জন্য শেষ অবধি চাহিয়াছে। যাহার আহ্বান নারীর হৃদয়ের কাছে প্রায়ই ব্যর্থ হয় না সেই প্রেম ত তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছিল, তবু ত সে থাকিতে পারিল না। সকল বন্ধন, সকল আহ্বান ত সে তুচ্ছ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে; তবে আর তাহাদের জন্য অশ্রুপাত কেন?

ট্রেন যতই কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ক্ষণিকার মন ততই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজেকে যত রকমে প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহা করিতে ত সে নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কল্পনায় যতদূর দেখা যায়, মানুষের বেদনা পাইবার ক্ষেত্র তাহা হইতে বহু বিস্তৃত। তাহা ছাড়া মানসচক্ষে আমরা নিজেদের হৃদয়ের শক্তিকে

যত বিপুল দেখি, কার্য্যকালে তাহা তেমন না দেখান আশ্চর্য্য নয়। সর্ব্বোপরি, অদৃষ্ট বা নিয়তি যাহাই হউক, একটা কিছু আছে, সে পলকে আমাদের সকল কল্পনা জল্পনা সংকল্পকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া কোন্ আবর্ত্তের মধ্যে আমাদের যে আনিয়া ফেলে, মানুষের সাধ্য নাই যে তাহার জন্য সে প্রস্তুত থাকে।

হাওড়ায় ট্রেন থামিবামাত্র কুলি ডাকিয়া জিনিষপত্র লইয়া ক্ষণিকা নামিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই কানের কাছে শুনিল, "আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি, গাড়ী আর কর্‌তে হবে না।"

ক্ষণিকা ফিরিয়া দেখিল অনাদিনাথের মোটরের চালক কৃষ্ণলাল দাঁড়াইয়া আছে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছাড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। কুলিটা পয়সা লইয়া একটু বকাবকি করিবার উপক্রম করিতেই, কৃষ্ণলাল হিন্দি ইংরেজি ও বাংলা মিশাইয়া ও তাহাতে খানিকটা দাঁতখিঁচুনি যোগ করিয়া কুলিটাকে ভীষণ এক তাড়া দিয়া মোটর চালাইয়া দিল। মলিন জীর্ণ-কাপড়-পরা লোকটাকে দুটা পয়সা বেশী দিতে ক্ষণিকার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণলালের অকস্মাৎ গর্জ্জনে সে একটু চম্‌কাইয়া গেল, এবং চমক ভাঙিতে

না ভাঙিতেই গাড়ীখানা ষ্টেশনের সীমানা পার হইয়া ব্রিজের উপর আসিয়া পড়িল।

এই সামান্য ব্যাপারটাতে তাহার মনের অবস্থা আরও অনেকখানি খারাপ হইয়া গেল। পৃথিবীতে অবিচার অত্যাচার সবই একবার যাহাদের উপর আরম্ভ হয় ক্রমাগত কি তাহাদের উপরেই চলিতে থাকে? সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য কি এমনি ভিন্নজাতীয় যে পরস্পরের ছায়া তাহাদের কোনোক্রমেই মাড়াইতে নাই?

কলিকাতার জনবহুল রাস্তা ছাড়াইয়া গাড়ী ক্রমে বিরলপথিক বালিগঞ্জের পথে চলিল। ক্ষণিকার মনের ভিতরটা কেমন যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। আর বড় জোর দশ মিনিট। জোর করিয়া সে মনকে আবার নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনাদিনাথের বাড়ীর গেট দেখা গেল। গেটের সাম্নে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ তেওয়ারি নূতন দারোয়ানটার কাছে বোধ হয় নিজের অশেষ দুর্গতির কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া ফেলিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষণিকা চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কৈ, যেমন ছিল তেমনি ত সব আছে? নূতন রাণীর জয়ধ্বজার চিহ্ন কোনোখানে ত দেখা যায় না?

কৃষ্ণলাল তাহার বাক্সটা নামাইবার উপক্রম করিতেই ক্ষণিকা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি কেন? পঞ্চা কি অন্য কাউকে ডাকুন না?"

বাক্স বিছানা নামাইতে নামাইতে কৃষ্ণলাল বলিল, "সে বেটা কি আছে যে তাকে ডাক্‌ব? আমি নামিয়ে রাখ্‌ছি এখানে, তারপর দরোয়ান কি ঠাকুর কেউ তুলে দেবে ওপরে।"

ক্ষণিকা ভাবিল পুরানো চাকরগুলা সবই তাহা হইলে বোধ হয় নূতন গৃহিণী বিদায় করিয়াছেন, তা আমাকেই বা আবার ডাকিয়া আনিলেন কেন?

কৃষ্ণলাল আবার মোটরে "ষ্টার্ট" দিতেই উপর হইতে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, "ওমা, এরি মধ্যেই এসে গেল নাকি? গাড়ী তা হলে কলেজে নিয়ে যাও, উনি আজ সকাল-সকাল পাঠাতে বলেছিলেন।"

ক্ষণিকার সে কণ্ঠস্বর চিনিতে বাকি রহিল না। পরক্ষণেই সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল, এবং মনোজ্ঞা হাসিমুখে নামিয়া আসিয়া ক্ষণিকার হাত ধরিয়া বলিল, "গাড়ী গিয়েছিল ত ঠিক সময়? যা দেরিতে বেরোল, আমি ভাবলাম বুঝি তোর সঙ্গে মাঝপথে দেখা হবে। উপরে চল্‌, তোর সেই ঘরই আছে, যদিও উনি অন্য ব্যবস্থা কর্‌ছিলেন। কেমন

ছিলি? মুখ ত একেবারে শুক্‌নো, বাবা মা ভাল আছেন ত? আর তোর সেই ছোট বোন, এখনও স্কুলে পড়ছে নাকি?"

কথা বলিতে বলিতেই তাহারা সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। উপরতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া মনোজা বলিল, "কি রে, একটাও যে কথা বল্‌ছিস না? আমাকে এমন নূতন অবস্থায় দেখেও তোর বল্‌বার কথার অভাব হচ্ছে?"

ক্ষণিকা বলিল, "ঠিকই বলেছেন। আপনাকে এমন অবস্থায় দেখ্‌ব তা ত কোনোদিন ভাবিনি, কাজেই কি যে বল্‌ব তা ভেবেও পাচ্ছি না। তবে এইটুকু মনে হচ্ছে আপনি আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছেন।"

মনোজা তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "কম কথা বল্‌লে কি হয়, যা দু-একটা বলিস তা সারবান কথা। তোর সঙ্গে কিন্তু সকলের মতের মিল হবে না, দেখিস্‌। আচ্ছা চল্‌ এখন নিজের ঘরে, এসে অবধি ত দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা শুন্‌ছিস্‌।" ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মনোজা বলিল, "সুন্দর ত বলিস্‌, কিন্তু একেবারে মাকালফলের সৌন্দর্য্য, ভিতরে কিছু নেই। এই ত দেড়খানা মানুষের সংসার, তা চালাবারও আমার মুরোদ

নেই, দুবারের বেশী চারবার ওঠা নামা করলেই সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত।"

ক্ষণিকা বলিল, "কই বোর্ডিংএ থাকতে ত আপনার শরীর এত খারাপ ছিল না? তখন ত সারাদিনই ঘুরে বেড়াতেন।"

মনোজ্ঞা বলিল, "তা ত ঘুরতামই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে চলেছিলাম বোধ হয়। এতদিনে টের পাচ্ছি। নে, তুই হাত মুখ ধো, ট্রেনের ধুলোয় ত ভূত হয়ে রয়েছিস। আমি যাই, আবার চায়ের ব্যবস্থা এখুনি করতে হবে। কিছু কি পারি? কর্ত্তা একদিন বল্লেন, 'গিন্নি আসার আগে কিন্তু খাবার সুখ বেশী ছিল।' কি এত খাইয়েছিস্ দু-একটা বল্ ত বাপু, হাজার হোক নিজের মানটা ত বজায় রাখ্তে হবে?"

কিন্তু কিছুর নাম শুনিবার জন্য বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণিকা ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া, দক্ষিণ দিকের জান্‌লাটা খুলিয়া তাহার সাম্‌নে আসিয়া বসিল। প্রথম দর্শনের পালা ত এক রকম কাটিল। ব্যাপারটা কেমন যেন অতি সহজে হইয়া গেল, ঠিক এতখানি সহজে যে হইবে তাহা ক্ষণিকা আগে ভাবিতে পারে নাই। উপরে

মনোজ্ঞার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সিঁড়িতে যখন পদধ্বনি শোনা গেল, দুখানি আরক্ত পায়ের উপর শাড়ীর টক্‌টকে লাল পাড়টা বিদ্যুতের মত ক্ষণিকার চোখের সম্মুখে খেলিয়া গেল, তখন তাহার মনের চাঞ্চল্য কোথায় যেন হারাইয়া গেল। তাহার পর মনোজ্ঞা নামিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই, কেমন করিয়া ক্ষণিকার বর্ত্তমান অবস্থাটা শূন্যে মিলাইয়া গেল। মনে হইল সে যেন সেই কিশোরী ক্ষণিকা, যাহার জীবনাকাশে এই অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানিই প্রভাতসূর্য্যের মত আলোক বিতরণ করিত, ইহারই হৃদয়ের অপরূপ মাধুর্য্য তাহার জীবনপথের পাথেয় হইয়া তাহাকে নব নব লোকে বিচরণ করাইয়া ফিরিত। এ ত সেই।

ঘরে আসিতে আসিতে কিন্তু তাহার অতীতের স্মৃতি আবার অল্পে অল্পে অতীতেই ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

সেই বটে, কিন্তু কেবল কি সেই? ভাগ্যবিধাতা এই দুটি নারীকে প্রথম জীবনে যে কোমলবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, এখন কি তাহার উপর আর কোনো বন্ধন যোগ করেন নাই? উভয়ের মধ্যে যে অনাবিল স্বচ্ছপ্রেমের ধারা বহিতেছিল, তাহা কি ঈর্ষার আবিলতায় পঙ্কিল

হইয়া উঠে নাই? একদিন ছিল যখন ক্ষণিকার সম্মুখ হইতে মনোজ্ঞাকে যে-কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও আড়াল করিতে চাহিয়াছে সেই তাহার বিরাগভাজন হইয়াছে, কিন্তু মনোজ্ঞা আজ নিজেই আড়াল। তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণিকার সাধ্য নাই আপনার কল্পিত সুখস্বর্গ-লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তাহার পূর্ব্বের অনুরাগের স্মৃতিকে তাহার বর্ত্তমানের বিরাগ যেন কেবলি গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ বাহিরে মোটরের শব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। মুখ হাত ধুইয়া বেশভূষার যতটুকু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া আসিল। এখনি হয় ত মনোজ্ঞা তাহাকে ডাকিতে আসিবে। তাহার পর অনাদিনাথের সহিত সাক্ষাৎ। কিন্তু ক্ষণিকার মন এই আসন্ন সাক্ষাতের সম্ভাবনায় একবারও চঞ্চল হইল না। সে নিজেই অবাক হইয়া গেল।

তাহার ঘরের সামনে একটি ছোট বারাণ্ডা, এখান হইতে নীচের বাগান টেনিসকোর্ট সবই দেখা যায়। বাহির হইতেই তাহার চোখে পড়িল দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি। সন্ধ্যার ছায়ার মধ্য দিয়াও তাহাদের চিনিতে ক্ষণিকার

বিলম্ব হইল না। বাহিরের আলোকের অভাব এক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দিল না। সেইখানেই সে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া গেল।

অনাদিনাথ ও মনোজ্ঞা দুজনেই বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মনোজ্ঞা উচ্ছ্বসিত হইয়া কিসের যেন বর্ণনা করিতেছিল, তাহার হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গী দূর হইতেই পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল। বাগানের শেষপ্রান্ত অবধি গিয়া দুজনে আবার ফিরিতেই অনাদিনাথ হাসিয়া মনোজ্ঞার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া তাহার কথার উত্তর দিলেন।

ক্ষণিকা ফিরিয়া নিজের ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। বাক্স খুলিয়া দু-চারটা ছোট-খাট জিনিষ ইতিমধ্যেই সে ঘরের এধার ওধার সাজাইয়া রাখিয়াছিল। হাতির দাঁত ও রূপা মিশাইয়া তৈয়ারী একটি ছবির ফ্রেম তাহার টেবিলের উপর ছিল। ফ্রেমটির ভিতর দুখানি ছবির স্থান ছিল। ক্ষণিকা দুখানির ভিতর হইতে তাহার মায়ের অস্পষ্ট ছবিখানি বাহির করিয়া লইয়া, অন্যখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ফ্রেমটাকে জুতার তলায় মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জান্‌লা দিয়া সশব্দে বাহিরে ফেলিয়া দিল। যে মনোজ্ঞাকে সে চিনিত, ভালবাসিত সে ত নাই, তাহার ছবি রাখিয়া কি হইবে? সে ক্ষণিকাও নাই।

বাহিরে দরজার কপাটে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। মনোজা ডাকিয়া বলিল, "এই ক্ষণি, বেরবি না নাকি আজকে আর? আচ্ছা মেয়ে যাহোক, আমাদের কখন চা খাওয়া হয়ে গেল।"

ক্ষণিকা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। মনোজার পশ্চাতেই অনাদিনাথ দাঁড়াইয়া। তাহাকে দেখিয়াই মনোজা বলিল, "চল এখন ঠাণ্ডা চা গিল্‌বে, এমন কুটুম এসেঁছ যে না ডাক্‌লে আর ঘর ছেড়ে বেরবেই না।"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "নিজের কর্ত্তব্যের অবহেলার জন্যে পরকে গাল দিচ্ছ, বেশ ত তুমি! উনি এখুনি এলেন, আর এখুনি কি কাজ ঘাড়ে নিয়ে বস্‌বেন?"

ক্ষণিকা অবনত হইয়া অনাদিনাথকে নমস্কার করিল। তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভাল ছিলেন ত?"

মনোজা অনাদিনাথের কথার উত্তরে বলিল, "হ্যাঁ, আমার আবার কর্ত্তব্য। ও কথাটার বানান আর মানে অনেক মেয়েকে শিখিয়েছি বটে, কিন্তু নিজে কোনোদিন শিখিনি।"

তিনজনে আবার নীচে খাবার ঘরে নামিয়া গেল। মনোজা বলিল, "একেবারেই খেয়ে নে। আর চা আর ভাত আলাদা করে খাবার সময় কোথায়?"

ক্ষণিকার বিশেষ খাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই

লইয়া কথা কাটাকাটি করিবার ইচ্ছাটা ছিল আরো কম। কাজেই বিনাবাক্যব্যয়ে সে খাইতেই বসিল। মনোজা বলিল, "বল্ ত ভাই, রান্না-বান্না খুব কি খারাপ হয়েছে? উনি ত সারাক্ষণ আমার দোষই দেখ্ছেন। অবিশ্যি সেইসঙ্গে তোর গুণব্যাখ্যা এত বেশী পরিমাণে হচ্ছে যে তোর সত্যি কথা বল্বার ইচ্ছা হওয়া শক্ত।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমি ত মন্দ কিছু দেখ্ছি না।"

মনোজা স্বামীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "দেখ্লে ত?"

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্লাম বটে, তোমাদের স্বজাতিপ্রীতি খুব আছে।"

মনোজা বলিল, "আর বিজাতিপ্রীতিটা তার চেয়ে এক বিন্দুও কম নয়।"

ক্ষণিকা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মনোজা বলিল, "এখনও দেখ্ছি সেই বোর্ডিংএর খাওয়াই বজায় রেখেছিস।"

ক্ষণিকা চেষ্টা করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "মাসিমা আর বেণু কই? তাঁদের যে একবারও দেখ্লাম না?"

মনোজা বলিল, "তাঁরা বাড়ী থাক্লে ত দেখ্বি? বেণুর এক পিসির বিয়ে, সেখানে নেমন্তন্নে গিয়েছে।

আমাদেরও অনেক করে' বলেছিল, তা আমার যাওয়া হয়ে উঠ্‌ল না! সময়ই পাই না। মা গিয়েছেন কুটুম্বের মান রাখ্‌তে। অবিশ্যি রাত্রেই সব ফিরবেন, একটু দেরী হতে পারে।"

ক্ষণিকা বলিল, "যাই তবে আমি, উপরে জিনিষপত্র-গুলো ছড়িয়ে রেখে এসেছি।"

মনোজা বলিল, "আচ্ছা!" সে নিজে অনাদিনাথের পড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ক্ষণিকা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মনে মনে বলিল, "তোমার অন্ততঃ কোথাও ঢুক্‌তে অনুমতির দর্‌কার হয় না।"

জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে হঠাৎ তাহার কানে গানের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। মনোজা গাহিতে ভালই পারিত, তবে গান করিতে বলিলে না গাওয়াটাই তাহার নিয়ম ছিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিলে তবে একটা গান শোনা যাইত। এখন আর বোধ হয় বলিবারও দর্‌কার হয় না, গান আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিতে চায়।

ঘর গোছানো অসমাপ্ত রাখিয়া ক্ষণিকা আবার বাহির হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শরীর মন ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা প্রবল অস্থিরতা দেখা দিয়াছিল যে সে কোনোকাজেই মন দিতে পারিতে-

ছিল না। ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে কি যেন নিজেকে ভুলাইতে চাহিতেছিল। যেন স্থির হইয়া একবার দাঁড়াইলেই কি এক বিপদ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে।

নীচে মনোজা গাহিতেছিল,—

"আমায় কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো,
আমি তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতন
অঞ্চল পাতি রহি গো।"

ক্ষণিকার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। এত গান থাকিতে মনোজা কিনা গাহিতে বসিল, "আমায় কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা!" হাসিটা কিন্তু অকস্মাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর সারাদিনের অবসাদের পর প্রবল উত্তেজনার বশে কাঁপিতে-ছিল। তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

( ২০ )

ভোরের বেলা কিসের একটা শব্দে ক্ষণিকার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সুপ্তি ও জাগরণের মাঝের একটা ঘোরের ভিতর দিয়া সে যেন শুনিতে পাইল কে যেন ডাকিতেছে, "মাসি, দরজাটাকে খুলে দাও।"

ক্ষণিকা উঠিয়া বসিল, বলিল, "দিচ্ছি বেণু, তুমি একটু-খানি দাঁড়াও।"

দরজা খুলিবামাত্র বেণু ছোটখাট একটি ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া ক্ষণিকার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাথাটা তাহার গায়ে ঘষিতে ঘষিতে বলিতে লাগিল, "তুমি দুষ্টু, তুমি ভাল না, কেন তুমি চলে গিয়েছিলে? আর একদিনও আমি তোমার কাছে পড়্‌ব না, লিখ্‌ব না, কিছু কর্‌ব না।"

ক্ষণিকা বলিল, "মামীমার কাছে পড়্‌বে বুঝি?" ভাবিল, সব শূন্যস্থানই যদি মনোজা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে কিসের জন্য ডাকা হইল? নিজের ঐশ্বর্য্য পরকে দেখাইয়া, তাহাদের ঈর্ষায় পুলকিত হওয়া একদল মানুষের স্বভাব বটে, ইহা কি তাহারই একটা উদাহরণ? কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষণিকা নিজের চিন্তায় নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তে আজ না-হয় তাহাদের দুজনের সম্বন্ধ ঈর্ষা-কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাই বলিয়া দুজনের স্বভাব-চরিত্র কি একেবারে অন্যপ্রকার হইয়া যাইতে পারে? দীর্ঘ ছয়-সাত বৎসর ধরিয়া দিনে দিনে তাহার হৃদয়ে মনোজার যে মূর্ত্তি সে অঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা কি আজ দুদিনেই

মুছিয়া যাইবে? ভালবাসার অঞ্জন চক্ষে পরিয়া সে যাহাকে দেখিয়াছিল, সে কি মরীচিকা মাত্র? আজ হিংসাকুটিল দৃষ্টিতে যাহাকে সে দেখিতেছে সেই কি সত্য?

বেণু তাহার ভাবনায় বাধা দিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মামীমা, ভয়ানক দুষ্টু, তার কাছেও পড়্‌ব না। সে কেবল মামাকে গল্প বলে, আর গান শোনায়, আমাকে শোনায় না, আমি একটুও যাব না তার কাছে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা, সবাই দুষ্টু, একমাত্র ভাল তুমি, এখন নীচে চল, মুখ ধোবে, দুধ খাবে। তোমার ঠাকুরমা কি করছেন?"

"শুয়ে আছে, আমি দুধ খাব না, সবাই চা খায় আমিও চা খাব। মামীমার মত কালো চা খাব, দুধ-দেওয়া চাও খাব না।"

ক্ষণিকা তাহাকে লইয়া বৃদ্ধা গৃহিণীর ঘরের দিকে চলিল। অনেকদিনের পরিচয়ে তাঁহার অভ্যাসাদি সে খুব ভাল করিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে যদিও তিনি রোদ উঠিবার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন না, তবুও চিরদিনের অভ্যাসবশতঃ ঘুমটা তাঁহার সকাল-সকালই টুটিয়া যাইত। এই সময়ে মানুষের মুখ দেখিতে পাইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, এমন গল্প আরম্ভ করিতেন

যে আগন্তক বেচারা অন্ততঃ এক ঘণ্টার জন্য তাঁহার শয্যা-পার্শ্ব হইতে নড়িতে পারিত না।

বাহিরে ক্ষণিকার পদশব্দ শুনিয়া তিনি উৎসুক হইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা? কে যাচ্ছ ওখান দিয়ে?"

ক্ষণিকা ঘরের চৌকাঠ পার হইতে হইতে বলিল, "আমি, মাসিমা। কাল এত সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে আপনার সঙ্গে রাত্রে আর দেখা করতে পারিনি। কেমন আছেন?"

গৃহিণী শুইয়াই রহিলেন, কাজেই তাঁহাকে আর প্রণাম করা হইল না। বৃদ্ধা হইলেও কোনওরূপ আয়ুক্ষয়কর ব্যাপারে তাঁহার আপত্তি যে কি-রকম প্রবল তাহা ক্ষণিকার বিলক্ষণ জানা ছিল। কাজেই নব্য নিয়ম মত তাঁহাকে অবনত হইয়া একটা নমস্কার করিয়া সে তাঁহার খাটের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী তাহার শেষের কথার উত্তরটাই আগে দিতে আরম্ভ করিলেন, "আর বাছা, কেমন আছি। আছি যে এই আমার কপাল। বাতের জ্বালায় আর কি কোনো সুখ আছে? বুড়ো হাড় ক'টা সারাক্ষণ ব্যথায় টন্‌টন্ করছে, না বসে সুখ, না শুয়ে সুখ। রাত্তিরে আর তুমি কি দেখা করবে, তুমি ত পরের মেয়ে, সারাদিন পথের

কষ্টে তেতে পুড়ে এসেছ ; ছেলে, বৌ, তারাই কোন্ খোঁজ রাখে, বুড়ী এল, না পথে পড়ে মরল। রাত দুটো নয় তিনটে নয়, বারোটা বেজেছে সবে, এরি মধ্যে নবাবনন্দিনী বৌ ঘুমিয়ে গেছেন। ছেলের মা আস্চে না চোর আস্চে। কত ডাকাডাকি করে তবে ঘরে ঢুকি। অত রাতে ঠাণ্ডা লেগে ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল আর কি ?"

গৃহিণীর কথার সুরে ক্ষণিকা বেশ খানিকটা অবাক হইয়া গেল। যতদিন ঘরে বৌ আসে নাই ততদিন সেই খেদে অনাদিনাথের জননীর আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথা শুনিলে মনে হইত যেন যেমন হউক না কেন একটি বউ ঘরে আসিলে তিনি হাতে স্বর্গ পান। আর আজ বউয়ের আবির্ভাবমাত্র তাঁহার সুর একেবারে বদল হইয়া গেল ? যে তাঁহার ঘরে আসিয়াছে বধূরূপে তাহার কোনো অযোগ্যতাই ত চোখে পড়ে না। রূপ, ধন, মান, কোন্ অংশে সে তাঁহার পুত্রের অনুপযুক্ত ? কিন্তু সুন্দরী বধূ পাইয়া গৃহিণী যে পরম পরিতুষ্ট, তাহা ত তাঁহার কথায় বিন্দুমাত্রও বোধ হয় না। মানুষে যাহা একমনে চায়, তাহা পাইবামাত্র তাহাদের পাওয়ার আগ্রহ কেমন করিয়া এমন বিরাগে পরিণত হয় ? যাহা কল্পনায় এত সুন্দর তাহা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিবামাত্র কেমন করিয়া এতখানি কুরূপ হইয়া যায় ?

কিন্তু গৃহিণীর এতগুলা কথার উত্তরে কিছু ত একটা বলা দরকার? ক্ষণিকা বলিল, "আবার তাহলে সেই কবিরাজকে ডাকুন না? তাঁর চিকিৎসায় সেবার ত বেশ উপকার পেয়েছিলেন।"

গৃহিণী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমিও যেমন বাছা! কে বা বসে আছে আমার জন্যে ডাক্তার কবিরাজ ডাক্তে? বুড়ী মা মর্লেই এখন সবাইকার হাড় জুড়োয়। সে সব আস্বে বৌ-ঠাকুরাণীর জন্যে—কবে তিনি একবার কেশেছেন, কোন্ রাত্রে তাঁর একটু গা গরম হয়েছে, রোজ হ্যাট-কোট-পরা ডাক্তার এসে তার খোঁজ নিচ্ছে। অসুখ কি তা ত চোখে দেখি না, দুবেলা মাছ ভাত খাওয়া হচ্ছে, গাড়ী করে বেড়ান হচ্ছে, তবু রোজ ডাক্তার, রোজ ওষুধ। কুটোগাছটি ভেঙে ত দুখান করেন না কখনো। ও বয়সে আমাদের কি না কর্তে হয়েছে!"

ক্ষণিকা বিষম বিপদে পড়িল। ঘরে ঢুকিবামাত্র এমন ভাবে মনোজার গুণব্যাখ্যা আরম্ভ হইবে জানিলে সে এধার মাড়াইত না। মনোজার প্রতি তাহার মনোভাব যেমনই হউক না কেন, সে যে এ সংসারের গৃহিণী তাহা ভুলিয়া থাকা চলে না। তাহার শাশুড়ীর হয়ত বা কারণে ও অকারণে তাহার নিন্দা করিবার কোনো আর্য্যশাস্ত্র-অনুযায়ী অধিকার

থাকিতেও পারে, কিন্তু ক্ষণিকার সে নিন্দাবাদে যোগ দিবার অভিরুচি বা অধিকার কিছুই নাই। অথচ এমন বক্তৃতা-স্রোতের মধ্যে হঠাৎ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে সেটা বক্তৃতাকারিণীর প্রতি সৌজন্যের পরিচয় দেওয়া একেবারেই হইবে না।

এমন সময় বেণু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মামীমা, জান আমি তোমার মত কালো চা খাব, মাসিমাকে বলে দিয়েছি।"

ক্ষণিকা চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। দরজার ওধারে একটা সবুজ আঁচল আর লাল পাড়ের খানিকটা দেখা গেল? মনোজা কতক্ষণ না-জানি ওখানে দাঁড়াইয়া আছে? ক্ষণিকাকে সে ভাবিতেছে কি? আসিবামাত্র সে আর-কোনো কাজ করিবার আগে ছুটিয়া গিয়া শাশুড়ীর সহিত বধূর নিন্দার গল্পে মজিয়া গেল? ইহাকে কি মনোজা ক্ষণিকার ইচ্ছাকৃত ঘটনা বলিয়াই জানিবে? কিন্তু যদিই সে তাহা মনে করে, তবে তাহার সে ভুল ভাঙিয়া দিবার উপায়ই বা কোথায়? ক্ষণিকার অন্তর পর্য্যন্ত যেন লজ্জার আভায় লাল হইয়া গেল।

বধূর আগমনের খবর পাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "বৌমা নাকি? এত সকালে উঠেছ যে? গায়ে গরম জামা দিয়েছ ত? তোমাদের আবার যা শরীর এখুনি একখান বাধিয়ে বস্‌বে কিছু। এ কি আর আমরা? পোষ মাসের

শীতে শান্তিপুরের শাড়ী পরে শুধু কাটিয়েছি, কোনোদিন একটু পাঁচন শুদ্ধ খাইনি।"

মনোজা ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "এখন আর ঠাণ্ডা কোথায় মা যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে? গরমে ত টেঁকা যায় না। আপনি আছেন কেমন?"

বৃদ্ধা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আমার আর থাকা-থাকি কি? আছি ঐ একরকম। এখন তোমরা ভাল থাক্‌লেই বাঁচি। যাও বাপু তোমরা নিজেদের চা টা খাও গিয়ে, বুড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আর হবে কি?"

ক্ষণিকা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া মনোজাকে দেখিতেছিল। চৈত্রের শেষাশেষি এবার বেশ গরম পড়িয়া গিয়াছে। তাই বোধ হয় সকালেই মনোজা স্নান করিয়া আসিয়াছে। তাহার আলুলায়িতকুন্তলা সদ্যস্নাতা মূর্ত্তিটিকে ক্ষণিকার চোখে বড় সুন্দর লাগিল। মনোজার রূপসম্বন্ধে ক্ষণিকার ধারণা চিরকালই উচ্চ ছিল, কিন্তু নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সে এখন বড় অস্বাভাবিক রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই নিজের মূর্ত্তিকে আপনার মনের কাছে সে যত বেশী করিয়া কালিমাচ্ছন্ন করিত, মনোজার রূপের প্রভা যেন সেই আঁধারের পাশে আরো জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া উঠিত

মনোজা ক্ষণিকার দৃষ্টিটা দেখিয়া লইল, তাহার পর তাহার কাঁধে হাত দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ক্ষণি চল্‌, সত্যিই আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার কোনো দর্‌কার নেই।"

ঘরের বাহিরে আসিয়াই মনোজা বলিল, "দেখ্‌ আমি এসে তবে ত তোকে উদ্ধার কর্‌লাম, তা না হলে আরো ঘণ্টা-খানেক ধরে আমার গুণব্যাখ্যা শুন্‌তিস্‌।"

ক্ষণিকা মুখ লাল করিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ ওখানে ছিলেন?"

মনোজা বলিল, "সব শুনেছি গো সব শুনেছি। কবি বার্ণ্‌স্‌ যে বলেছিলেন যে অন্যের চোখে নিজেকে দেখ্‌তে তাঁর বড় সাধ, সেটা তিনি বাঙালী-ঘরের বউ হলেই মিটিয়ে নিতে পার্‌তেন। তা আমি শাশুড়ীরও দোষ দিতে পারি না ভাই, বুড়ো মানুষ রোগে ভুগ্‌ছেন, বউ এলে কোথায় সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে, তা নয় নিজের রোগ নিয়েই ব্যস্ত। তাঁর ছেলে তবু এতদিন একলা মাকে দেখ্‌তেন; এখন মা, স্ত্রী দুই সাম্‌লাতে তাঁরও প্রাণান্ত।"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনার কি হয়েছে? মাসিমা অনেক কিছু ত বলে গেলেন, কিন্তু আসল ব্যাপার ত কিছু বুঝ্‌লাম না।"

মনোজা বলিল, "আর আসল ব্যাপার জেনে তোর কাজ নেই। আমি নিজেই কি জানি ছাই? কদিনই বা বিয়ে হয়েছে, এরি মধ্যে বাহাত্তুরে বুড়ীর মত স্বামীর সঙ্গে শুদ্ধ, কেবল রোগেরই গল্প হচ্ছে, অন্য লোকের ত কথাই নেই। যে আসে সেই বলে 'কেমন আছ বৌমা, আজ শরীর একটু ভাল ত?' বৌমা হয়েছেন এবাড়ীর এক একজিবিশন। নাটক নভেলে রোমান্স অবসান হবার হরেক রকম কারণ পড়্তাম ভাই, হিংসা সন্দেহ আরো ছাইভস্ম কত কি। কিন্তু হাঁচি বা কাশির কথা কেউ বলেনি যে কেন? ওর মত instantaneous effect আর কিছুরই নেই।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি, এমনি ঠুন্‌কো প্রাণ রোমান্সের, যে, কাশির ধাক্কায়ই লুপ্ত হয়ে যায়?"

মনোজা বলিল, "আর বিজ্ঞের মত হাস্‌তে হবে না। জান ত ছাই। ভাবরাজ্যে সব জিনিষের যেমন মূর্ত্তি কল্পনা কর, বাস্তব জগতে তারা তেমন নয় গো। আমরা যতক্ষণ অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক মানবী, ততক্ষণ আমাদের আদরের ও মর্য্যাদার সীমা থাকে না; কিন্তু ঐ গোড়ার অর্দ্ধেকটুকু যেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, অমনি মান মর্য্যাদা সব উবে যায়।"

ক্ষণিকা বলিল, "আর আদরটা ?"

মনোজা তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া বলিল, "সব যদি বলে দিই, তা হলে তুই নিজে আবিষ্কার করবি কি ? যেটুকু বল্লাম তাতেই বিবাহিতা নারীর guildএর গোপন কথা অনেকখানি বলে দেওয়া হল। জানিস্ ত, পৃথিবীটা কত বড় একটা মায়া, সে সম্বন্ধে সকাল-সকাল ছোটদের সচেতন করে দিতে নেই।"

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, "আমাকে সচেতন করলেও ক্ষতি নেই কিছু, কারণ নিজে কিছু আবিষ্কার করবার সম্ভাবনা আমার বিশেষ নেই।"

মনোজা বলিল, "আহা মরে যাই। আমা হেন খুঁটি যখন নড়েছে, তখন আর কারু মুখে ও কথা আর শোভা পায় না। তবে এইটুকু বলে রাখি, দূর থেকে বিয়ে জিনিষটাকে যতখানি মনোহর লাগে, তার ভিতরে এসে পড়্‌লে ঠিক তেমনটা আর লাগে না। পান থেকে চুন খসলে যে এতখানি হ্যাঙ্গাম বাধে তা কি আর কখনো কল্পনা করেছিলাম ?"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা নীচের খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষণিকা গল্প করিতে করিতে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল যে এ বাড়ীতে অবস্থাটা তাহার কি রকম

অদ্ভুত। ঠিক যেন মনোজার বাড়ী সে বেড়াইতে আসিয়াছে এই ভাবেই সে গল্প করিতেছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকিবামাত্র অনাদিনাথকে দেখিয়া তাহার মন আবার বিমুখ হইতে আরম্ভ করিল। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের ক্রীড়নক হইয়া কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিবে? যে দুটি মানুষকে এ জীবনে সে ভালবাসিল, তাহারাই যদি নিরন্তর পরস্পরকে আড়াল করিয়া, পরস্পরের সত্যরূপকে বিকৃত করিয়া ফেরে, তাহা হইলে ক্ষণিকার দশা হইবে কেমন? সে ভাবিয়া আসিয়াছিল মনোজা বুঝি এই নূতন রাজ্যে ক্ষণিকার কাছে কেবল মূর্ত্তিমতী দুর্ভাগ্যরূপিণী হইয়া বিচরণ করিবে, কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, তাহার পুরাতন রূপকে তাহার নূতন রূপ ত একেবারেই আবৃত করিতে পারে নাই! সে যেমন সুন্দর ছিল অন্তরে বাহিরে তেমনই ত আছে! তবে ইহাকে কেমন করিয়া সে জীবনের অভিমান রূপে, তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে কলুষিত করিয়া দেখিবে?

কিন্তু ঐ যে আর-একটি মানুষ, যিনি একদিন তাহার জীবনের কেন্দ্র হইয়া তাহার সকল ভাবনা, সকল কল্পনা ও বাসনা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাকেই বা সে কি ভাবে এই নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে গ্রহণ করিবে? সমাজ ত তাহাকে তর্জ্জনী তুলিয়া কেবলি শাসন করিতেছে, কিন্তু

তাহার বিদ্রোহী অন্তর অধীনতা স্বীকার করে কই? কিন্তু মুখ না ফিরাইলে বাঁচিয়া থাকা চলেই বা কেমন করিয়া? সমস্যাটাকে ঠিক এতখানি জটিল বলিয়া সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এখন কি ভীরুর মত পলায়ন ছাড়া কোন উপায়ই নাই?

সে নীরবে আপনার অভ্যস্ত কাজগুলি করিয়া যাইতে লাগিল। মনের ভিতরে যতই কেন না মন্থন চলুক, বাহিরের জগতের দাবি তাহার জন্য উপেক্ষা করিবার অধিকার নাই। বেণুর আব্দার রক্ষাও তাহার মাঝে আছে, কারণ বিশ্ব-সংসারে তাহার চেয়েও অধিকতর মূল্যবান জিনিষ যে ক্ষণিকার কাছে অন্ততঃ কিছু আছে, এ কথা ভাবিতেও সে অক্ষম।

মনোজ্ঞা চা খাইতে খাইতে বলিল, "ক্ষণি, একেবারে যে চুপ হয়ে গেলি?"

অনাদিনাথ ক্ষণিকাকে উত্তর দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া বলিলেন, "উনি ত কাজের ভার নিলেন, এখন কথা বলার ভারটা তোমার নেওয়া উচিত।"

মনোজ্ঞা বলিল, "উচিত কাজ আর কবে আমি করি বল? বোর্ডিংএ থাকতে নিজের ঘর পরিষ্কার রাখা, কাপড়-চোপড় গোছানো সবই আমার কাজ ছিল, তা সেগুলো

আমি সব ক্ষণিকে দিয়ে করিয়ে নিতাম। আমার মত অকর্ম্মণ্যের উচিত ছিল না কোনোদিন সংসার কর্‌তে আসা, ঠিক সেইটাই লোভে পড়ে করে বস্‌লাম। নিতান্ত বিধাতা আমায় অক্ষম করে সৃষ্টি করেই নিজেই নিজের ভুল বুঝে ক্ষণিকে গড়েছিলেন, তাই যেখানেই যাই ও আমার তদারক কর্‌তে এসে জোটে।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "সে হিসাবে বিধাতার ভুল একটি মাত্র নয়, তবে ভুল সংশোধন তিনি দেখ্‌ছি একবারই করেছেন। অক্ষম তিনি অনেকগুলি গড়েছেন, তবে যার উপর তাদের সাম্‌লে চল্‌বার ভার দিয়েছেন, তার কাজের সুবিধার জন্য অক্ষমগুলিকে এক জায়গায় এনে জুটিয়েছেন।"

মনোজা বলিল, "যাক, এতদিন ভাব্‌তাম কেন যে ভগবান আমার মত অপদার্থকে সংসারে টেনে নিয়ে এলেন! এখন দেখ্‌ছি ক্ষণির কাজের সুবিধার জন্যই। পরোক্ষভাবে তাতে আমারও খানিকটা সুবিধা যে হয়নি তা নয়। আমাদের মধ্যে কে কাকে বখ্‌শিস্ দেবে বল্ দেখি?"

ক্ষণিকা বলিল, "থাক, আমার আর বখ্‌শিসে দর্‌কার নেই। কাজের ভার কোনো রকমে বইছি, বখ্‌শিসের ভার আর বইতে পার্‌ব না।"

মনোজা বলিল, "নিতান্ত হেসে বল্‌ছিস তাই কথাটাকে ঠাট্টা মনে করে হাল্কা করে নিচ্ছি, কিন্তু ঠাট্টার মত ঠিক শোনাচ্ছে না।"

এমন সময় অনাদিনাথ চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মনোজা বলিল, "ও কি, অর্দ্ধেক জিনিষ ফেলে চল্‌লে কোথায়? আমার গিন্নিপনার আমলে না হয় খেতে রুচি হত না, এখন ত regime বদ্‌লেছে, এখন তোমার ধরণ বদ্‌লানো উচিত।"

ক্ষণিকা বেণুর দুধ আনিবার ছলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার প্রায় সহ্যের সীমানা অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছিল। মনোজার পরিহাসের বাণগুলি যে কাহার ব্যথিত অন্তঃকরণকে রক্তরঞ্জিত করিতেছিল তাহা সে নিজে বুঝিল না। কিন্তু ক্ষণিকার ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার আঘাতক্লিষ্ট মূর্ত্তি যে বাহিরে আসিতে চায়। এমন অবস্থায় পলায়ন ভিন্ন তাহার আর পথ কোথায়?

দুধ লইয়া ফিরিবার মুখে দেখিল মনোজা খাইবার ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়াছে। ক্ষণিকাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিয়া গেল, "যাচ্ছি ডাক্তারের মুখ দেখ্‌তে। বেণুকে তুই দুধ খাওয়াতে আমার চেয়েও ঢের ভাল পার্‌বি, সে বিষয়ে তোকে কোনো উপদেশ দেবার দর্‌কার নেই। আর

রান্নাবান্না কি হবে তা তুই নিজে ঠিক করিস। এতদিন কোনো রকমে যা-তা করছিলাম, এখন তুই আসল পারের কাণ্ডারী এসেছিস্ তুইই হাল ধর।”

ক্ষণিকার বুকের ভিতর অবধি যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কেবলি তাহাকে ঐ কথাই শুনিতে হইবে? এ রাজ্যের সিংহাসনে তাহারই যদি যথার্থ অধিকার তবে সেখান হইতে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিল কে? বাহিরের সংসারে দাসীর ন্যায় খাটিবার জন্যই বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এ কথা মনোজা সত্যই বলিয়াছে। অন্তর-লোকে, যেখানে নারী দেবীরূপে প্রেমের আরতি পায় সেখানকার দ্বার কি তাহার জন্য চিররুদ্ধ? সে পূজার অর্ঘ্য জোগাইয়া দিবে, ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিবে, আরতির প্রদীপখানি সযত্নে সাজাইয়া ভক্ত পূজারীর হাতে তুলিয়া দিবে। এইটকু তার অধিকার। তাহার পরে কাহার রক্তিম চরণে সে পূজোপহার অর্পিত হইল, কাহার অপরূপ হাসির উপর আরতির দীপের মধুর স্নিগ্ধ আলো পড়িয়া সেখানে আনন্দের দেয়ালি দেখা দিল, কাহার কমনীয় কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া কুসুমের মালা আপনার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিল সে-সবে তাহার প্রয়োজন কি? সে শুধু বাহিরের সংসারের মানুষ, মানুষের

হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিবার পরোয়ানা বিধাতা তাহার জন্য রাখেন নাই।

( ২১ )

সকালবেলার ডাকে গোটা দুই চিঠি পাইয়া ক্ষণিকা তাহা লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তাহার মায়ের চিঠিতে বাড়ীর সব ক'জন মানুষের কুশল এবং পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যখন সে সবে লালুর চিঠিখানা সুরু করিতেছে, এমন সময় কদম আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, বৌদিদি আপনাকে ডাকছেন একবার।"

ক্ষণিকা চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া বলিল, "যাচ্ছি, ডাক্তার-সাহেব চলে গিয়েছেন কি ?"

কদম বলিল, "হ্যাঁ, এই মাত্তর গেলেন।"

লালুর চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ক্ষণিকা মনোজার ঘরের দিকে চলিল। মনোজার শরীর খারাপ হইতে হইতে এখন তাহাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর সকলের মনের উপর একটা আশঙ্কার ছায়া ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও কেহ মুখের কথায় সেটা কাহারও কাছে স্বীকার করে না। অনাদি-নাথের স্বাভাবিক গম্ভীর মুখ আরও যেন বিষাদপরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আর তাঁহার মাতার মুখে ভাগ্যের আর বিধাতার

নিন্দাবাদ ভিন্ন অন্য কথা প্রায় শোনাই যায় না। এতদিন পরে যদি বা ছেলে বিবাহ করিল, তা অমনি কি বউকে রোগে ধরিতে হয়? বিধাতার ন্যায়বিচার কি ইহাকেই বলে? তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর বিধাতা একবারও দিতেন না, মাঝে হইতে তাঁহাকে শান্ত করিবার বিফল চেষ্টায় ক্ষণিকার মন অশান্তিতে ভরিয়া উঠিত।

মনোজার ঘরে তখন কেহই ছিল না। সকালের রোদ জান্‌লার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া কৌতুকের হাসি হাসিতেছে। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিয়া বলিল: "ওকি! রোদে মাথাটা দিয়ে শুয়ে আছেন কেন? এই জান্‌লাটা বন্ধ করে দিই?"

মনোজা বলিল, "থাম্ বাপু, তোকে কিছু বন্ধ করতে হবে না, আমি মাথা সরিয়ে নিচ্ছি। কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সকাল থেকে যে একবারও চুলের ডগাও দেখ্‌তে পেলাম না।"

ক্ষণিকা বলিল, "কাজের ভারি কম্‌তি কি না, এতক্ষণ ত ঠাকুরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেই কাট্‌ল। এখনও তবু বেণুর সন্ধানই করিনি। আমি ভাব্‌ছিলাম অনাদি-বাবু বুঝি ঘরে আছেন, তাই আসিনি। ডাক্তার আজ দেখে কি বল্‌লেন?"

"বল্‌বে আর কি ? নূতন কিছু বল্‌বার ত আর বাকি নেই ? চুপ ক'রে শুয়ে থাক, কপালে থাকে ত সেরে উঠ্‌বে, এ কথা আর মানুষ ক শ বার বল্‌বে বল্‌ ?"

ক্ষণিকা বলিল, "তা কতদিন ধ'রে রোগ জমিয়ে রাখ্‌লেন, সারাবার বেলা এত তাড়া দিলে কি চলে ?"

মনোজা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার তাড়া কে শুন্‌ছে ? কিন্তু তোদেরও কি কোনো তাড়া নেই ? দিনের পর দিন এই যে শুয়ে থাকি, বাইরের জগতের মুখ দেখা বন্ধ, তোদের যে-ক'টাকে সাম্‌নে পাই, জ্বালিয়ে খাই, এতে তোদের বিরক্ত লাগে না ? ইচ্ছে করে না,—হয় একেবারে চিতায় শুক, না হয় খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াক।"

ক্ষণিকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মনোজাদি, কি বল্‌ছেন আপনি যা-তা ? যে কথা মনেও আন্‌তে নেই, এই রকম ফস্‌ ক'রে আপনার মুখ দিয়ে তাই বেরয় কেমন ক'রে ? আমাদের হাতে থাক্‌লে কি আর এক মুহূর্ত্তও আপনাকে আমরা শুইয়ে রাখ্‌তাম ? আমরা কি চাই না যে আপনি সেরে উঠুন ? কিন্তু দু দিন দেরি হলেই কি ঐ রকম কথা ভাব্‌তে হয় ?"

মনোজা বিরক্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া বলিল, "যা, যা, বক্তৃতা কর্‌তে হবে না। ভাবা না-ভাবা নিজের হাতে

কিনা বড়? তুই কখনও অনুচিত কিছু ভাবিস্ না? তোদের না হয় সেবা ক'রে বিরক্তি নেই, আমার সেবা নিয়ে নিয়ে যে হাড়ে ঘুণ ধ'রে গেল।"

ক্ষণিকা ভাবিল আর কথা বলিয়া লাভ নাই, মনোজার মন তাহাতে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিবে। সে নীরবে ঘরের জিনিষপত্র নাড়িয়া-চাড়িয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। মনোজার প্রশ্নটা যে নিতান্তই রাগের ঝোঁকের কথা তাহা বুঝিয়াও তাহার মনের ভিতর কেমন একটা ঘা আসিয়া লাগিল। বাস্তবিকই ত, অনুচিত ভাবনা ভাবিতে তাহার সমকক্ষ এই পৃথিবীর বুকে আছে ক'টা?

এই যে দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে ইহার ভিতর ক'টা ঘণ্টা এমন কাটিয়াছে যাহাতে সে এমন কথা চিন্তা করে নাই, সমাজ যাহাকে অনুচিত ত মনে করিবেই, অপরাধ বলিয়া ধরিতেও পারে। আসিবার মুখে সে মনোজার প্রতি জ্বালাময়ী ঈর্ষা আর অভিশাপই মনে বহন করিয়া আসিয়াছিল। মনোজাকেই সে তাহার সর্ব্বস্ব-অপহরণ-কারিণীরূপে চিন্তা করিয়া তীব্র ক্ষোভে অভিশাপ দিয়াছে। কিন্তু এখন আর সে ভাব তাহার আছে কি? তাহার বালিকাজীবনের প্রীতির অর্ঘ্যে সে যাহাকে পূজা করিয়াছিল, সে মনোজা ত এখনও মরে নাই? ইহাকে অভিশাপ দিবার

অভিলাষও তাহার নাই, অধিকারই বা কোথায়? আজ সেই যে মনে মনে পরস্ব অপহরণের চিন্তা করিয়া নিজের কাছে নিজে অপরাধী আরও এমন কোনো ভাবনা কি তাহার মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই আসিয়া জোটে নাই, যাহার আবির্ভাবে সে নিজেই লজ্জায় ক্ষোভে আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে?

সে পিছন ফিরিয়া জান্‌লার উপরকার ফুলদানী হইতে বাসি ফুলপাতাগুলা টানিয়া ফেলিতেছিল। হঠাৎ শুনিল, "হ্যাঁরে রাগ কর্‌লি? আমি কি এখনও রাগের পাত্রী হবার উপযুক্ত আছি?"

ক্ষণিকা তাহার খাটের কাছে আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া বলিল, "রাগ কর্‌ব কেন? আপনার দিন যে কেমন ক'রে কাট্‌ছে তা কি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না? মানুষের ইচ্ছা যতটা হয় সাধ্যে যে তার একশ' ভাগের এক ভাগও কুলোয় না, এই ত দুঃখ। আমার সাধ্যে যদি থাক্‌ত, আমি যেমন ক'রে হোক আপনাকে ভাল ক'রে দিয়ে যেতাম।"

মনোজা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "তোর ভার যখন নিয়েছিলাম, সবাই আমাকে কত প্রশংসা না করেছিল। সবাইকার

কথা শুনে শুনে আমিও কি এক এক সময় ভাবিনি যে আমার মত পরোপকারী মানুষ আর হয় না? আমার ভাগ্যবিধাতা তখন কেমন ক'রে হেসেছিলেন বল্ দিখি? তখন কে জান্ত যে আমি তোর জন্যে যা কিছু করেছি, তুই তার হাজারগুণ ক'রে শোধ দিবি? এর পরের জন্মে আমাকে তোর ঋণ শোধ করতে না জানি কি করতে হবে। এ জন্মে সময় হবে না আর। বোর্ডিংএ থাক্তে জান্তাম বটে যে তুই আমাকে ভালবাসিস্, কিন্তু এতটা ভালবাসিস্ তা বুঝ্তে পারিনি। আমার মা থাক্লেও এর চেয়ে বেশী কি করতে পার্ত?"

ক্ষণিকা চুপ করিয়া রহিল। ইহার উত্তরে সে বলিবে কি? যাহা তাহার বলিবার আছে, তাহা ত মনোজাকে বলিবার নয়, ঈশ্বর ছাড়া কাহারও কাছে তাহা স্বীকার করা যায় না। সত্য বটে, মনোজার ঋণ সে আজ প্রাণপণ সেবা করিয়া শোধ করিতেছে, কিন্তু সে কি কেবল তাহার অর্থের ঋণ? আর এই যে তাহার গভীরতম বেদনা আর গোপন অশ্রুজল, ইহা কি কেবল ঋণ শোধই করিতেছে, জগতে কোথাও কি নূতন ঋণ সৃষ্টি করিতেছে না? মানুষ হইয়া জন্মিবার যে মহাসম্মান, তাহার মূল্য নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়াও কি তাহার এখনও কিছু পাওনা ঘটে নাই?

বেণু বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাসিমা, আমার দুধ বিচ্ছিরি, আমি কক্ষনো খাব না।"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "মনোজাদি, আমি আস্‌ছি বেণুকে দুধটা খাইয়ে। ও যা দুষ্টু, কদমের কাছে কিছুতেই খাবে না, এখুনি ওর দিদিমার কাছে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করবে।"

মনোজা বলিল, "যা ভাই, একেই ত তিনি আমার উপর যা খুসি, তার উপর যদি তোকে ধ'রে রাখি আর তাঁকে নাত্‌নীর জ্বালা পোয়াতে হয়, তা হলে আরও খুসি হবেন। এর পর তোর সেবা করবে কে রে? দশটা মানুষের খাটুনি ত একলা খাট্‌ছিস্।"

ক্ষণিকা বলিল, "কাউকেই আমার সেবা করতে হবে না। খাটা ত আমার কাছে নূতন জিনিষ নয় যে তার জন্যে এখন থেকে সেবার ব্যবস্থা করতে হবে?"

মনোজা বলিল, "এ জন্মে ধার দিয়ে রাখ্, পরের জন্মে এত পাবি যে রাখ্‌বার জায়গা থাকবে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনার মাথায় আজ কেবল ঐ কথাই ঘুরছে দেখছি। আগের আর পরের জন্মের ভাবনা অত না ভেবে যে জন্মটা চল্‌ছে তার কথাই একটু ভাবুন।"

মনোজা বলিল, "আচ্ছা, তাই ভাব্‌ছি, তুই যা বেণুকে দুধ খাইয়ে আয়।"

ক্ষণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বেণু ততক্ষণ দুধের বাটি সমেত তাহার দিদিমার দরবারে হাজির হইয়াছে। তিনি ক্ষণিকাকে দেখিয়া অত্যন্ত ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছিলে কোন্ রাজ্যে, বুড়ো হাড়ে আমাকেই সব কর্‌তে হবে?"

ক্ষণিকা তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এই যে আমি খাইয়ে দিচ্ছি। এস ত বেণু আমার সঙ্গে, চল দুধ ষ্টোভে গরম করে দিই, তা হলেই আর বিচ্ছিরি থাক্‌বে না।"

গৃহিণী একটু শান্ত হইয়া বলিলেন, "তুমিও গেলে বাছা খেটে খেটে। বৌমা কেমন আছে, খেল কিছু? আমারও যা দশা হয়েছে, একটু যে দেখ্‌ব কাউকে তারও ক্ষমতা নেই।"

ক্ষণিকা বলিল, "এখনও খাননি, এই বেণুকে খাইয়ে যাচ্ছি, তাঁর বেদানার রস ক'রে নিয়ে।"

গৃহিণী বলিলেন, "বেদানাগুলো আর কাঁচের গেলাসটা আমার কাছে এগিয়ে দিয়ে যাও, আমি ব'সে ব'সে ক'রে দিচ্ছি। বৌমারও কপাল, মা ত কবে গেছে তার ঠিকানাও

নেই, শাশুড়ী হয়েছে এক খোঁড়া, না নড়্‌বার সাধ্যি আছে, না কিছু ।”

মনোজাকে পৃথিবীতে সৌভাগ্যবতীর শিরোমণি ভাবাই ক্ষণিকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, গৃহিণীর কথায় হঠাৎ তাহার মনটা যেন চম্‌কাইয়া গেল। তাই ত, কেবল একপাশ দিয়া দেখিলে ত চিত্রের সবটা দেখা যায় না। আলো-ছায়ার সম্মিলনেই যে চিত্রের সৃষ্টি তাহা ভুলিয়া থাকিলে চলিবে কেন? ক্ষণিকার কাছে যাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, মনোজা তাহা লাভ করিয়াছে, কিন্তু মনোজা যে মনোজাই, ক্ষণিকা নয়। ক্ষণিকা যাহা পাইলে নিজের জীবনকে সার্থক মনে করিত, যাহার অভাবে সে জগতের আর-কোনো সম্পদের দিকে চাহিয়াও দেখে না, সেই অমূল্য ধন কি সকলের কাছেই ততখানি মূল্যবান? আর সকল অভাব, সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলাইয়া রাখিবার ক্ষমতা সত্যই কি অনাদিনাথের প্রেমের আছে, না ক্ষণিকা আপনার অন্তরলোকে যে প্রেমের দেবতাকে সৃষ্টি করিয়াছে সে সাধ্য কেবল তাহারই? মনোজা যে সুখী নয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু সে যে স্বামীর ভালবাসা পরিপূর্ণরূপে লাভ করিয়াছে ইহাও সত্য। তবে সত্যই হয়ত সুখ কেবল মানুষের কল্পলোক ভিন্ন আর কোথাও নাই।

বেণুকে দুধ খাওয়াইয়া, তাহাকে অনেক বুঝাইয়া-পড়াইয়া কদমের হাতে সমর্পণ করিয়া, সে কমলালেবুর রস আনিতে গৃহিণীর ঘরে ঢুকিল। রস করিয়া রাখিয়া তিনি তখন অন্য কাজে মন দিয়াছিলেন। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিলেন, "বৌমাকে বোলো সবটা খায় যেন। এই ত জল পথ্যি, তার আবার অর্দ্ধেক ফেলে রাখ্‌বে, তা সার্‌বে কিসের জোরে? যত সাহেবী কাণ্ড, জ্বর ছাড়্‌ছে কতবার, মাছের ঝোল ভাত খেলে এতদিনে গায়ে কত বল পেত।"

ক্ষণিকাকে সারাদিন এমন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত যে বৃথা কথা বলিবার শক্তি বা ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল না। সে গেলাসটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর ঘর হইতে মনোজার ঘরে যাইতে হইলে অনেকখানি বারাণ্ডা পার হইতে হয়। বাহির হইয়াই ক্ষণিকা দেখিতে পাইল, অনাদিনাথ মনোজার ঘরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছেন।

সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিল। ইদানিং পারতপক্ষে আর সে তাঁহার সম্মুখে পড়িতে চাহিত না। দুঃখবহন করিবার শক্তি তাহার শেষ হইয়া আসিতেছিল, দুঃখকে আর ঘরে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা তাই সে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিত। অনাদিনাথ একদৃষ্টে বাহিরের দিকে

চাহিয়া ছিলেন, ক্ষণিকাকে তিনি দেখিতে পান নাই, সে ইচ্ছা করিলেই ফিরিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু মনোজা সকাল হইতে কিছু মুখে দিতে চায় নাই, এখন একবার কিছু না খাওয়াইলেই নয়, অগত্যা সে অগ্রসর হইয়াই চলিল।

বারাণ্ডার মাঝামাঝি আসিতেই তাহার পদশব্দে অনাদি-নাথ তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। ক্ষণিকার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দিন আমাকে। আপনার ত কাজের অন্ত নেই, এমন কাউকে দেখ্‌ছিও না যে আপনাকে একটুখানি relieve কর্‌তে পারে। কিন্তু আপনার উপর এত চাপ দেওয়া কিছুতেই আমার উচিত হচ্ছে না।"

ক্ষণিকা বলিল. "না, না, আমায় এমন বেশী কিছু খাট্‌তে ত হচ্ছে না, চাকরবাকররা ত সবই প্রায় কর্‌ছে। বাবার অসুখের সময় আমাকে এর চেয়েও বেশী খাট্‌তে হয়েছে।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "আপনার বাবার জন্য যতখানি আপনাকে কর্‌তে হয়েছে, অন্য লোক ততটাতে ত দাবি কর্‌তে পারে না? বিধিদত্ত অধিকারের সঙ্গে আর কোনো জিনিষের তুলনা হয় না।"

ক্ষণিকা বলিল, "দাবি না কর্‌লেও যে মানুষ পায়, এইটুকু সুবিধা ভগবান এখনও রেখেছেন, তাই রক্ষা।"

কথাটা বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। কেবল

এই এক সমস্যা লইয়াই কি তাহার জীবন কাটিবে? দিবার অধিকার আছে কি না, লইবার অধিকার আছে কি না? কিন্তু দেনা-পাওনাটা কবে এই সমস্যা-সমাধানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে? মানুষ যাহা পাইবার তাহা না চাহিতেই পায়; যাহা দিবার তাহা অযাচিতভাবে দেয়,—না দিয়া তাহার উপায় নাই শান্তি নাই বলিয়াই দেয়, তবে বৃথা কেন এই মীমাংসার চেষ্টা? এই যে সে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিতেছে দিনে দিনে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ইহা করিতে কেহ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না, কিন্তু জগতে কোন্ শক্তি আছে যাহা তাহার এই নিরন্তর দানকে বাধা দিতে পারে? তাহার যে প্রবল আবেগ এই সেবার রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে সে নিজেই বা পারিল কই? আর-একজন মানুষ যে তাহাকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ লইয়া নিশিদিন প্রার্থনা করিতেছে, সেই তপস্যার কি কণিকা উপযুক্ত? কিন্তু ইহা না ভাবিয়াও মানুষ পারে না কেন?

অনাদিনাথ ঘরে ঢুকিতেই মনোজা বলিল, "ও কি! তুমি যে? ক্ষণু গেল কোথায়?"

অনাদিনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "এটা ঠিক আমাকে compliment দেওয়া হল না।"

মনোজা বলিল, "তোমাকে compliment দেবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না। সারারাত জেগে ব'সে রইলে, কোথায় নেয়ে খেয়ে একটু ঘুমবে তা না compliment এর সন্ধানে এলে। যাও, গেলাসটা রেখে নিজের কাজ সার গিয়ে।"

অনাদিনাথ তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এই যে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি যে-মানুষটির সন্ধান করছ, তাঁকে ত আমার চেয়ে বেশী বই কম খাট্‌তে হয় না, তবু তাঁর খাটনি একটুখানি বাড়িয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে চাও কেন? আমারই ত সব করবার কথা, উনি যা করছেন তাতে আমার দিন দিন বেশী ক'রে লজ্জা হচ্ছে।"

মনোজা বলিল, "মেয়েমানুষের স্বভাবই অম্‌নি। নিজের ভালবাসার জিনিষটিকে যে-কোন উপায়ে সে একটু বাঁচিয়ে চল্‌তে চায়, তাতে পরের যা হবার হোক।"

অনাদিনাথ বলিলেন, "তা ঠিক নয়, পুরুষ জাতটা মুখের কথায় ছাড়া কাজে তোমাদের জন্যে কিছু কর্‌তে এলেই তোমাদের মহা অসোয়াস্তি ধরে। তুমি না-হয় আমাকে বাঁচাতে চাও, কিন্তু তোমার বন্ধুটিও যে আমাকে কিছু কর্‌তে দেখ্‌লেই ঘর থেকে বিদায় ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হন। আমাদের কাজ করা তোমাদের চোখে কিছুতেই সয় না।"

মনোজা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ

অনাদিনাথের কোলের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "তোমার এত বুদ্ধি, তবু তুমি কিছু বোঝ না কেন?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "বেশ কথা, কি না বুঝ্‌লাম?"

মনোজ্ঞা বলিল, "যা বোঝোনি তা বুঝ্‌বেও না, যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্নান কর গিয়ে।"

অনাদিনাথ বাহির হইয়া যাইতেই মনোজ্ঞা বালিশে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাহার শরীর দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ঠিক এই সময় ক্ষণিকা আসিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। বিস্মিতদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সে মনোজ্ঞার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মনোজ্ঞাদি, অমন করছেন কেন? কি হয়েছে?"

মনোজ্ঞা সবলে তাহাকে ঠেলিয়া দিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুই যা, আমার কাছে আর আসিস্ না।"

ক্ষণিকা বলিল, "কি হয়েছে শুনি, কি আমি দোষ করলাম যে আর আস্‌ব না?"

মনোজ্ঞা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর ক্ষণিকার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুই কেন আমার জন্যে এমন ক'রে মরছিস বল্ দিখি? সত্যি কথা বল্।"

ক্ষণিকা তাহার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মিনিট

তুই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "সত্যি কথাই বল্‌ছি। আপনার সেবা না ক'রে আমার উপায় নেই, তাই কর্‌ছি। যা কর্‌ছি তার বেশী কর্‌বার সাধ্য থাক্‌লে কর্‌তাম। আমার বুকের সব রক্ত দিয়েও যদি আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলা যেত, তাও কর্‌তাম।"

মনোজা বলিল, "আমাকে বাঁচিয়ে তোর কি হবে?"

ক্ষণিকা বলিল, "আপনি বাঁচলে কি হবে জানি না, কিন্তু না বাঁচ্‌লে যে কি হবে তা ভাব্‌বারও আমার সাহস নেই।"

মনোজা বলিল, "তুই যা, আমি একটু একলা থাক্‌তে চাই।"

(২২)

বিকালবেলার চায়ের ব্যাপার সারিয়া ক্ষণিকা উপরে আসিতেছিল। কোথা হইতে এক গা ধূলাকাদা মাখিয়া বেণু আসিয়া তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্ষণিকা একহাতে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আঃ বেণু, কি করছ, এখনি আমার কাপড়-চোপড়ে সব কাদামাখামাখি হয়ে যাবে। কোথায় ছিলে, এত কাদা জুটল কোথা থেকে?"

বেণু বলিল, "আমি মালী হয়েছিলাম। বেশ করব,

কাদা লাগিয়ে দেব, তুমি কেবল মামীমাকে ভালবাস্‌বে কেন ?"

ক্ষণিকা বলিল, "আর তোমায় একটুও ভালবাসি না, না ?"

বেণু বলিল, "না বাসই না ত। তুমিও না, মামাবাবুও না, কেউ না। সবাই কেবল মামীমাকে ভালবাসে, তাকে খেতে দেয়, আর ফুল দেয়। আমি আবার স্বর্গে চ'লে যাব।"

ক্ষণিকা অবাক হইয়া বলিল, "আবার মানে ? তুমি আর-একবার গিয়েছিলে নাকি ?"

বেণু মাথা দোলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ আমি জানি, আমায় ওদের বাড়ীর লিলি বলেছে যে আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি।"

ক্ষণিকা তাহাকে কোলে করিয়া বলিল, "না, না, তোমাকে সবাই ভালবাসে খুব, তোমায় কোথাও যেতে হবে না। মামীমার কিনা অসুখ, তাই সবাই তার কাছে বেশী যায়, আর ফুল দেয়।"

"তবে আমিও ফুল নিয়ে আসি" বলিয়া ক্ষণিকার কোল হইতে নামিয়া বেণু ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা আসিয়া মনোজার ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া মনোজা জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট পুষ্যিটির সঙ্গে কি এত গল্প হচ্ছিল ?"

ক্ষণিকা বলিল, "তার মান অভিমান চল্‌ছিল ; সবাই কেবল আপনাকে খেতে দেয় আর ফুল দেয়, তাকে কেউ দেয় না, তাই মহা রাগ হয়েছে তার।"

মনোজা বলিল, "তা এমন গুরুতর অপরাধ, রাগ ত হতেই পারে। শিশু ব'লে ন্যায়তঃ তার যাতে অধিকার, আমি রোগ বাধিয়ে নকল শিশু সেজে তার সে পাওনা বেদখল কর্‌ছি। আমার এবং তোদের সকলেরই শাস্তি হওয়া উচিত।"

ক্ষণিকা বলিল, "শাস্তি অবধি সে সবই ঠিক ক'রে রেখেছে।" কথাটা বলিয়াই তাহার মনে হইল এ কথা না বলিলেই ছিল ভাল। শাস্তিটা ঠিক মনোজাকে শুনাইবার মত ত নয়।

মনোজা তৎক্ষণাৎ বলিল, "কি শাস্তি শুনি ?"

ক্ষণিকাকে অগত্যা বলিতে হইল, "সে চলে যাবে।"

মনোজা বলিল, "চলে যাবে ? কোথায় ?"

ক্ষণিকা বলিল, "কে এক ওর বন্ধু ওকে বলেছে যে সব মানুষ স্বর্গ থেকে আসে, তাই ওর মাথা ঘুর্‌ছে। সে রেগে আবার স্বর্গেই ফিরে যাবার ব্যবস্থা কর্‌ছে।"

মনোজা বলিল, "মন্দ নয়, দুই উল্টো পথের একই অবসান। কেউ ভাল না বাস্‌লেও সেই স্বর্গ, আর সবাই বেশী ভাল বাস্‌লেও সেই স্বর্গ। আমাকে যে সবাই এত ভালবাস্‌ছে তাতে স্বর্গের পথে কাঁটা পড়্‌ল কই?"

ক্ষণিকা জিনিষটাকে হাল্কা করিয়া তুলিবার আশায় বলিল, "তাই নাকি? তা বলেন ত আমরা সবাই মিলে আপনাকে দু চার ঘা' দিতে সুরু করি তাতে যদি আপনার সেরে ওঠার সুবিধা হয় ত আমার কিছু আপত্তি নেই।"

মনোজা বলিল, "গোড়ায় হলে কাজ হত, এখন আর ওতে কিছু হবে না। তা ছাড়া প্রাণ ছাড়্‌তে রাজি আছি, কিন্তু ভালবাসা ছাড়্‌তে পার্‌ব না। প্রাণ না থাকা যে কি তা ত জানিনা ভাই, কিন্তু ভালবাসা না পাওয়া যে কি তার এমন পরিচয় পেয়েছি যে আর আমি ওদিক দিয়ে যাচ্ছি না।"

ক্ষণিকা ভাবিল, সে পরিচয় তাহারই বা পাইতে বাকি আছে কই? কিন্তু জীবনের মায়া কাটাইবার মত ক্ষমতা ত তাহার একেবারেই জন্মে নাই। বরং এই নব নব বেদনার ভিতর দিয়া তাহার যেন নব নব জীবনই লাভ হইতেছে। দুঃখ তাহাকে নিত্য দহন করিতেছে, কিন্তু শেষ করিতে পারিল কোথায়?

মনোজা বলিল, "বেজায় যে গম্ভীর হয়ে পড়্‌লি ?"

ক্ষণিকা বলিল, "কিছু হাস্‌বার কথা ত বল্‌লেন না, তা হাসি কি ক'রে বলুন ?"

মনোজা বলিল, "হাসির কথা নয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি কথা। আজন্ম লোকের কাছে আদরই কেবল পেয়েছি, তাই ভাব্‌তেও পারি না যে আদর পাচ্ছি না, তবু বেঁচে আছি।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমাকে ত জন্মাবধি কেউ যে বিশেষ আদর করেছে ব'লে মনে পড়ে না। কিন্তু আমি যে-পরিমাণে বেঁচে আছি, এমন খুব কম লোকই আছে।"

মনোজা বলিল, "তোদের বাঁচাটাই আসল। আমরা গোড়ার থেকে parasite হয়েই সুরু করেছি, আমাদের তেমনই চল্‌তে হবে। একটা না একটা কাউকে আঁক্‌ড়ে না থাক্‌লে আমরা বাঁচ্‌তে পারি না। বাপ মা বেশীদিন সে অবসর দেন নি, কিন্তু কপালগুণে অন্য লোক জুটে গেল। যে ক'টা দিন আছি তোকে আর আর-একটি মানুষকে জ্বালিয়েই কেটে যাবে।"

ক্ষণিকা বলিল, "আচ্ছা থাক্‌, ভারি ত জ্বালাচ্ছেন, তার আবার কথা। ভারি যে এ-জন্ম আর আর-জন্ম করেন, তা এখনই যদি আপনার আর-এক জন্ম হাজির হয়, তখন

কে আপনার ভার নেবে শুনি? আমরা ত এখনকার মত বহুকাল এই ভাবেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌ব।”

মনোজা বলিল, “লোক জুটে যাবে। কিন্তু যাকে-তাকে আমার পছন্দ হলে বাঁচি। দেখ্ এই আমার কর্ত্তাটিকে প্রথম যখন দেখেছিলাম, তখন আমার বড় জোর সতেরো বৎসর বয়স, আঠারোও পোরেনি। তখন ত এর মত হল না, ওর মত হল না, সে মহা কাণ্ড। কিন্তু পছন্দও আমার আর কাউকে হল না, যদিও কটা রঙের গুণে বর জুটেছিল ঢের। এই আট বছর ওরই জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে ছিলাম। তারপর তোর কথাই ধর্, আমার ঘরকন্না দেখ্‌তে যতক্ষণ না তুই এলি, ততক্ষণ ভরসা ক'রে বিছানায়ও শুইনি, যার-তার হাতে কি সংসার ছাড়া যায়? তোরা দুজন না হলে যে পরের জন্মে কি করব তা ত জানি না।”

ক্ষণিকা বলিল, “আমরা এখন কিছুতেই আপনার অন্য জন্মের ভার নিতে পারব না। আমাদের চাইলে এখন এখানেই থাকতে হবে।”

মনোজা বলিল, “থাকাটা কি আমাদের হাতে নাকি? যাই হোক, আবার তোদের ফিরে পাব। আমি যাবার পর এ ভাঙা-চোরা আবার তালি-জোড় দিয়ে রাখিস্ কোনো রকম ক'রে। তোর হাতেই দিয়ে যাচ্ছি।”

ক্ষণিকা বলিল, "থাক্, তা আর না ? আমার ঘুম হচ্ছে না। সেরে উঠে নিজের বোঝা নিজেই বইবেন এখন।"

মনোজা হঠাৎ ক্ষণিকার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে একেবারে নিজের কোলের কাছে আনিয়া ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা ক্ষণু সত্যি করে বল্, আমাকে ভুলোসনে, নিজেকেও ভুলোস্‌নে, আমি বাঁচ্‌ব না কি ? বেঁচে থাকার সাধ আমার একেবারেই যায় নি।"

ক্ষণিকা কাঁদিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। সত্য কথা তাহার অজানা নাই, কিন্তু সে বলিবে কি করিয়া ? সে কি জানে না মনোজার বাঁচিবার সাধ কতখানি ? আর না হইবেই বা কেন ?

বাহিরে আসিতেই সর্ব্বপ্রথম সে চোখে পড়িল অনাদিনাথের। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাইয়া তিনি দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে ?"

ক্ষণিকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "কিছু না।"

অনাদিনাথ আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া মনোজার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

ক্ষণিকার তখন বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। সে ধীরে

ধীরে সাম্‌নের খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্য তখন পশ্চিমের কুঙ্কুম-সাগরে ডুবিবার মুখে, লালিমার স্রোত চারিদিকে তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহার উপর উজ্জল আলোকোচ্ছ্বাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই বিচিত্র বর্ণনাট্যের উপর আঁধার-যবনিকা নামিয়া আসিল, কেবল তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া দুএকটি আলোকরশ্মি রক্তকমলের মত ফুটিয়া রহিল।

ক্ষণিকার মনে হইল এ যেন তাহারই জীবনের একটা প্রতিকৃতি। এই ত সবে সেদিন জগৎ তাহার চক্ষে কি অপরূপ মাধুরীতে আর সুষমাতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন স্মৃতি ছাড়া সেদিনের আর কিই বা অবশিষ্ট আছে? আরো যে কালিমা নিবিড়তর হইতে চলিয়াছে, তাহাও ত বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই যে তাহার ক'দিন আগেকার পুলক-উদ্বেল জীবন আর এই বেদনাভারাক্রান্ত বর্ত্তমান দিন, ইহার মধ্যে এমন গভীর বিদারণ-রেখা টানিয়া দিল কে? যাহাকে ভাগ্যবিধাতা এমন নিষ্ঠুর অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেন, ক্ষণিকা ত তাহাকেই প্রথমে তাহার সকল দুঃখের মূল জানিয়াছিল। আজ আবার যখন সেই বিধাতাই ক্ষণিকার জীবনের সেই মূর্ত্তিমতী অভিশাপকে অজানা লোকে ডাক দিলেন, তখন আবার তাহারই জন্য ক্ষণিকা চোখের

জল ফেলে কেন? অনাদিনাথ আর তাহার মাঝের আড়াল যখন ধূলিসাৎ হইতে চলিল, তখন সেই আড়ালকেই আজ কেন সে দুই হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়?

তাহার জীবনে অমৃত ও হলাহলের ধারা এমনভাবে মিশিয়া গেল কেমন করিয়া? প্রথম জীবনে যাহাকে সে ভালবাসিল, দুদিন পরে তাহার কাছ হইতে তাহাকে দূরে টানিয়া ফেলিল কে? তাহার পর অতীতের সকল ভাল-বাসার স্মৃতি যে বিপুল প্লাবনে ভাসিয়া গেল, তাহা কেবল ক্ষণিকার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াই নিরস্ত হইল। শুধু তাহাই নয়, তাহার জীবনাকাশের ভোরের শুকতারা, কেন তাহার ভাগ্যগগনে প্রলয়-ধূমকেতুর রূপে পুনর্ব্বার উদিত হইল? সংসার তাহাকে সকল দিক হইতে নিরন্তর আঘাতই করিয়াছে, যে অমৃত-উৎসে স্নান করিয়া সে নূতন উৎসাহে আবার এই আঘাতের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইত, সেই উৎসই কেমন করিয়া এমন বিষাক্ত হইয়া উঠিল?

পূর্ব্বে সে যাহা লইয়া সন্তুষ্ট ছিল, যাহার অভাবে তাহার জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহাতে তুষ্ট হইতে সে পারে না। যে স্নেহকণা একদিন তাহার কাছে সব ছিল, এখন তাহা কিছুই নয়। অন্যকে যেখানে অমৃতের ধারায় স্নান করিতে দেখে, মানুষ কেমন করিয়া সেখানে

জলকণায় তৃপ্ত হয়? এককালে সে অনাদিনাথের প্রিয় না হউক, তাঁহার কাছে সজীব মানুষ ছিল, এখন ত সে ছায়াও নয়। মনোজার সেবা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে যে মানুষটির মধ্যে, তাহার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া ক্ষণিকা বলিতে আর যাহা কিছু বোঝায়, অনাদিনাথের জগতে তাহাদের কোনও অস্তিত্ব নাই।

এমন সময় বৃদ্ধা গৃহিণীর ঘরে তাহার ডাক পড়িল। ক্ষণিকাকে কাছে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ বাছা, বৌমার কাছে রাত্রে তুমি যদি আজ থাক ত ভাল হয়, ছেলে আমার না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে; পুরুষ-মানুষ, ওসব ত ওর অভ্যেস নেই।"

তাহাকেই এমন অখণ্ড-অবসরসম্পন্ন মনে করাতে ক্ষণিকার একটু হাসি পাইল। সেটা গোপন করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাই শোব।"

অনাদিনাথ বাস্তবিকই সেদিন অসুস্থ ছিলেন বলিয়া মাতার এই ব্যবস্থায় বিশেষ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ব্যবস্থাটা যে একান্ত সাময়িক তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য ডাক্তারের কাছে একজন নর্সের জন্য তখনই চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। দিনের বেলা রোগীর সেবা বাড়ীর সকলে না হয় জাগাজাগি করিয়া করিল, কিন্তু রাত্রির

বিশ্রাম হইতে বঞ্চিত হইলে, দিনের বেলা তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা না করিবে, এমন মানুষ সংসারে বড়ই বিরল।

ক্ষণিকাকে ঘরে বিছানা পাতিতে দেখিয়া মনোজা অবাক হইয়া বলিল, "তুই যে বড় আজ এ ঘরে? আবার রাত্রে শুশ্রূষাকারীর বদল হল কেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "অনাদি-বাবুর শরীর তেমন ভাল নেই, তাই আমিই আজ থাক্‌ব।"

মনোজা বলিল, "তোর শরীর বেশ, কখনও খারাপ হতে জানে না, অন্ততঃ সকলে তাই ধ'রে নিয়েছে।"

ক্ষণিকা শুইয়া পড়িয়া বলিল, "একটু ঘুমোন না এখন। শেষ রাত্রে ত ঘুম হয়ই না, গোড়ার দিকটাও কেবল কথা ব'লে কাটিয়ে দেবেন? আমি আলো নিভিয়ে দিচ্ছি।"

ঘরের আলো নিভিয়া যাইতেই, তারার মৃদু আলো খোলা জানলার পথে ভিতরে আসিয়া পড়িল। দেবতার চির-জাগ্রত নয়নের মত তারার দল যেন এই মর্ত্যবাসিনী দুইটির দিকে চাহিয়া নীরবে বলিতে লাগিল, "কেবল মাটির দুঃখ বহন করিয়াই দিন কাটাইবে? একবার আমাদের দিকে চাও।"

ঘরের ভিতরের নীরবতা অটুট দেখিয়া ক্ষণিকা ভাবিল মনোজা হয় ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন একটু বাহির

হইয়া ছাতে কি বারাণ্ডায় ঘুরিয়া আসিলে হয় না? সারা দিনের পরিশ্রম তাহার দেহকে যতই অবসন্ন করুক, তাহার মনের ভিতরের বেদনার তীব্র অনুভূতি এমন নিত্য জাগরূক থাকিত যে নিদ্রা তাহার নয়নে প্রায়ই আসিত না। এক-একদিন শরীর যখন জবাব দিতে চাহিত, মন এই বলিয়া বুঝাইয়া তাহাকে খাড়া রাখিত যে কাঁদিবার আর ঘুমাইবার সময়ের অভাব হইবে না, সম্মুখের সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া রহিয়াছে। যে ক'টা দিন আপনাকে দান করিবার সুযোগ রহিয়াছে, বৃথা কেন আর তাহার অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অপব্যয় করা?

কিন্তু তাহার উঠিবার সামান্য শব্দেই মনোজা বলিল, "তুই ঘুমুচ্ছিস ভেবে আমি এতক্ষণ জোর ক'রে চুপ ক'রে ছিলাম। ক'দিনই বা আর কথা বল্‌তে পাব? ওকে তাই রোজ রাত্রে জ্বালাই। এত কথা বিয়ের আগে courtshipএর সময়ও বলিনি।"

ক্ষণিকা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমরা দুজনেই পরোপকার কর্‌বার খাতিরে চুপ ক'রে রইলাম, কিন্তু উপকারটা কারুরই হল না।"

মনোজা বলিল, "আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ছিলাম জানিস্‌? কতকাল আগেকার যে কথা, তখন সবে নিজের

সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মনে কর্‌তাম আগেকার দিনের মেয়ের মত আমার স্বামী যদি আগে মরে ত আমি সহমরণে যাব। তাকে ছেড়ে বাঁচা যে কি ক'রে যায় তা আমার কল্পনায় আস্‌ত না। তখন স্বামী যে কি তা ত জান্‌তামও না। কিন্তু এখন ভাব্‌ছি যে কেউ যদি আমায় অধিকার দেয়, ক্ষমতা দেয় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে, উনি যদি যেতে চানও, তা হলেও কি আমি নিয়ে যাই? যাই না বোধ হয়। জীবন যে কত বড় জিনিষ তা জীবন শেষ হবার সময়ই বুঝ্‌লাম। ভালবাসার খাতিরেও এর অবসান কামনা কর্‌তে নেই। আমি গেলে ওঁর খুবই লাগ্‌বে বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু সে দুঃখ সময়ে সয়ে যাবে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ক'দিনের বা।"

ক্ষণিকা বলিল, "ভাই, বাইরের সম্বন্ধ অনেক কারণে ঘুচে যায়, কিন্তু মনের কাছে কি সম্বন্ধের কখনও শেষ হয়?"

মনোজা বলিল, "তুই এখনও তাই ভাবিস্‌? তোর মনে আছে ছেলেবেলায় একবার জন্মদিনে তোকে Ships That Pass In The Night বলে একখানা বই দিয়েছিলাম? তুই আরম্ভের আগে চার লাইন কবিতা প'ড়ে বল্‌লি—'সমস্ত বইটার মধ্যে এই ক'টা লাইন সব চেয়ে সুন্দর'।"

ক্ষণিকা বলিল, "খুব মনে আছে; গল্পটা ভুলে গেছি, কিন্তু ওই লাইনগুলো আজও পরিষ্কার মনে আছে।"

মনোজা বলিল, "আমিও ভুলিনি। সেই ত—

"Ships that pass in the night, and speak each other in passing
Only a signal shown and a distant voice in the darkness.
So on the ocean of life, we pass and speak one another.
Only a look and a voice, then darkness again and silence."

ঘরে আর শব্দ নাই। খানিক পরে মনোজা বলিল, "ক্ষণি, কথা বল্‌ছিস্ না যে?"

ক্ষণিকা অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি বল্‌ব?"

মনোজা বলিল, "কাঁদ্‌ছিস কেন? মনে রাখিস কাল-সাগর যতই বড় হোক, অনন্তকাল আমাদের প'ড়ে রয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আবার দেখা হবেই। কিন্তু তোর দুঃখ কেন এত? আমাকে জানার ফলে সুখ তুই আর কিই বা পেয়েছিস, কিন্তু আমার হাত দিয়ে বিধাতা তোকে যা আঘাত দেওয়ালেন, তা আমি অন্ততঃ বুঝেছি। বরং এই কামনা

কর্ যে এর পর যে আঁধার তোর আর আমার মাঝে নেমে আস্‌বে তা আর যেন না শেষ হয়।"

ক্ষণিকা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মনোজ্ঞার কাছে আসিয়া তাহার হাত দুখানা নিজের হাতের ভিতর লইয়া বলিল, "আপনি কি বুঝেছেন তা আমি জান্‌তে চাই না; কিন্তু এইটুকু কেবল জেনে রাখুন, যাদের ভিতর দিয়ে ভগবান্ আমাকে সব চেয়ে ব্যথা দিয়েছেন, তারাই আমার সব চেয়ে প্রিয়। আমি এই বিশ্বাস নিয়েই মর্‌ব যে তাদের জন্যে আমি অত দুঃখ সয়েছি ব'লেই তাদের আমি আবার ফিরে পাব। সুখের দেনা-পাওনা অল্প দিনেই চুকে যায়, কিন্তু দুঃখের ঋণ অত সহজে শেষ হবে না।"

মনোজ্ঞা বলিল, "তুই আমায় বাঁচালি ভাই। যাকে আমি এ জীবনে সকলের চেয়ে ভালবেসেছি, তারও তা হলে আবার আমার কাছে ফিরে আস্‌তে হবে। একদিন দু'দিন নয়, আট বছর তার জন্য আমার বুকে আগুন নিয়ে বেড়াতে হয়েছে। বাইরের সাজে আমার সে তপস্যা কোনো দিন ধরা দেয়নি, কিন্তু মনের ভিতর তাকালে দেখ্‌তিস, সেখানে কি চেহারা ছিল।"

শেষের দিনটা বড় হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। মনোজ্ঞা যে তাহাদের ছাড়িয়া যাইবে এ কথা সবাই বুঝিত, কিন্তু

কেহই তাহা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাহিত না। কিন্তু চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে অন্ধকারকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, তাহা মানুষ মাত্রকেই বুঝিতে বাধ্য হইতে হয়।

সকাল বেলা হইতেই সকলে সেদিন পরস্পরকে এড়াইয়া ফিরিতেছিল। কেহ কাহারও সহিত কথা বলে না, কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। নিজের মনের আশঙ্কার ছায়া পাছে অন্যের চোখেও প্রতিফলিত দেখে ঐই ভয়ে তাহারা চোখ ফিরাইয়া লয়।

দিন দুই তিন হইতে গোটা দুই নর্সের আবির্ভাব হওয়াতে রোগীর সেবার ভার বাড়ীর লোকের হাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। অনাদিনাথ তবু সারাক্ষণই সেই ঘরের ভিতর, না হয় সামনের বারাণ্ডাতে কাটাইয়া দেন। সকাল হইতে বারাণ্ডায় ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন, আহারাদির কথা কেহ তোলে নাই।

ক্ষণিকা চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া ছিল। মনোজার মৃত্যুকালিমাচ্ছন্ন মুখ দেখিতে আর তাহার ইচ্ছা ছিল না। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখই ক্ষণিকার হৃদয়ে চিরদিনকার মত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; মরণের বিভীষিকা তাহার উপর ছায়াপাত করে, ইহা সে চায় না। বেণুকে তাড়াতাড়ি তাহার এক পিসির বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কদম আসিয়া বলিল, "মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

ক্ষণিকা উঠিয়া গেল। গৃহিণী সকাল হইতেই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমায় একবার ধ'রে ও-ঘরে নিয়ে চল, শেষ দেখা দেখে আসি।"

ক্ষণিকা নীরবে তাঁহাকে লইয়া চলিল। ঘরের দরজার সাম্‌নে আসিতেই তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো মাগো, বুড়ীকে ফেলে কোথায় যাচ্ছিস্‌।"

অনাদিনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "মা চল, আমরা এখান থেকে যাই। আর ত দেখ্‌বার কিছু নেই।"

ক্ষণিকা দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর অনেক লোক, কাহাকেও যেন সে চিনিতে পারিল না। আর খাটের উপর ঐ কি মনোজা? এতদিনকার এত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, ভয় শঙ্কা ইহাকে আশ্রয় করিয়াই কি ছিল? আজ তাহাদের ভগ্ন পিঞ্জর ফেলিয়া তাহারা কোথায় উধাও হইয়া গেল? যাহাকে ভালবাসা নিরন্তর ঘিরিয়া রাখিত, আজ সে কেবল ভয়ই উদ্রেক করিতেছে।

কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসিয়া ছিল, তাহার ঠিকানা

নাই। একজন নর্স আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল।

নিজের ঘরে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। কে যেন শব্দহীন ভাষায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে তাহার এতদিনের সঙ্গিনী আজ চিরদিনের মত বিদায় লইতেছে।

বাহিরে তখন লোকে লোকারণ্য। আপাদমস্তক পুষ্পাভরণভূষিতা মনোজার মুখ হইতে মরণ জীবনের সব বিক্ষোভ-যন্ত্রণার চিহ্ন মুছিয়া লইয়াছে। নববধূর মত তাহার মুখ প্রীতিপ্রফুল্ল।

শববাহীদল ফটক পার হইয়া গেল। হঠাৎ কে যেন বুকফাটা চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিদি, দিদিমণি আমার!"

ক্ষণিকা চাহিয়া দেখিল, মনোজার একটি ভাই সিঁড়ির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া। আর-একজনের সন্ধানে তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল, তাহাকে পাইল না।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এতদিন পরে তাহার কাঁদিবার অবসর মিলিয়াছে। শুধু এই মৃত্যুশোকের জন্য নয়, নিজের জীবনের যত দুঃখ, যত ব্যথা, যত নিরাশার বেদনা, যত রিক্ততা, সকলে যেন আজ ভীড় করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ আর অন্য কাজ নাই, আজ এই অশ্রুর ঋণ শোধ করিতেই দিন যাক।

( ২৩ )

ঘরের ভিতর চারিদিকে জিনিষ ছড়ানো। ছেঁড়া কাগজ, দড়ির টুক্‌রা, ময়লা চট স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। জান্‌লা দরজা অধিকাংশই বন্ধ। বাড়ীতে যে মানুষ আছে তাহার একমাত্র পরিচয় একটি শিশুর গলার স্বরে পাওয়া যাইতেছে।

"মাসিমা, আমরা কি আবার গিরিডি যাব?"

ক্ষণিকা বেণুর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই মৃদু স্বরে বলিল, "না বেণু, গিরিডি যাবে না, তুমি তোমার পিসিমার বাড়ী যাবে।"

"আর তুমি কোথায় যাবে? দিদিমা কোথায় যাবে? মামাবাবু কোথায় যাবে?"

ক্ষণিকা বাক্সে কাপড় গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "আমরাও সকলে বেড়াতে যাব।"

"কোথায় বেড়াতে যাবে বল না? মামীমার কাছে যাবে বুঝি? যেও না, মামীমা দুষ্টু, কেন রাত্তির বেলা চ'লে গেল?

ক্ষণিকা বলিল, "যাও বেণু, বাইরে লিলি তোমায় ডাক্‌ছে। খেলা কর গিয়ে' আঁধার ঘরে ব'সে ব'সে কি করবে?"

বেণু ছুটিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিকা আবার নিজের কাজে মন দিল। একটার পর একটা করিয়া গোটা পাঁচ ছয় বাক্স গোছান হইয়া যাইবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতরের ম্লান আলোতে বুঝিবার কোনো উপায় নাই যে বেলা কতখানি হইয়াছে। সামনের জান্‌লাটা খুলিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল। রোদ তখনও বেশ প্রখর, বেলা সাড়ে তিনটা হইবে। আবার নীচে নামিয়া বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জান্‌লাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ক্ষণিকা ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সামনের কাজটার চিন্তামাত্রেই তাহার সারা মনটা যেন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কি দর্‌কার এই তুচ্ছ অভিনয়ের? সংসার যেখানে নাই, সেখানেও কেন জোর করিয়া এই সংসারের খেলা?

ক্ষণিকা কদমকে ডাকিয়া বলিল, "কদম, যাও ঠাকুরকে ব'লে এসো একেবারে রান্না চড়াতে। চা আজ আর হবে না, বাবু কি ফিরেছেন?"

"না দিদিমণি। বেণুদিদির দুধ কি আমি খাইয়ে দেব, না আপনার কাছে নিয়ে আস্‌ব?"

"না যদি কাঁদে, তা হলে তুমিই দাও গিয়ে খাইয়ে।"

কদম নামিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণীর ঘরের দরজা খোলা, ক্ষণিকা একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। তিনি সেই একইভাবে খাটের উপর পড়িয়া আছেন। মনোজার মৃত্যুর পর আর কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইতে পারে নাই। এ পাশের ঘরের কপাট বন্ধ, উহা খুলিয়া দেখিবার সাহস এ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই।

গেটের সামনে দরোয়ান বসিয়া গুটি দুই তিন স্বদেশী লোকের সহিত গল্প করিতেছে। পথে লোকজন বিশেষ নাই, মাঝে মাঝে আরোহীহীন এক একটা গাড়ী ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে, কোনো রকম তাড়া তাহাদের নাই, পৃথিবীতে কাজ বলিয়া যেন জিনিষই নাই, যেমন খুসি চালে পথ চলিলেই হইল।

"বাড়ীর সকলে কোথায়?"

ক্ষণিকা সচকিতভাবে ফিরিয়া তাকাইল। তাহার পিছনে একজন মহিলা দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া সে মনে করিতে পারিল না। কিন্তু মুখের মধ্যে, দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে কোথায় যেন একটু পরিচিত ভাব। এ কাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়? যে অনিন্দ্য রূপের এখন পৃথিবীতে আর ছায়ামাত্রও অবশিষ্ট নাই, কোথা হইতে এই মানুষটি তাহার আভাস লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল?

ক্ষণিকা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "বাড়ীর লোক আর আছে কে? মাসিমা ঐ ঘরে আছেন। আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

মহিলাটি গৃহিণীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "আমাকে আর চিন্‌বে কি ক'রে? আমাকে দেখনি আগে কখনও। যাকে খুব চিন্‌তে আমি তারই বড় বোন। অনাদি কোথায়?"

ক্ষণিকা বলিল, "জানি না, খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।"

এমন সময় বৃদ্ধা গৃহিণী ঘরের ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কে কথা কইছ গা? এ দিকে এস, দেখি একবার।"

আগন্তুক মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া ক্ষণিকা তাঁহার ঘরে ঢুকিল। গৃহিণী তাঁহাকে চিনিবামাত্র ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ক্ষণিকার চোখের সম্মুখে ঘরখানা ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এরকম করিয়া আর কতদিন কাটিবে? ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়া কোনো লাভ নাই, কারণ ভবিষ্যতের বিধান যিনি করেন তিনি মানুষের ভাবনার ধার ধারেন না। কিন্তু না ভাবিয়াও যে মানুষ পারে না? ক্ষণিকার জীবনের যেটুকু

পথ সে অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহাতে পদে পদে কাঁটা মাড়াইয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে, কিন্তু তবু ত তাহা চলা। এমন করিয়া গভীর অন্ধকারের কারায় বন্দিনী হইয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া ?

মনোজার মৃত্যুর পর কয়েকদিন বাড়ীর সকলেই কেমন যেন অভিভূতের মত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু ভাবিবার বা কিছু করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। প্রতিবেশীদের সযত্ন সেবার গুণে সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু মানুষ কয়টি কেমন যেন পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া গেল। সংসারের ভার তাহার উপর ছিল, কাজেই বাধ্য হইয়া ক্ষণিকাকে চাকরবাকরের সঙ্গে কথা বলিতেই হইত। বেণু তখনও আসে নাই, গৃহিণীর সঙ্গে কথা বলিয়া কোনো লাভ ছিল না। আর অনাদিনাথ ?

মনোজার মৃত্যুর পর হইতে পরিচিত-জগৎ যে-অনাদি-নাথকে জানিত, তাহাকে আর খুঁজিয়া পায় নাই। সত্য বটে, সেই আকারের এবং সেই নামধারী একজন মানুষ তখনও লোকের চোখে পড়িত, কিন্তু তাহাকে পূর্ব্বের পরিচিত বলিয়া দাবি করিতে কেহ সাহস করিত না। তাঁহার কাজকর্ম্ম আগে যে নিয়মে চলিত, এখনও তাই চলে, তাহার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু এইসকল কর্ম্মের

মধ্যে যে প্রাণবান মানুষের সংস্পর্শ আছে তাহা আর মনে হয় না। ক্ষণিকা আর তাঁহার মুখের দিকে একবারও চাহিয়া দেখে নাই। কথা বলিবার প্রয়োজনও ছিল না, সুযোগও মিলিত না। অনাদিনাথ তাহার মনোজগতে এখন আছেন কি নাই, এ চিন্তাকে সে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিত। আর এখন সে কথা ভাবিবার উপায় নাই। জীবিতলোকে যাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ক্ষণিকা মনে মনেও সম্বোধন করিয়াছিল, আজ মৃত্যুর পরপার হইতে তাহার অপরাজেয় আধিপত্য সে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইল। তাহার অনুভূতির সঙ্গে যাহা এমন ভাবে মিশিয়া আছে তাহাকে দূর করিতে হয়ত সে পারিবে না, কিন্তু আর তাহাকে মানিয়া লইবার উপায় নাই।

গৃহিণীর কান্নার শব্দ থামিয়া গিয়াছে, ক্ষণিকা আবার ধীরে ধীরে তাঁহার ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘরের ভিতর পদার্পণ করিয়াই সে প্রথম কথা শুনিল—"অনাদি কি করবেন ঠিক করেছেন?"

গৃহিণী অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিলেন, "সে ত কাজ ছেড়ে দিল। বেড়াতে বেরবে বল্‌ছে, জানি না মা কোথায় যাবে। সবাই ত ছেড়ে গেল, তবু আমার মরণ হয় না বাছা! এমন কপাল নিয়ে আর কেউ জন্মায়নি।"

মনোজার দিদি বলিলেন, "আপনার খুব ভাল ব্যবস্থা না করে কি আর যাবেন? মন এখন খারাপ, তাই বেরিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছেন, কিন্তু মানুষের মন সময়ে আবার ত বদ্‌লায়।"

গৃহিণী বলিলেন "আমার আবার ব্যবস্থা! একেবারে মুখাগ্নিটা করে যেত, তাহলে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হত। নাত্‌নীটা কাছে ছিল, তাকেও ত পিসি নেবার জন্যে দুই হাত বাড়িয়ে আছে। আমি যাচ্ছি ভাইয়ের ঘাড়ে জাঁততে, আর যাব কোন্ চুলোয়?"

আর কোন কথা হইল না। অল্পক্ষণ পরেই আগন্তুক মহিলা বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ক্ষণিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। গৃহিণীর ঘর হইতে খানিকটা দূরে আসিয়া তিনি বলিলেন, "তোমাকে দেখিনি, কিন্তু জানি খুব ভাল ক'রেই। যা আমার কর্‌বার ছিল সে কাজ তুমিই করেছ, হয় ত আমার চেয়ে ভাল ক'রেই করেছ।"

ক্ষণিকা বলিল, "আমার কাজই আমি করেছি, তাও যতটা কর্‌বার ছিল তা কর্‌তে পারিনি।"

মনোজার দিদি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি কি এর পরেও কাজ কর্‌বে?"

ক্ষণিকা বলিল, "করতে হবে বইকি। আমার শক্তি হয় ত শেষ হয়ে আস্ছে, কিন্তু প্রয়োজনের শেষ ত কোথাও দেখ্‌ছি না।"

ক্ষণিকার দুই হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, "আমার কাছে আস্‌বে? ওর আর কোন চিহ্ন আমার কাছে নেই, তোমাকে সে ভালবাস্ত তা আমি জানি। তুমি চল আমার সঙ্গে।"

ক্ষণিকার বুকের ভিতরটা তীব্র বেদনায় শিহরিয়া উঠিল। মনোজার স্মৃতিচিহ্ন হইয়া কিনা শেষে তাহাকেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? নিয়তির তাহাকে লইয়া পরিহাসের এখনও কি অবসান হয় নাই?

নবাগতা বলিলেন, "কি বল? আস্‌বে?"

ক্ষণিকা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "এখন কিছুদিন ত পারব না, পরে ভেবে দেখ্‌ব।"

"আচ্ছা, আমি গিয়েই তোমায় চিঠি লিখ্‌ব, ঠিকানাটা রেখো। কখনো যদি আসতে ইচ্ছা হয় এসো।" তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্ষণিকা সেই ধূলিময় সিঁড়ির উপর বসিয়া নিজের চিন্তাকে একেবারে রাশ ছাড়িয়া দিল। ভাবনাকে অত ঠেকাইয়া রাখিবারই বা প্রয়োজন কি? একবার শেষ

অবধি ভাবিয়া দেখা যাক না, কতদূর ভাবা যায়? ভাবনা বা কল্পনার অতীত দুঃখও যদি কিছু থাকে ত থাক। সম্প্রতি যাহাদের ধারণার গণ্ডীর ভিতর আনা যায় তাহাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখা যাক।

বিদায়ের ক্ষণ ত আসিয়া পড়িল। আজ নাই হোক, দু তিন দিনের মধ্যেই। ইহা যে চিরদিনের মত বিদায় সে বিষয়ে বিধাতা এবার আর কোনো সন্দেহ রাখেন নাই। আবার যদি শতবারও ক্ষণিকাকে এই পৃথিবীতে নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও যে জীবনকে সে আজ বিদায় দিতেছে তাহার ভিতর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। পারিবে ত নাই, যাইতে চাহিবার অধিকারও তাহার থাকিবে না। কিন্তু ইহার পর সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? তাহার জগৎ সংসার সকলই ত এক চিতায় ভস্ম হইয়া গেল, কিন্তু সে যে বাঁচিয়া আছে এবং থাকিবেও? স্বর্গ সে চায় না, পৃথিবীকে ভগবান তাহার পায়ের তলা হইতে সরাইয়া দিলেন। এখন তবে কোন্ শূন্যতার মধ্যে মাটির মানুষ সে আশ্রয় পাইবে? তাহার প্রাণ যায় নাই, কিন্তু প্রাণ ধারণের উপায় কোথায়? পাওয়ার দিকে সে কিছুই পায় নাই, কিন্তু দিবার সুযোগ তাহার ছিল, ভাবিবার সুযোগ তাহার ছিল।

কিন্তু এখন ত সংসারে এমন কেহ রহিল না যে তাহার দান গ্রহণ করিবে, পরলোক হইতে যাহার দিকে এমন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা বাহু বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তাহার ভাবনা ভাবিবার মত সাহস ক্ষণিকার নাই। জীবিতের ধন অপহরণ করা যায়, কিন্তু দেহত্যাগ করিয়া যে চলিয়া গিয়াছে তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ ত চিন্তাতেও করা যায় না। আর কাহাকেই বা সে কামনা করিবে? মনোজা নাই, কিন্তু অনাদিনাথই বা আছেন কোথায়? যে মানুষকে তাহারা দুজনে ভালবাসিয়াছিল, একজন যাহাকে মনোমন্দিরে অশ্রুর অর্ঘ্যে নিরন্তর পূজা করিয়াছে, আর একজন যাহাকে আপনার দেহ মন হৃদয়ের সকল সম্পদ দিয়া ধন্য হইয়াছে, তিনি আজ কোথায়? মনোজার চিতায় কি ক্ষণিকার পরিচিত অনাদিনাথও ভস্ম হইয়া যান নাই? মনোজার প্রিয়তম যিনি ছিলেন, সে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়াই হয়ত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন যাঁহাকে দেখা যায়, ক্ষণিকার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় নাই, সে তাঁহার দিকে তাকাইতেও পারে না।

নীচে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া সে সিঁড়ি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। কাজ এখনও তাহার ফুরায় নাই। তাহার

এতকালের চেনা সংসারকে বিদায় দিবার আয়োজন ত তাহাকেই করিতে হইবে? কিন্তু সে আয়োজন ত একলা সে করিতে পারিবে না! এই বিসর্জ্জনের ব্যাপারে আর-একটি অন্ততঃ মানুষের সাহায্য তাহার দর্কার। ক্ষণিকা তাঁহারই সন্ধানে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচের তলায় সর্ব্বত্র সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিয়াছে। একটা ঘরের দরজার ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা বাহিরের আঁধারের গায়ে স্থির বিদ্যুতের মত হাসিতেছে। ক্ষণিকা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে আস্‌বো?"

অনাদিনাথ চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন।"

ক্ষণিকা ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, "মাসিমা যাবার পর ত আমি থাক্‌তে পার্‌ব না, সেই কথা বল্‌তে এলাম।" ইহাও তাহাকে বলিয়া দিতে হইল! তাহার ভাবনা অতটুকু ভাবিবারও যে কেহ নাই!

অনাদিনাথ বলিলেন, "তা ত বটে! আমার মনে ছিল না। বেণুকে পর্‌শু তার পিসিমা নিয়ে যাবেন, আপনিও তা হলে তার পরই যাবার বন্দোবস্ত কর্‌বেন। আমার দ্বারা কিছু সাহায্য হয় ত জানাবেন।"

ক্ষণিকা দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "মাসিমা কবে যাবেন ?"

অনাদিনাথ বলিলেন, "ঠিক নেই, আমি বেরবার আগে তাঁকে আমার মামার কাছে রেখে যাব।"

ক্ষণিকা বাহির হইয়া আসিল। আর দুইটা দিন মাত্র। তাহার পর কি হইবে তাহা ভাবিয়া কি স্থির করা যায় ? কই, যতখানি বেদনা সে অনুভব করিবে মনে করিয়াছিল, ঠিক তেমন ত বোধ হইতেছে না, তাহার ব্যথার অনুভূতিও কি মরিয়া গেল ? কিন্তু দুঃখ গেলে তাহার থাকিবে কি ? জীবনের পথে সঞ্চয়ের ঘরে এই বেদনার ধন ছাড়া তাহার কিছুই জমে নাই। তাহাও যদি আজ হারায় তাহা হইলে যে রিক্ততার মধ্যে তাহাকে পড়িতে হইবে তাহাকে সে কল্পনাও করিতে পারে না।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে রাত্রির বিপুল অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। নিজের ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া ক্ষণিকা এতদিনের সযত্নে সজ্জিত নীড়কে আপন হাতে টানিয়া ভাঙিতে লাগিল। এই ঘর থাকিবে, এইসব তুচ্ছ জিনিষগুলাও এখনই ধরার পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে না, কিন্তু ক্ষণিকার ঘর কি আবার কোথাও আকার গ্রহণ করিবে ? যে মনোভাব হইতে মানুষের গৃহ জন্মলাভ করে, তাহা

কোথায় কোন্ শূন্যে এখন উড়িয়া বেড়াইতেছে। ধরণীর কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের বন্ধনে আর কি তাহারা কোনোদিনও বাঁধা পড়িবে?

অনেক রাত অবধি জাগিয়া থাকিয়া ক্ষণিকা এই বিনাশের যজ্ঞে আহুতি দিল। ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ার পরেও তাহার অতন্দ্রিত বেদনাবিদ্ধ হৃদয় এই গৃহেরই প্রতি কোণে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। সারারাত স্বপ্নের ঘোরে সে এই গৃহের মধ্যে, তাহার চিরদিনের জন্য হারানো বিগত জীবনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল। জাগরণ-লোকে যাহা আর থাকিবে না, স্বপ্নের করুণাময় লোকে তাহাই যেন তাহার কাছে সকলের চেয়ে সত্য হইয়া উঠিল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আর একটিমাত্র রাত্রির অবসানে সে এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে দেখিতে পাইবে। তাহার পর অসংখ্য রাত্রি অসংখ্য অবসান লইয়া ত তাহার সম্মুখের জীবন পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোন্ দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইবে?

নীচে নামিতেই অনাদিনাথের দরোয়ান তাহার হাতে একখানা খাম দিয়া বলিল, "বাবু ভোরেই বেরিয়েছেন, এইটা আপনাকে দিতে ব'লে গিয়েছেন।"

ক্ষণিকার হৃদয় কি যেন একটা আশায় চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে আপনাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কঠিন-হস্তে খামখানা খুলিয়া ফেলিল! ভিতরে কয়েকখানা নোট, আর কিছু নাই।

ক্ষণিকার মুখে হাসি দেখা দিল। এই ত ঠিক। ইহার চেয়ে উপযুক্ততর বিদায়বাণী আর কিছু হইতেই পারে না। তাহার দিকে যাহাই থাক, অন্য দিকে টাকার পরিবর্ত্তে কাজ—এ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

ক্ষণিকার টাকার প্রয়োজন কোনওদিন কম থাকিত না। কিন্তু তবু এ টাকা সে প্রয়োজনের জন্য গ্রহণ করিতে কিছুতেই পারিল না। দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "আমায় একশ টাকার মধ্যে একটা ছোট সোনার হার কিনে এনে দিতে পার?"

এ বাড়ীতে আসিয়া খেয়ালী মনিবের পাল্লায় পড়িয়া তাহাকে অনেকরকম অচিন্তনীয় ব্যাপার করিতে হইয়াছে, অগত্যা সে স্বীকার করিল।

সেদিন ভাত খাইবার সময় বেণুকে ক্ষণিকা লাল শাড়ী পরাইয়া, ভাল করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সোনার হারটা তাহার গলায় পরাইয়া দিল। বেণুর ত আনন্দ ধরে না। ক্ষণিকা তাহাকে কোলে করিয়া খাওয়াইতে বসিল, ইহা দেখিয়া সে

জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বুঝি আজ জন্মদিন মাসিমা ? ও মাসের জন্মদিনে ত সোনার হার দাওনি ?"

ক্ষণিকা চোখ মুছিয়া বলিল, "এই মাসের জন্মদিনেই সোনার হার পরে। আচ্ছা বেণু, মাসিমাকে তোমার মনে থাকবে ?"

বেণু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁউ। আমি তোমাকে ভুল্‌বই না, আবার পাঁচ দিন পরে পিসিমার বাড়ী থেকে পালিয়ে আস্‌ব।"

দিনটা দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। শুইতে যাইবার আগে বৃদ্ধা গৃহিণীর কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষণিকা বলিল. "মাসিমা, কাল আমি যাচ্চি। অনেকদিন আপনার কাছে ছিলাম. দোষ অনেক হয়েছে, কিছু মনে রাখ্‌বেন না।"

গৃহিণী তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া আনিয়া আবার কান্না জুড়িয়া দিলেন। ক্ষণিকার চোখের জলও অবাধে ঝরিতে লাগিল। যাহা বলিবার তাহা ভাষায় ত আর কুলায় না, চোখের জলের ভিতর দিয়াই এক বলা চলে।

বেণু পরদিন সকালেই চলিয়া গেল। যাইবার সময় সকলের চোখের জল তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়কে কেমন যেন ভয়চকিত করিয়া তুলিল। সে ক্ষণিকার গায়ে মাথা গুঁজিয়া

কেবলি বলিতে লাগিল, "মাসিমা, আমি পরশু চলে আসব।" ক্ষণিকা তাহাকে জোর করিয়া তাহার পিসির বাড়ীর ঝিয়ের কোলে তুলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ইহার পর তাহার নিজের বিদায়ের পালা। যথাসাধ্য ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টায় সে ঘটা করিয়া কাহারও কাছে বিদায় লইতে গেল না। তবু অনাদিনাথের মায়ের হাতে পড়িয়া তাহাকে আর-একবার কাঁদিতে হইল। অনাদিনাথকে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া সে একবার প্রণাম করিয়া আসিল। তিনি একবার শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। ক্ষণিকা তাঁহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

কৃষ্ণলালই তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিতেই ক্ষণিকা একবার মুখ বাহির করিয়া চাহিয়া দেখিল। এই ত শেষ দেখা। আর-একবার সে ছাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য তাহাকে ছাড়ে নাই। কিন্তু আর ত এ সংসার রহিল না, আর তাহাকে ফিরিতে হইবে না।

গেট পার হইয়াই কৃষ্ণলাল জোরে গাড়ী চালাইয়া দিল। মুহূর্তের জন্য সেই সুপরিচিত গৃহ, পথ, বাগান ক্ষণিকার চোখের উপর বিদ্যুতের মত খেলিয়া গিয়া মিলাইয়া গেল।

তাহার মাথাটা আপনা-হইতেই গাড়ীর কোণে ঢলিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমাকে নূতন জীবন দাও। এই চোখে এ পৃথিবীকে আর আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। এর সঙ্গে যা-কিছুর ভিতর দিয়ে আমার পরিচয়, আজ সব শেষ হয়েছে, তবে তোমার সৃষ্টিকে আবার নূতন করে সৃষ্টি কর।"

( ২৪ )

লালু স্কুল হইতে ফিরিবার পথে মহা স্ফূর্ত্তিতে শিষ দিতে দিতে চলিতেছিল। আজ তাহাদের ডিবেটিং ক্লবে তাহার লেখাটার 'স্যার' খুব প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুলের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক নীলিমেশের মুখ একেবারে চুন! বাহির হইতে না হইতেই সে লালুকে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের থেকে টুকেছ বাছাধন?"

ইহাতে লালুর উল্লাস বাড়িয়াছে বই কমে নাই। লেখাটা তাহা হইলে এমনই ভাল হইয়াছে যে লালুর রচনা বলিয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। বিপক্ষের ঈর্ষার পাত্র হওয়া ত কম সুখের বিষয় নয়? আঃ, আজ যদি দিদিটা থাকিত! বাড়ীতে ত থাকিবার মধ্যে এক মা। বাবার কথা ছাড়িয়াই দাও, আর দাদাকে লেখার কথা বলাও যা—মাতালকে হরিনাম শোনানও তা। এমন একটা মানুষ

নাই ঘরে, যাহাকে তাহার এই মহা আনন্দের ভাগ দেওয়া যায়। ছোড়্‌দি থাকিলেও হইত। বুঝুক, নাই বুঝুক, তাহাকে ক্ষ্যাপাইতে ত অন্তত পারা যায়? কিন্তু দিদি থাকিলে সব দিক দিয়া ভাল হইত।

এমন সময় ঠিক তাহাদেরই গলির সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। লালু অবাক হইয়া দেখিল যে-দিদির জন্য সে এতক্ষণ এক-মনে কামনা করিতেছিল, সে-ই গাড়ী হইতে নামিল।

অতিরিক্ত বিস্ময়ে তাহার কথা শুদ্ধ যেন লোপ পাইয়াছিল। কোথাও কিছু নাই, না বলা, না কওয়া, হটাৎ আসিয়া উপস্থিত। এ যেন আরব্য-উপন্যাসের গল্পের মত। একটা আংটি হাতে করিয়া দুনিয়ার যাহা-কিছু ইচ্ছা কর, অমনি তা আসিয়া হাজির!

গাড়ীর উপর হইতে বাক্স-বিছানা নামাইয়া সহিসটা গলির ভিতর চলিল। লালুর লুপ্তশক্তি এতক্ষণে ফিরিয়া আসিল। গাড়ীর ভিতরে একটা ছোট বেতের বাক্স তখনও পড়িয়া ছিল, সেটা চট্‌ করিয়া উঠাইয়া লইয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে চলিল।

ক্ষণিকা সদর দরজা পার হইয়াই তাহার মাকে দেখিতে পাইল। তিনি অকস্মাৎ মেয়েকে সম্মুখে দেখিয়া অবাক্

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ এলি যে? কেউ আনতে গেল না কিছু না।"

ক্ষণিকা বলিল, "মা, পিছনে গাড়ীর লোকটা জিনিষ নিয়ে আসছে, তার হাতে ভাড়ার আট-আনা পয়সা দিয়ে দিও।" বলিয়াই ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটা মাদুর কোনরকমে মেঝের উপর টানিয়া ফেলিয়া, তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

লালু ততক্ষণে বেতের বাক্স হাতে করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মা তাহাকে দেখিয়াই, "গাড়োয়ানের ভাড়াটা চুকিয়ে দে, বালিশের তলায় পয়সা আছে। দেখি আমি মেয়ের কি হল!" বলিয়াই একরকম ছুটিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন।

লালু মায়ের কথামত ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মা ততক্ষণ মেয়ের মাথা কোলে তুলিয়া চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "এ রকম জ্বর নিয়ে একলা এতটা পথ এলি? তারাই বা ছেড়ে দিল কি বলে? বাড়ীতে বিপদ তা না-হয় বুঝ্‌লাম, কিন্তু তাই বলে কি মানুষের দিকে একেবারে তাকাতে নেই?"

ক্ষণিকা মাথাটা তুলিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া

দেখিল, তারপর বলিল, "জ্বর পথে হয়েছে, তারা কি করে জানবে?"

লালু বলিল, "মা দিদির জন্যে কিছু কিনে আনব ফল-টল? আজ ত আর ভাত খাবে না?"

তাহার মা বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ আবার ভাত খাবে, কবে খায় দেখ এখন। গা ত আগুনের মত গরম। যাই, দুধটা গরম করে আনি। তুই বোস্ একটু দিদির কাছে।"

লালু দিদির পাশে আসিয়া বসিল। বলিবার কথায় ত তাহার আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দিদির অবস্থাটা ঠিক তাহার কথা শুনিবার মত নয়। সে যে একটাও কথা বলে না?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার কি খুব মাথা ব্যথা করছে? টিপে দেব?"

ক্ষণিকা বলিল, "দে।" লালু মাথায় হাত দিয়া দেখিল গা খুবই গরম। তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিজয়গর্ব্বটা খানিকটা যেন ম্লান হইয়া গেল। ভাগ্যের উপর রাগও হইল, সেই দিদি আসিলই যদি, ত সুস্থ শরীরে আসিলেই ত চলিত? কিন্তু এখন সে কথা বলাও ত উচিত হয় না। এমন সময় মা আসিয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন।

লালু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, "মা, দিদির বোধ হয় ভয়ানক মাথা ধরেছে। বালিশটা ত ভিজে গিয়েছে, কাঁদ্‌ছে বোধ হয়।"

তাহার মা বলিলেন, "তুই যা, খাবার রেখে এসেছি, নিয়ে খেগে যা। আমি দেখ্‌ছি ওকে।"

তিনি আসিয়া নীরবে মেয়ের পাশে বসিয়া রহিলেন। দারুণ রোগযন্ত্রণাও যে নীরবে সহ্য করিত, সে যে সামান্য মাথাধরার জন্য কাঁদিতেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। মেনকা হইলে না-হয় কথা ছিল, অল্প একটু-কিছুতেই কাঁদিয়া-কাটিয়া সে হাট বসাইয়া দেয়। কিন্তু ক্ষণিকার মুখ হইতে রোগে শোকে একটু কাতরোক্তিও ত কেহ কখনও শোনে নাই? পারিবারিক বিপদে তিনি নিজে যখন অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তখনও ত ক্ষণিকা তাঁহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিয়া, সংসারের সব ভার নিজেই বহন করিয়াছে। দুঃখ-বিপদে এতদিন যে ধৈর্য্য তিনি অবিচলিত দেখিয়াছেন, আজ কিসের আঘাতে তাহা টুটিয়া গেল? মনোজার মৃত্যু-সংবাদ তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সে ত অনেকদিন হইয়া গেল!

অনেক পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানের কাজে কি একেবারে জবাব দিয়ে এলি?"

ক্ষণিকা বলিল, "সে কাজ ত ভগবানই চুকিয়ে দিলেন, আমাকে আর জবাব দিতে হয়নি।"

মা বলিলেন, "তা যাক। এখন কিছুদিন আর তোকে কোথাও যেতে দেবো না। এক-একবার গিয়ে কি যে হয়ে আসিস্। সংসার যেমন করে হোক চল্‌বে।"

ক্ষণিকা কোন উত্তর দিল না। তাহার মা খানিক পরে আবার বলিলেন, "কেঁদে আর কি করবে বাছা? সংসার কর্‌তে হলেই এসব সইতে হয়। সুখ কপালে থাক্ বা না থাক্, দুঃখের হাত থেকে কারু নিষ্কৃতি নেই!"

ক্ষণিকা হটাৎ উঠিয়া বসিল। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, সংসারে কি আমি আসতে চেয়েছিলাম? তোমরা বল ভগবান ন্যায়বান্, কিন্তু এই কি ন্যায়? যে জীবনের জন্যে আমি কোনও অংশে দায়ী নই, তার জন্যে এত দুঃখ আমাকে সইতে হবে? একবারও বল্‌তে পাব না যে আমি সইব না? কপালে লেখা যে থাকে, সে কার লিখন? যেমন খুসী লিখ্‌লেই কি হল? আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, কিছুই কি তিনি দেখ্‌বেন না? শাস্তি পাবার উপযুক্ত, কি সুখ পাবার যোগ্য তাও দেখ্‌বার দর্‌কার নেই? যিনি আমাদের কোনো নিয়ম মানেন না, কেন আমরা কেবলই তাঁর নিয়ম মেনে চল্‌ব? আমরা

সামান্য মানুষ মা, কিন্তু এমন অবিচার করতে পারতাম না।”

ক্ষণিকার মা শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন। ইহারও মুখে এমন কথা? এ কি রোগীর প্রলাপ? তিনি তাহাকে তাড়াতাড়ি আবার ধরিয়া শোয়াইয়া বলিলেন, “থাক্ মা, এখন কথা বোলো না অত, ওতে জ্বর বাড়্তে পারে। দেখি প্রবোধ আসুক, একবার ডাক্তার-বাবুকে খবর দিতে বলি।”

ক্ষণিকা বলিল, “ডাক্তারে আমার দর্কার নেই মা, থাক্ এখন।”

তাহার মা বলিলেন, “তোর না থাক্, আমার ত আছে? আগে ছেলের মা হও, তার পর বুঝ্বে যে দর্কার কতখানি।”

ক্ষণিকা পাশ ফিরিয়া শুইল। জগতের সব বন্ধন তাহার এখনও ছিন্ন হয় নাই। যে মাটিতে সে জন্মলাভ করিয়াছিল, এতদিন আকাশের নীলিমায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভুলিয়াই গিয়াছিল। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে আজ দিগন্ত পর্য্যন্ত ঢাকা, আজ তাই আবার তাহার শৈশবের স্নেহনীড়ের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে পথে দাঁড়াইতে

হয় নাই, একটি আশ্রয় এখনও তাহার আছে। না চাহিতেই, না জানিয়াই যাহাদের ভালবাসা সে পাইয়াছিল, তাহাদের প্রেম এখনও সে হারায় নাই। ভগবান অযাচিতভাবে দুঃখ তাহাকে দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেবল দুঃখই দেন নাই। চাহিয়া সে যাহা পায় নাই, শুধু তাহাই কি মনে রাখিবে, না চাহিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাও কি মনে রাখিবার নয়? সংসারে আসিবার মুহূর্ত্তে জীবকে ভীষণ যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই আসিতে হয়; কিন্তু সেইটুকুকে পরবর্ত্তী জীবনের সকল আনন্দের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে কি তাহার রূপ অন্যপ্রকার দেখায় না? আমাদের একই জীবনে আমাদের কতবার যে নূতন জন্ম লাভ করিতে হয়, তাহার ত ঠিকানা নাই, কিন্তু সে-সকল জন্মের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তও ত বেদনায় পরিব্যাপ্ত? খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে দুঃখকে যত বিরাট দেখায়, অখণ্ডভাবে সমগ্র জীবনকে যদি দেখি, তাহা হইলেও কি দুঃখ তেমনিই অসীম থাকে?

সন্ধ্যাবেলা প্রবোধ আসিল। মায়ের কাছে সব খবর শুনিয়া খানিক বকাবকি করিল, বাড়ীর লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্বন্ধে অনেকপ্রকার মন্তব্যও প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার পরে ডাক্তারও ডাকিতে গেল।

ক্ষণিকার মা ঘরে আলো দিতে আসিয়া দেখিলেন,

ক্ষণিকা বালিশে ঠেশ দিয়া আবার উঠিয়া বসিয়া আছে। আলোটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার বস্‌লি যে ? একটু ঘুমতে চেষ্টা কর্‌না ?"

ক্ষণিকা ক্লান্তকণ্ঠে বলিল, "ঘুম একেবারেই আস্‌ছে না। আচ্ছা জ্যাঠাইমারা এখন কোথায় ?"

"তিনি ত এখানেই আছেন। চোখে অস্ত্র করে চোখ ত খোয়ালেন, বুড়ো-বয়সে দুর্ভোগ দেখ একবার। চিন্ময় ত কল্‌কাতাতেই আছে, কেন তোর সঙ্গে দেখা করেনি ?"

ক্ষণিকা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে চিন্ময়ের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই। ক্ষণিকার মা বলিয়া চলিলেন, "না না, হ্যাঙ্গামে থাকে, তাই বোধহয় দেখা কর্‌তে পারেনি। দেশ থেকে কে এক পিস্‌তুতো বোনকে এনে রেখে গেছে, সেই বুড়ী-মায়ের দেখাশুনো কর্‌ছে। হিরণ্ময়টা ত কোন কাজেরই নয়, আর বেটা-ছেলে কত কাজেরই বা হবে ? সেদিন দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, বেচারী কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, বল্‌ল, 'বোন, একটা মেয়ে যদি থাক্‌ত, তা হলে কি আর এত খোয়ার হত ?' আমি আর কি বল্‌ব বল ? বল্‌লাম, 'ছেলের বিয়ে দাও, বৌ এসে সেবা কর্‌বে।' তা বলে 'ছেলে ত আর আমার কথা শোনে না, সে বিয়ে কর্‌বে না'।"

ক্ষণিকার মা যাহা বলিবার ছিল শেষ অবধি বলিয়া গেলেন। ক্ষণিকা কোন কথাই বলিল না। প্রবোধ ডাক্তার লইয়া আসিল। তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার পরীক্ষা, প্রশ্ন করা, ব্যবস্থা দেওয়া সব সমাপন করিয়া আবার বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ডাক্তার-বাবুকে ভিজিটের টাকা দিলে না ?"

ক্ষণিকার মা বলিলেন, "উনি নেন্ না, প্রবোধের বন্ধু কিনা ? তা না হলে কি আর যখন-তখন ডাকা চল্‌ত ?"

ক্ষণিকা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, যাকে কিছু দিতে হয় না, তাকেই কি যখন-তখন ডাকা যায় ?"

মেয়ের হাসি দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া মা বলিলেন, "এখন একটু ভাল বোধ কর্‌ছিস্, না রে ? আলোটা আড়াল করে দিচ্ছি, দেখ্‌না একটু ঘুমতে পারিস্ কি না।" আলোর সাম্‌নে একখানা পুরাতন মাসিকপত্র আড়াল করিয়া দিয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন। ক্ষণিকা শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনের ভিতর হাজার রকম ভাবনা তোলপাড় করিয়া ঘুমকে তাহার চোখ হইতে দূর করিয়া দিল।

যাহাদের ভিতর দিয়া বিধাতা তাহার জীবনে আঘাত আর বেদনা অজস্রধারে ঢালিয়া দিলেন, ক্ষণিকা এতদিন

কেবল তাহাদের ভাবনাই ভাবিয়াছে। কিন্তু আঘাতের অস্ত্ররূপে তাহাকেও কি কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই? জগতে এমন মানুষ কি কেহই নাই যে তাহাকে সকলের চেয়ে ভালবাসিয়া, সকলের চেয়ে কঠিন আঘাত তাহারই কাছ হইতে পাইয়াছে? এমন কি কেহ নাই যাহার কাছে ক্ষণিকা চিরজীবন অসঙ্কোচে দান গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিদানে কিছুই দেয় নাই? আপনাকে কিছুই দিতে হয় নাই বলিয়া কি তাহাকে সময়ে অসময়ে ডাকিতে কোনোদিন তাহার বাধে নাই? আলো-বাতাসের মত যাহাকে অতি সহজে চিরদিন পাইয়া আসিয়াছে, সেও যে মানুষ, সেও যে দানের বদলে প্রতিদান চায় তাহা ক্ষণিকা মনে রাখে নাই।

সত্য বটে চিন্ময় তাহার নিকটে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা দিবার ক্ষমতা ক্ষণিকার ছিল না। কিন্তু ঋণ-পরিশোধের আর কি অন্য উপায় নাই? প্রাণপণ সেবায় কি ভালবাসার ঋণ অল্প পরিমাণেও শোধ হয় না? চিন্ময়ের শ্রেষ্ঠদান যাহা তাহা না-হয় ঋণরূপেই আমরণ থাকিয়া গেল, কিন্তু চিরদিন তাহার কাছে যে অক্লান্ত সহায়তা সে লাভ করিয়া আসিল, এখন ত তাহার কিছু প্রতিদান দিবার দিন আসিয়াছে।

নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের রাজ্যেও কিন্তু তাহার ভাবনার দল তাহাকে

একেবারে অব্যাহতি দিল না। সারারাত স্বপ্নে সে তাহাদেরই মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল, যাহারা জাগরণের লোকে তাহার সংসার জুড়িয়া ছিল। পরলোক হইতেও তাহার হৃদয় কাহার যেন সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভোরের বেলা দুঃস্বপ্নের মধ্যেই তাহার ঘুমের অবসান হইল। ঘর তাহার সত্যই ভাঙ্গিয়াছিল তাই স্বপ্নেও সে দুঃখ তাহার মনে লাগিয়াছিল। কোথাকার বাসা ছাড়িয়া যেন তাহারা পথে বাহির হইতেছে। জিনিষ-পত্র গোছানোর একটা অস্ফুট কোলাহল, কোথায় যেন প্রচণ্ড হাতুড়ির শব্দ করিয়া কে ক্রমাগতই বাক্সের গায়ে পেরেক মারিয়া চলিয়াছে, তাহার আঘাতটা যেন ক্ষণিকার বুকে ঠিক সমান জোরেই বাজিতেছে। ইহারই শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চাহিয়া দেখিল তখনও ভোরের আলো সুপরিস্ফুট হয় নাই। যে স্বপ্নলোকের মাঝ হইতে সে জাগিয়া উঠিল, তাহারই মত সমস্তই যেন আবছায়া, ঝাপ্‌সা। ঘরের ভিতর তাহার মা আর লালু আর-একপাশে ঘুমাইয়া আছেন, আন্দাজে বুঝিতে পারিল।

দিনের বেলাটা জ্বরের ঘোরে তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে কেমন করিয়া, কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে

পারিল না। এক-একবার চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, তাহার মা অথবা ভাই পাশে বসিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। একবার দ্বারের কাছে আর-একজন কাহাকে যেন দেখিল, যে তাহার পরিচিত, অথচ যাহাকে সে তখন কিছুতেই চিনিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় কে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, তোমার একখানা চিঠি এসেছে।"

ক্ষণিকা ফিরিয়া তাকাইল। লালু চিঠিখানা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া, আলোটা কাছে আনিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। চিঠির হস্তাক্ষর তাহার পরিচিত নয়। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল। মনোজার দিদি মুখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

এমন সময় ক্ষণিকার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "মাথায় এত যন্ত্রণা, আবার পড়্ছিস কেন? কে তোকে চিঠি লিখেছে?"

ক্ষণিকা বলিল, "রেখে দাও মা ঠিকানাটা, হয়ত যেতে হবে।"

মা বলিলেন, "কোথাও এখন তোমার যেতে হবে না, একেবারে যেতে হয় নিজের ঘরে যেও। পরের বাড়ী ঘুরে ঘুরে আর তোমায় আধ্‌মরা হয়ে আস্‌তে হবে না।"

ক্ষণিকা বলিল, "ঘর সকলের জন্যে ভগবান রাখেন না, তবু ত তাদের পৃথিবীতে থাকতে হয়?"

তাহার মা বলিলেন, "এখন বক্‌বক্‌ না করে ঘুমোও। যতদিন আমাদের একটা মাথা গুঁজ্‌বার কুঁড়েঘর থাক্‌বে, ততদিন পরের দরজায়, দায়ে পড়ে অন্ততঃ, তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।"

ক্ষণিকা আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। কয়েকটা দিন তাহার যেন অজ্ঞাতসারেই কাটিয়া গেল। দিন-রাত্রির প্রভেদও সব সময় মনে থাকে না। কখন একসময় চাহিয়া দেখে, মা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেছেন। না-হয় দাদা ঘরের জান্‌লা-দরজা খুলিতেই সকালের আলো নূতন দিনের দূতরূপে হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আবার কখন দেখিতে দেখিতে দিনের আলো ম্লান হইয়া আসে, জান্‌লার ভিতর দিয়া আকাশের যে টুক্‌রাটি দেখা যায়, তাহার উজ্জ্বল নীলিমা, কালিমায় ঢাকা পড়িয়া যায়।

কপালের উপর কাহার যেন হাতের শীতল স্পর্শ পাইয়া সে একবার চোখ খুলিয়া তাকাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্ময়দা, তুমি কখন্‌ এলে? তুমি না কল্‌কাতায় ছিলে?"

চিন্ময় তাহার খাটের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "তিন দিন

হল এসেছি। কাল পরশু, দুদিনই তোমায় দেখ্‌তে এসেছিলাম, তুমি ঘুমচ্ছিলে।"

ক্ষণিকা বলিল, "ঘুমইনি, একবার মনে হয়েছিল যেন তোমায় দেখ্‌লাম, কিন্তু ঠিক চিন্‌তে পারিনি। তোমার মা কেমন আছেন ?"

চিন্ময় বলিল, "তাঁর অবস্থায় যতটা ভাল থাকা সম্ভব। আমার কাজ কল্‌কাতায়, অথচ মাকে যে কার কাছে রেখে যাব, বুঝ্‌তে পারি না। আমার পিস্‌তুতো বোন কিছুদিন এসেছিলেন, তিনিও চলে গেলেন, এখনই হয়েছে বিপদ। যাক্‌, তোমার কাছে ওসব কথা তোলা উচিত নয়।"

ক্ষণিকা একটু হাসিয়া বলিল, "চিরকালটা আমার ঐরকম কথা শুনেই কেটেছে, আরো যদি বাঁচি ঐরকম কথাই শুন্‌ব। আমার এখন আর মনেও হয় না যে পৃথিবীতে সুখের কথা কিছু আছে, যদি থাকে তা আমি কখনও শুন্‌ব না।"

চিন্ময় চুপ করিয়া রহিল। কথা বলিল না, কিন্তু ঘর ছাড়িয়াও গেল না। খানিক পরে ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "চিন্ময়দা তুমি এখন কি কর্‌ছ ?"

চিন্ময় বলিল, "অনেক কিছু কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু কতখানি পার্‌ব জানি না। তুমি উঠে বস্‌লে পর একদিন

এসে সব বল্‌ব। আজ আর তোমায় বেশীক্ষণ বকাব না।"
সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষণিকা উঠিয়া বসিল। দাঁড়াইতেও তাহার বেশী দেরী হইল না। তাহার মা বলিলেন, "যা হোক বাপু, এ যাত্রা খুব বাঁচন বাঁচ্‌লে। গাড়ীর থেকে যা মুখ করে নাম্‌লে, আমার যেন বুকের ভিতর কেমন কর্‌ছিল। জ্বর নিয়ে ভাগ্যে কল্‌কাতায়ই বসে থাকনি।"

ক্ষণিকা মুখে কিছু বলিল না। মনের ভিতর তাহার কিন্তু এই কথাই জাগিয়া উঠিল যে তাহার দিন ফুরাইয়া গেলে অন্তত দিন কাটাইবার ভাবনা নিজেকে ভাবিতে হইত না। কিন্তু সেকথা মাকে বলিয়া ব্যথিত করিতে তাহার ইচ্ছা করিল না।

বিকালের দিকে লালু আসিয়া বলিল, "একটু বাইরে বেরিয়ে বস্‌বে চলনা? বেশ grand sunset হচ্ছে। তোমায় একটা জিনিষ দেখাবো কতদিন থেকে ভাব্‌ছি, তা তুমি এমন জ্বর বাধিয়ে বস্‌লে।"

ক্ষণিকা বলিল, "কি জিনিষ? সূর্য্যাস্ত? সে ত রোজই হয়।"

লালু বলিল, "আরে না। সূর্য্যাস্তের জন্যে ত আমার

ঘুম হচ্ছে না। আমার একটা লেখা, এবার ডিবেটিং ক্লবে পড়েছিলাম।"

ক্ষণিকা বলিল, "তা চল বাইরে বসে শোনা যাক। তোমার অত সাধের লেখা এই আঁধার ঘরের কোণে শোনাতে তোমার মন উঠ্‌বে না।"

দুজনে বাহিরে আসিয়া বসিবার আয়োজন করিতে লাগিল। উঠানের মাঝে একটা ভাঙ্গা তক্তপোষ প্রায়ই পড়িয়া থাকিত, তাহারই উপরে একটা শতরঞ্জি বিছাইয়া লালু তাহার সাহিত্য-সভার স্থান করিতে লাগিল। তাহার মা বলিলেন, "বালিশ গোটা-দুই এনে দে, দিদি কি এখন খাড়া হয়ে অমনি বসে থাক্‌তে পারে? আবার পিঠে কোমরে ব্যথা ধরে যাবে।"

লালু বালিশ আনিতে ঘরে ঢুকিল। এমন সময় সদর দরজার কাছ হইতে কে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "প্রবোধ দা! প্রবোধ দা বাড়ী আছ? লালু আছিস?"

ক্ষণিকার মা বলিয়া উঠিলেন, "ও কে হিরণ্ময় না? অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন? দেখ্‌ত রে লালু।"

লালু আসিবার আগেই ক্ষণিকা দরজার কাছে দ্রুতপদে গিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে হিরণ্ময়? দাদা ত বাড়ী নেই!"

হিরণ্ময়ের মুখ তখন আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে। সে কোনরকমে ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল, "পুলিশ এসেছে, দাদাকে arrest করেছে, এখুনি নিয়ে যাবে। আপনারা আসুন।"

তাহারা গিয়া কি করিবে, ক্ষণিকার যাওয়া সম্ভব কি না, সে-সব কথা আর কেহই ভাবিল না। হিরণ্ময়ের পিছন পিছন সকলে আসিয়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

চিন্ময়ের মা তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। নীচের তলায় পুলিশের লোক, পাড়ার লোক, রাস্তার লোক মিলিয়া ভীড় করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষণিকা চারিদিকে চাহিল, চিন্ময় কোথায়? হিরণ্ময় বলিল, "উপরে মায়ের কাছে।"

তাহার দুর্ব্বল শরীর তখনও আপনার ভার যেন বহিতে চায় না। কিন্তু সেকথা ভাবিবার অবসর কোথায়? উপরে উঠিয়া ক্ষণিকার মা ছুটিয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা বৃদ্ধার মস্তক নিজের কোলে টানিয়া লইলেন। হিরণ্ময়কে বলিলেন, "বাতাস কর, এখুনি সাম্‌লে যাবেন। বেটা-ছেলে এতেই কি কেঁদে খুন হতে হয়? তুমিই ত এখন মায়ের ভরসা।"

চিন্ময় মায়ের পাশ হইতে সরিয়া ক্ষণিকার কাছে

আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "ক্ষণিকা চল্‌লাম। আমায় এখন কতদিনের জন্যে বাইরের জগতের কাছ থেকে বিদায় নিতে হল জানি না। চিরদিনের মতও হতে পারে।"

ক্ষণিকার কণ্ঠস্বর যেন হারাইয়া গিয়াছিল। অস্ফুটকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কি intern কর্‌ছে? কোথায়?"

চিন্ময় বলিল, "জানি না। প্রবোধকে বোলো, একটু যেন দেখে মাকে।"

ক্ষণিকা বলিল, "কাউকে বল্‌তে হবে না, আমিই দেখ্‌ব। আমার কেন বেঁচে উঠ্‌লাম বুঝ্‌তে পারিনি, এখন পার্‌ছি। আমার সব-চেয়ে বড় কর্ত্তব্য বাকী ছিল। চিরদিন তুমি আমার সব দুঃখের ভার বয়েছ, আজ আমার পালা।"

( ২৫ )

বর্ষার সন্ধ্যা যেন অকালে রাত্রিকে ডাকিয়া আনিয়াছে। পথে দুচারজনের বেশী লোক নাই, দুইধারের বাড়ীগুলির দরজা-জানলা অধিকাংশই বন্ধ। নিতান্ত প্রয়োজন যাহাদের তাহারা ছাড়া কেহ ঘরের বাহির হয় নাই। একটা ঝোড়ো হাওয়া গৃহের দ্বারে দ্বারে আর্ত্তকণ্ঠে কাহাকে যেন ডাকিয়া ফিরিতেছে।

রাস্তার উপরের একটা বড় বাড়ীর প্রায় অধিকাংশ

ঘরই আলোকহীন, কেবল একটি ঘরে আলোর আভাস পাওয়া যাইতেছে।

বিরল-পথিক পথ দ্রুতগতিতে অতিক্রম করিয়া একটি মানুষ এই বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সদর দরজাটা ভেজানো। একবার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিল। কোন সাড়া-শব্দ নাই। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "হিরণ্ময়!" কেহ উত্তর দিল না। তখন সে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

নীচের তলায় জনমানবের সাড়া নাই। উপরে উঠিয়া সে আলোকিত কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে একটিমাত্র মানুষ বসিয়া ছিল। সে আগন্তুকের পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া উঠিয়া পড়িল। দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "ভিতরে এসো।"

চিন্ময় বলিল, "আমার আসাটা তোমার একটুও কি surprise মনে হচ্ছে না?"

ক্ষণিকা বলিল, "ভগবান আর আমার কিছুতেই অবাক্ হবার দিন রাখেননি। তবে আনন্দের জিনিষ আমার ভাগ্যে নূতন বটে।"

চিন্ময় অল্পক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন?"

ক্ষণিকা বলিল, "যেমন রেখে গিয়েছিলে, দুবছরে কিছুই বদ্‌লান নি। চল তাঁর কাছে।"

চিন্ময় বলিল, "যাচ্ছি! তুমি আমার কাছে যা, তা যদি না হতে, তাহলে মুখের কথায় তোমাকে জানাতে হত যে আমি কতখানি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমার কাছে তার কিছু দরকার আছে।"

ক্ষণিকা এতক্ষণ পরে হাসিল। হাসিয়া বলিল, "জন্মাবধি তোমার কাছে যা নিয়েছি, কবে তার জন্যে মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছি? কিন্তু মুখে যা না বলেছি, কবে তোমার তা বুঝ্‌তে ভুল হয়েছে? এখন শুধু এইটুকু বল যে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যে সংসারের ভার আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলে তা নিজের হতে নাও। আমাকে শুধু বল যে আমি ছুটি পাবার দাবি অর্জ্জন করেছি।"

চিন্ময় অগ্রসর হইয়া আসিয়া ক্ষণিকার দুই হাত ধরিয়া বলিল, "এই আমাকে বল্‌তে হবে? আমার সংসার কোথায় যে আমি তার ভার নেব? আমার জন্মাবার আগেকার যে সংসার, যার সৃষ্টি আমার আনন্দের ভিতর দিয়ে হয়নি, তারি ভগ্নাবশেষের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাকে, তুমি এখন সরে যেতে চাও? আমার

এতকালের বন্দী-জীবনের অসহ্য দুঃখ কি এরই জন্যে তপস্যা করছিল?"

ক্ষণিকা বলিল, "কি চাও তুমি বল? আমার দেবার যা সাধ্যাতীত নয়, এমন কিছুই এখন তোমায় দিতে আমার আপত্তি নেই।"

চিন্ময় বলিল, "আমার চাওয়ার কোনো বদল হয়নি। তোমার উত্তর কি এখনো বদ্‌লাবার দিন আসেনি?"

ক্ষণিকা বলিল, "হয়ত এসেছে। কিন্তু আমার অতীত জীবনকে তুমি আমারই থাকতে দিও। তার সুখ-দুঃখ যা তা শুধু ভগবান আর আমার মধ্যেই থাক। আমার বর্ত্তমানকে, আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে তুমি নাও।"

---